অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

অষ্টম খন্ড

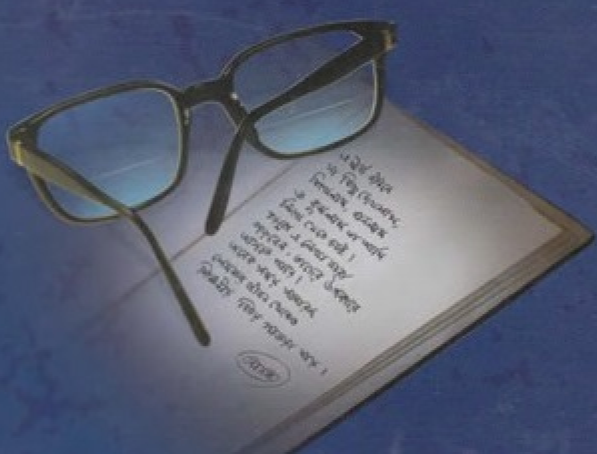

জীবনে যা দেখলাম

অষ্টম খণ্ড

(১৯৯৪-১৯৯৬)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

অষ্টম খণ্ড

(১৯৯৪-১৯৯৬)

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৯

জীবনে যা দেখলাম (অষ্টম খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ফোন ৯৫৬০১২১০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ: দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার ❖ মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ফাসাদই অশান্তির মূল	১৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর	১৭
বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য কে দায়ী?	১৮
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ	১৯
আমেরিকা গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসের নায়ক	২২
আমেরিকাকে মোড়লগিরির দায়িত্ব কে দিল?	২২
মুসলিম বিশ্বের বেলায় আমেরিকার পলিসি	২৩
১৯৯৪ সালে ব্যাপক জনসভা	২৪
বিদেশ সফরের প্রয়োজনীয়তা	২৪
পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দিলাম	২৫
সৌদি আরব ও কুয়েত সফরের প্রস্তুতি	২৬
সৌদি আরব সফর	২৬
জেদ্দায় অবস্থান	২৭
মক্কা শরীফ গমন	২৮
ওমরাহ পালন	২৯
মক্কা শরীফে তিন দিন	৩০
ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী	৩২
সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের নিকট আমার বক্তব্য	৩৩
স্বাধীনতা লাভের পর	৩৪
বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি সরকারের পলিসি	৩৫
শাসনতন্ত্র সংশোধনের সুফল	৩৫
বাংলাদেশে নির্বাচনপদ্ধতি	৩৫
ভারতের আধিপত্য সম্পর্কে সতর্কতা	৩৬
জেদ্দায় তৎপরতা	৩৬
IDB-তে মামূনের চাকরি	৩৭
মদীনা শরীফ সফর	৩৮
কিং ফাহদ হলি কুরআন কমপ্লেক্স	৩৮
জান্নাতুল বাকী' যিয়ারত	৩৯
মদীনায় মোমেনের সাথে দেখা	৪০
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ	৪০
সৌদি সরকারের নিকট মাওলানা মওদূদীর পরামর্শ	৪১

মদীনার চিফ জাস্টিসের সাথে সাক্ষাৎ	৪২
বাংলাদেশিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ	৪২
রিয়াদ রওয়ানা	৪২
রিয়াদ পৌঁছলাম	৪৩
ওয়ামি অফিসে সম্বর্ধনা	৪৩
সৌদি গ্র্যান্ড মুফতীর সাথে সাক্ষাৎ	৪৪
ড. আহমদ তুতুনজির সাথে সাক্ষাৎ	৪৫
সাংগঠনিক প্রোগ্রাম	৪৬
জেদ্দা প্রত্যাবর্তন	৪৬
মুহাম্মদ আল ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ	৪৭
শায়খ জামজুমের বাসায় ডিনার	৪৭
চেচনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ	৪৮
সফরের শেষ পর্যায়ে মক্কা শরীফে	৪৯
দীনী ভাইদের মেহমান	৪৯
উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শরফের বাসায়	৫০
কুয়েত রওয়ানা	৫০
এক সপ্তাহ অবস্থান	৫১
আওকাফ অফিসে	৫২
বাইতুয যাকাত অফিসে	৫২
জমিয়তুল ইসলাহ	৫২
আল মুতাওয়ার বাড়িতে ডিনার	৫৪
ডিনার শেষে আলোচনা	৫৪
কুয়েতে পত্রিকায় সাক্ষাৎকার	৫৪
মাসিক আলমুজতামায় সাক্ষাৎকার	৫৬
কুয়েত থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন	৫৬
১৯৯৫ সালের রাজনীতি	৫৬
এমপিদের পদত্যাগের পর	৫৭
নবীনগর ফোরামের প্রস্তাব	৫৮
নবীনগরে আমি অপরিচিত ছিলাম	৫৯
নবীনগরে জনসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৬০
জনসভার প্রস্তুতি	৬১
বিরোধিতার প্রতিকার	৬২
নিরাপত্তাকর্মীদের আগমন	৬২
জনসভার দিন	৬৩

গণসংবর্ধনা ৬৩
সৌদি আরব রওয়ানা ৬৫
জেদ্দায় ৩ দিন অবসর ৬৫
পাঠক-পাঠিকাদের নিকট দায়বদ্ধতা ৬৬
মুন্নীবিহীন জেদ্দা ৬৭
তুরস্ক সফর ৬৮
তুরস্কের পূর্বস্মৃতি ৬৮
ইস্তাম্বুল বিজয়ের উৎসব ৬৯
উৎসবের বিবরণ ৬৯
নিচে মাঠের দৃশ্য ৭০
রেফাহ পার্টির অগ্রগতির পটভূমি ৭১
১৯৯৪ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাফল্য ৭১
ইংল্যান্ড সফর ৭৩
লন্ডনে আমার সফরের আয়োজন ৭৩
রিসিপ্‌শন কমিটি গঠন ৭৪
লন্ডন পৌঁছলাম ৭৫
সংবর্ধনা সম্মেলন ৭৬
সম্মেলনের অনুষ্ঠানস্থল ৭৬
সম্মেলনে আমার ভাষণ ৭৮
লন্ডনে আমার কর্মতৎপরতা ৭৮
বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকার ৮০
ইংল্যান্ডে ২৬ দিনের কর্মতৎপরতা ৮১
আমার সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একান্ত সাক্ষাৎকার ৮৩
আমার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৮৬
আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ৮৬
আমেরিকা সফর ৮৭
নিউইয়র্কে সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন ৮৭
মাল্টি ন্যাশনাল রিসিপশন ৮৮
আমেরিকায় আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৮৯
ম্যানহাটনে সমাবেশ ৯০
আমার বক্তব্য ৯০
ইকনা'র সেন্টারে রিসিপশন ৯২
IIIT-তে সংবর্ধনা ৯২
ইসনা'র মহাসম্মেলন ৯৩

মুসলিম পরিচিতি সংরক্ষণে সম্মেলনের অবদান	৯৪
ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব তাদেরই	৯৫
বিশ্ব মুসলিম মিলনমেলা	৯৫
বক্তৃতামঞ্চের কথা	৯৫
আমার দুটো বক্তৃতা	৯৬
ডেট্রয়েটে সংবর্ধনা	৯৭
ফ্লোরিডা গমন	৯৭
আমার স্বাস্থ্যগত সমস্যা	৯৮
কানাডা সফর	৯৮
ঢাকা প্রত্যাবর্তন	৯৯
১৯৯৫ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা	৯৯
সৌদি আরব সফর	১০০
ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন	১০০
ওমরা পালন	১০০
তাওয়াফের মর্যাদা	১০১
সাঈ'র বিবরণ	১০২
এক মহব্বতের খাদেম	১০৩
কাবা শরীফের বিদায়ী যিয়ারত	১০৫
আরেক জন মুখলিস খাদেমের কথা	১০৫
আতরের শিশি'র কাহিনী	১০৬
শিশি বিলির কিস্‌সা	১০৭
মক্কা শরীফে আমার রাত-দিনের অবিরাম সাথি	১০৯
মক্কা নগরীতে থাকা ও খাওয়া	১১০
আজ (৩০ মার্চ ২০০৭) আতরের শিশি পেলাম	১১১
মদীনা শরীফে মাত্র ২০ ঘণ্টা	১১১
রাসূল (স)-এর কবর শরীফ যিয়ারত	১১২
চরম অতৃপ্তি নিয়ে জেদ্দায় ফিরে গেলাম	১১৩
রিয়াদ সফর	১১৪
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা	১১৫
দীনের চর্চা	১১৬
আলোচ্য বিষয়	১১৬
তৃতীয় দিনের বিষয়	১১৭
সৌদি আরবে ঢেঁকির দায়িত্ব	১২১
বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের পটভূমি	১২৩

মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ১২৩
ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব ১২৪
আগস্ট বিপ্লব ১২৪
খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসন ১২৫
বহুদলীয় রাজনীতির সূচনা ১২৬
জিয়া হত্যা ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১২৬
সেনাপ্রধানের ক্ষমতা দখল ১২৭
১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন ১২৭
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে
অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আবার আন্দোলন ১২৮
৭ম সংসদ নির্বাচন ১২৮
শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর ১২৮
শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিলেন না ১২৯
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদেশে শেখ হাসিনার অপপ্রচার ১৩১
নবম সংসদ নির্বাচন কেন বানচাল করা হলো? ১৩২
প্রথম প্রচেষ্টা ১৩৩
দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ১৩৩
গণ-অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ ১৩৩
শেখ হাসিনার জোট গঠন ১৩৪
শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলন ১৩৪
সংস্কার আন্দোলনের প্রধান প্রধান দাবি ১৩৫
সংলাপের আহ্বান ১৩৫
চারদলীয় জোটের মেয়াদ শেষ ১৩৬
শেখ হাসিনার লগি-বৈঠা সন্ত্রাস ১৩৭
বিচারপতি কে এম হাসানের অক্ষমতা প্রকাশ ১৩৮
অগত্যা রাষ্ট্রপতিকেই দায়িত্ব নিতে হলো ১৩৮
উপদেষ্টাদের ভূমিকা ১৩৮
দল ও জোটে নির্বাচনী ভাঙা-গড়া ১৪০
নির্বাচনী শিডিউল ঘোষণা ১৪১
মহাজোটে তোলপাড় ১৪১
নির্বাচন মুলতবি করার আন্দোলন ১৪২
জরুরি অবস্থা ঘোষণা ১৪২
নির্বাচন বানচাল করতে পেরে মহাজোটের উল্লাস ১৪২
নির্বাচন দু বছর বিলম্বিত হওয়ার জন্য কে দায়ী? ১৪৩

ইতিহাসের সারকথা ১৪৪
ইতিহাসের শিক্ষা ১৪৬
সামরিক শাসনের আশঙ্কা ১৪৬
কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ১৪৭
বর্তমান সরকারের মর্যাদা ১৪৮
এ সরকারের সংস্কারমূলক কার্যাবলি ১৪৮
অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ১৪৯
দেশ শাসন সহজ নয় ১৫০
উপদেষ্টাগণের আচরণ ১৫০
এ সরকারের ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় কীর্তি ১৫১
রাজনৈতিক সংস্কার ১৫২
এ সংস্কারসমূহের প্রয়োজনীয়তা ১৫২
এসব সংস্কার কারা করবে? ১৫২
নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ১৫৩
দুর্নীতিপরায়ণ ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন চাইলে– ১৫৪
রাজনৈতিক দলের সংস্কার ১৫৫
রাজনৈতিক দলের সংস্কারপদ্ধতি ১৫৫
জামায়াতে ইসলামীতে সংস্কারের প্রয়োজন নেই ১৫৬
জামায়াতের সাংগঠনিক পদ্ধতি ১৫৬
সহযোগী সদস্যদেরকে সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয় ১৫৬
সংগঠনের বিভিন্ন স্তর ১৫৭
নির্বাচনপদ্ধতি ১৫৭
কেন্দ্রীয় আমীর ও মজলিসে শূরার নির্বাচনপদ্ধতি ১৫৮
সিদ্ধান্ত গ্রহণপদ্ধতি ১৫৮
দায়িত্বশীলদের সমালোচনার সুযোগদান ১৫৮
জামায়াতের তহবিল ১৫৯
বাজেট পদ্ধতি ১৫৯
অডিট পদ্ধতি ১৫৯
বিশেষ অভিযান ১৫৯
আদর্শিক রাজনীতি বনাম ক্ষমতার রাজনীতি ১৫৯
রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ১৬০
ইংল্যান্ড সফর ১৬২
রাজনৈতিক তৎপরতার পদ্ধতিগত সংস্কার ১৬২
অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদেরকে জড়িত না করা ১৬৩

বাংলাদেশ আসামির কাঠগড়ায় ১৬৫
শেখ হাসিনার বর্তমান ভূমিকা ১৬৬
সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আচরণ ১৬৬
ছাত্র-রাজনীতির সংস্কার ১৬৭
শ্রমিক সংগঠনে সংস্কার ১৭০
নির্বাচনী সংস্কার ১৭২
নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার শর্তাবলি ১৭৩
নির্বাচনে টাকার খেলা ঠেকানো ১৭৩
নির্বাচনী চুক্তি প্রয়োজন ১৭৪
টাকার খেলা বন্ধ করার একমাত্র উপায় ১৭৫
বর্তমান নির্বাচনপদ্ধতি ১৭৬
বিকল্প পদ্ধতি ১৭৭
এ পদ্ধতির সুফল ১৭৭
এ পদ্ধতি সম্পর্কে আপত্তি ১৭৭
রাজনৈতিক দলে ভাঙা ও গড়ার পটভূমি ১৭৮
বিলম্বের কারণ ১৮০
নতুন দল গঠনপ্রচেষ্টা ১৮১
প্রধান দুই দলে ভাঙনের লক্ষণ ১৮২
ড. ফখরুদ্দীন সরকারের সমর্থক একটি দল অতি প্রয়োজন ১৮৪
সরকারের শঙ্কার কোনো কারণ নেই ১৮৫
ম্যানচেস্টারে পাঁচ সপ্তাহ ১৮৫
বাংলাদেশে আদর্শিক সংঘাত ১৮৬
বিপরীতমুখী দুই আদর্শ ১৮৭
ঐ দুটো আদর্শের বিশ্লেষণ ১৮৭
জাতীয়তার দিক ১৮৭
রাষ্ট্রীয় নীতির দিক ১৮৯
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের বিপরীত ১৯০
মুসলিম জাতির সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের লড়াই ১৯০
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই ১৯১
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট একটি বিশেষ প্রশ্ন ১৯২
মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন? ১৯৩
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দিক ১৯৪
ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ ১৯৫
ভারতের প্রতি আওয়ামী লীগের আচরণ ১৯৬

এর কারণ কী? ১৯৭
বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত ও আমেরিকার ভূমিকা ১৯৮
মুসলিম দেশের জন্য আমেরিকার গণতন্ত্র ১৯৯
ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার ক্রুসেড ২০০
ভারত বিভাগ কি ভুল ছিল? ২০২
ভারত বিভাগ না হলে মুসলমানদের কী দশা হতো? ২০২
পাকিস্তান কায়েমের পরই বাঙালি মুসলমানদের উন্নতি শুরু হয় ২০৩
স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের অগ্রগতি ২০৩
ভারত বিভাগ না হলে ২০৪
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলমানদের প্রতি আকুল আবেদন ২০৫
গণতন্ত্র কি কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ? ২০৬
ইসলামকে উৎখাত করা সম্ভব নয় ২০৮
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অভিভাবক ২০৮
অসহায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জঘন্য অপচেষ্টা ২০৯
শাসনতন্ত্রের মর্যাদা ২১০
বাংলাদেশের সংবিধান ২১১
প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকৌশল ২১২
ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের সাম্প্রতিক দাবি ২১৩
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ২১৩
সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ২১৪
ভারতে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করল, আমরা কেন ব্যর্থ হলাম? ২১৫
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এ দশা কেন? ২১৬
দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর প্রশংসনীয় ভূমিকা ২১৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ২১৮
মজলিসে শূরার অধিবেশন ২১৯
সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ ২২০
চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমার সিঙ্গাপুর গমন ২২০
চিকিৎসা শুরু ২২১
চিকিৎসার ফলাফল ২২২
সিঙ্গাপুর সফর সমাপ্ত ২২২
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ২২৩
সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ ২২৪
আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ ২২৫
প্রতি বছর ব্রিটেনে কেন আসি ২২৭

বেড়ানোর আনন্দে এবার ছেদ পড়ল	২২৭
আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা	২২৮
নাতি-নাতনীদের কথা	২২৯
এক নাতনীর বিয়ে	২৩০
বড় নাতির থিসিস	২৩২
নাতবৌ-এর সাফল্য	২৩২
এক নাতি কণ্ঠশিল্পী	২৩৪
এবার যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করতে হলো	২৩৪
বড় নাতনীর বাসায়	২৩৪
অপ্রত্যাশিত সাহায্য	২৩৫
এ সময় পাঁচ ছেলেই ইংল্যান্ডে	২৩৬
ব্রিটেন সকল জাতির বাসস্থান	২৩৭
কেন এ দেশ ছেড়ে কেউ চলে যেতে চায় না?	২৩৮
ব্রিটেনের জনসংখ্যা	২৩৮
ধর্মীয় সহ-অবস্থান	২৩৯
ইসলামাতঙ্কের কারণ	২৩৯
এ শঙ্কার পরিণতি	২৪০
ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন কি সন্ত্রাস?	২৪১
ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস অতি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা	২৪২
পাশ্চাত্যে মুসলিম কমিউনিটি সন্দেহের শিকার	২৪২
পাশ্চাত্যে মুসলিম কমিউনিটি ইসলামী আন্দোলনে লিপ্ত নয়	২৪৩
পাশ্চাত্যের শঙ্কা একেবারেই অমূলক	২৪৪
হান্টিংটনের শঙ্কাকে অমূলক মনে করি না	২৪৫
সভ্যতার দ্বন্দ্ব	২৪৫
সভ্যতার ভিত্তি	২৪৬
পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি	২৪৬
পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসিকতা	২৪৭
জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ কি শুধু পাশ্চাত্যের জন্য?	২৪৮
পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান	২৪৯
ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি	২৫০
ইসলামী সভ্যতার পতন	২৫১
ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থান	২৫১
ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কৌশল	২৫২
Integration ও Cohesion-এর দাবি	২৫২

মুসলিম কমিউনিটি সন্ত্রাসী নয়	২৫৩
ব্রিটেনে আমার দীনী তৎপরতা	২৫৫
দেশে ফিরে যাওয়ার পালা	২৫৪
বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল	২৫৬
বিয়ে অনুষ্ঠান	২৫৭
অনুষ্ঠানের পর-	২৫৮
অন্দরমহলে	২৫৮
ঢাকা পৌঁছলাম	২৫৯
বিশ পাউন্ডের জাল নোট	২৬০
এক আকর্ষণীয় দাওয়াত পেলাম	২৬০
গবেষণাকর্ম দেখে মুগ্ধ, পুলকিত ও উদ্বুদ্ধ	২৬০
নাবা-সাফার কথা	২৬২
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচনী প্রহসন	২৬৩
নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা	২৬৩
নির্বাচনী ফলাফল	২৬৪
নির্বাচনের পরিণাম	২৬৪
যথাসময়ে মেনে নিলে-	২৬৫
আওয়ামী লীগের বিজয়ের কুফল	২৬৫
১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়	২৬৬
১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন	২৬৭
পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবস্থান	২৬৮
১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিভাবে বিজয়ী হলো?	২৬৮
বিজয়ের দ্বিতীয় কারণ	২৬৯
বিজয়ের তৃতীয় কারণ	২৭০
বিজয়ের চতুর্থ কারণ	২৭০
ইসলামী ঐক্যের প্রতীকের মর্মান্তিক তিরোধান	২৭১
শোকবাণী	২৭১
খতীব সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের পটভূমি	২৭২
খতীব সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের ধরন	২৭৩
পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশমালা	২৭৪
রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার না হওয়া	২৭৪
মহিলা-অঙ্গনে দাওয়াতের ব্যাপক সম্প্রসারণ	২৭৫
যুবমহলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি	২৭৬

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে সক্রিয় জনমত গড়ে তোলা ২৭৬
ইসলামী ব্যাংকের সিলভার জুবিলি ২৭৮
একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার ২৭৯
সেমিনারে আগত অতিথিবক্তাদের পরিচয় ২৭৯
ইসলামী আন্দোলন আমাকে কী দিয়েছে? ২৮০
নির্বাচন কমিশনের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ ২৮৩
যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা ২৮৩
এত দিন বিচার করা হলো না কেন? ২৮৪
মতলববাজদের উদ্দেশ্য ২৮৪
তারা সংবিধানের ধার ধারেন না ২৮৫
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ২৮৬
ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ ২৮৭
পঁচিশের কালো রাতের পর– ২৮৭
আমরা কী করেছিলাম? ২৮৮
স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে কী করা যায়? ২৮৯
রেযাকার (রাজাকার) বাহিনী গঠন ২৯০
কলাবরেটার্স অ্যাক্ট ২৯০
ফৌজদারি অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা হয়নি ২৯১
এখন আমার প্রশ্ন ২৯১
তুরস্ক সফর ২৯১
এ সফরের উপলক্ষ ২৯২
ইস্তাম্বুলে দর্শনীয় স্থানসমূহ ২৯২
বসফরাস প্রণালী (Bosphorus strait) ২৯৩
তোপকাপি (Topkapi) জাদুঘর ২৯৩
সৌদি কনসাল জেনারেলের মেহমান ২৯৫
রাজধানী আংকারায় পৌছলাম ২৯৫
নূরে তোলাবার মেহমান ২৯৬
নূরে তোলাবার কর্মতৎপরতা ২৯৭
আঙ্কারায় দোভাষীর দায়িত্ব ২৯৮
ব্যবসায়ীদের দেওয়া ডিনার ২৯৮
তুরস্ক বিরাট সম্ভাবনাময় দেশ ২৯৮
বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন ২৯৯
১৯৯৬-এর নির্বাচনের অজানা তথ্য ২৯৯
বিস্ময়কর তথ্যসমূহ ৩০০

নির্বাচনে কারচুপি করার ক্ষমতা কার? ৩০১
২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রাক্কালে
প্রধান উপদেষ্টার ব্যাপারে শেখ হাসিনার উগ্রতার কারণ ৩০১
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার শপথ ৩০২
সৌদি আরবে দীর্ঘ বিশ্রাম ৩০২
হাফিয বিয়াইয়ের ইন্তিকাল ৩০৩
ঢাকা ফিরে এসে নতুন রোগে আক্রান্ত ৩০৪
শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর ৩০৫
শেখ হাসিনার শাসনামল ৩০৬
বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা ৩০৭
শেখ হাসিনার গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ৩০৯
গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা ৩০৯
বাকশালী সংসদ ৩১০
বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা ৩১১
সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা ৩১২
গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক ৩১৩
রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ৩১৩
আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বিনষ্ট করা ৩১৪
কোনো সন্ত্রাসী ঘটনারই তদন্ত পর্যন্ত করা হয়নি ৩১৫
সন্ত্রাসী বাহিনী গড়েছেন ৩১৫
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইখতিয়ারে আপত্তি ৩১৫
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ৩১৭
ইসলাম কি শুধু ধর্ম? ৩১৭
শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন? ৩১৮
তথাকথিত মৌলবাদী গালি ৩১৯
ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ৩১৯

৩০১.

ফাসাদই অশান্তির মূল

ফাসাদ কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা। সূরা রূমের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষের নিজ হাতের কামাইয়ের ফলে জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।' রাসূল (স)-এর সময় রোম ও পারস্যের মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছিল, এ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মাওলানা মওদূদী (র)-এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ লাগলে যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস, গোলযোগ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমেয়। ঐ চরম পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে 'ফাসাদ' শব্দটি অনৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, ধ্বংস, বিকৃতি, ভ্রান্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবী 'সালাহ' শব্দের বিপরীত অর্থেই 'ফাসাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সালাহ মানে সঠিকতা, সততা, যথাযথতা, উপকারিতা, কার্যকারিতা ইত্যাদি।

ফাসাদকারী ব্যক্তি ও শক্তিকে মুফসিদ এবং এর বিপরীত ব্যক্তি ও শক্তিকে মুসলিহ বলা হয়। কুরআনে বেশ কয়েক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ মুফসিদদেরকে পছন্দ করেন না।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়। গোটা বিশ্বে ফাসাদ আর ফাসাদ চলে। মানবজাতি যাতে ভবিষ্যতে এ জাতীয় অশান্তির শিকার না হয়, সে মহান উদ্দেশ্যে ঐ যুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তি (আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া) বর্তমান জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। যেসব কারণে যুদ্ধ বাধে তা যাতে রোধ করা যায়, সেজন্য একটি চার্টার প্রণয়ন করা হয়। ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য হবে এবং তাদেরকে উক্ত চার্টারও মেনে চলতে হবে। ১৫টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিল এ চার্টার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতে না পারে। কোথাও যুদ্ধাবস্থা দেখা গেলে তা প্রশমিত করার দায়িত্বও পালন করবে জাতিসংঘ। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যত সমস্যাই সৃষ্টি হোক তারা যুদ্ধ হতে দেবে না, বিনা যুদ্ধে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবে। সংলাপ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের মীমাংসা না হলে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। কোনোক্রমেই যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেওয়া যাবে না। এসব সিদ্ধান্ত মেনে চলার জন্য সকল রাষ্ট্র ওয়াদাবদ্ধ।

বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য কে দায়ী?

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ যথারীতি চালুই আছে। এর কারণ তালাশ করা মোটেই কঠিন নয়।

জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টার নিউইয়র্কে অবস্থিত। এ বিশাল প্রতিষ্ঠানের বিরাট খরচের জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তাতে আমেরিকাই মোটা অংক প্রদান করে। সদস্যরাষ্ট্রের উপর ধার্যকৃত চাঁদা সবাই নিয়মমতো দিতে পারে না বলে জাতিসংঘকে আমেরিকার উপরই নির্ভর করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল ও সমৃদ্ধশালী দেশ। তাদের মুদ্রা ডলার বিশ্বে বিরাট মর্যাদার অধিকারী। সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর তারাই বিশ্বের সেরা সামরিক শক্তি ও সমরাস্ত্রের অধিকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ সভ্যতাকে বিশ্বজনীন সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও তারাই পালন করছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order নামক সুস্পষ্ট ভাষায় আমেরিকার এ ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র ও স্থায়ী হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে ইসলামের পুনর্জাগরণকে প্রতিহত করা আমেরিকার কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সিকিউরিটি কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত। ১৫ সদস্যের এ সংস্থার ৫টি স্থায়ী সদস্য হলো আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া। জাতিসংঘের যেকোনো সিদ্ধান্ত এ ৫টি রাষ্ট্রের যে কেউ নাকচ করে দিতে পারে।

উপরিউক্ত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। এমনকি জাতিসংঘকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতিসংঘ বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করে; কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধ করতে চাইলে জাতিসংঘ সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। যদি সম্মতি না দেয় তাহলে জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে, এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রই প্রধানত দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে সন্ত্রাস ও যুদ্ধ চালু রেখেছে। জাতিসংঘ আমেরিকাকে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অনেক কারণেই জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা কর্তব্য ছিল। কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই যে, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই জাতিসংঘের মহান উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার দায়ে প্রধান অপরাধী হিসেবে গণ্য। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত ও ব্যাহত করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্রই পালন করে আসছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ

১. আমেরিকার সহযোগিতায় প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী জাতি মিত্রশক্তিকে বিরাট আর্থিক সাহায্য করেছে। ইহুদী জাতির কোনো রাষ্ট্র না থাকলেও তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী জাতি। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, ইটালি ও জাপানের ঐক্যজোট অক্ষশক্তি (Axis Power) নামে অভিহিত ছিল। এর বিরুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার ঐক্যজোট মিত্রশক্তি (Allied Power) নামে পরিচিত হয়। যুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয়ে ইহুদীদের বিরাট আর্থিক অবদানের পুরস্কারস্বরূপ প্যালেস্টাইনের হাজার বছরের স্থায়ী আরব মুসলিম দেশটিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে ইহুদীদের জন্য 'ইসরাইল' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে ব্রিটেন ও রাশিয়ার সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়ে লাখ লাখ আরব মুসলিম অধিবাসীকে তাড়িয়ে সেখানে ইহুদী রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যে এক বিষফোঁড়ার মতো কায়েম করা হয়। ইসলামের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিসও ওদের দখলে চলে যায়।

ইসরাইল আমেরিকার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। ইসরাইলের দখলের বাইরেও প্যালেস্টাইনের সকল অঞ্চলেই অন্যায়ভাবে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আছে। স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা আমেরিকা ছয় দশকেও পূরণ করেনি।

জাতিসংঘ ইসরাইলের বিরুদ্ধে বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলে আমেরিকা ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। ইসরাইলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে যথেচ্ছাচার করার লাইসেন্স দিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি ইসরাইল প্যালেস্টাইনের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদেরকেও গ্রেপ্তার করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। ২০০৬ সালে ইসরাইল একাধারে দেড় মাস পর্যন্ত লেবাননের মুসলিম এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলোর সরকারের উপর যত আধিপত্যই বিস্তার করুক, ইসরাইলের প্রতি জঘন্য পক্ষপাতিত্বের কারণে বিশ্বের দেড় শ' কোটি মুসলিম উম্মাহর নিকট আমেরিকান সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য।

২. ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনাম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ সত্ত্বেও কমিউনিস্টদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদেরকে দমন করার ব্যাপারটা সে দেশের জনগণের অভ্যন্তরীণ বিষয়; কিন্তু মোড়লিপনা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

৩. ১৯৭৯ সালেই ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লবী সরকার কায়েম হলে আমেরিকার তল্পিবাহক ইরানের শাহের পতনের সাথে সাথে তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসকে চরম অপমান ভোগ করতে হয়। এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকার কমান্ডো বাহিনী ইরানে হামলা চালায়; কিন্তু এক অলৌকিক ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরাক। ইরাকের সামরিক স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ইরানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন। ইরানিরা ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা নিয়ে শাহাদাতের জযবার সাথে জিহাদে আত্মনিয়োগ করল। আর ইরাক নিতান্ত সাম্রাজ্যবাদী হীন উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আমেরিকা সর্বপ্রকার মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাদ্দামকে শক্তিশালী করা সত্ত্বেও নয় বছর যুদ্ধের পর ইরাক আমেরিকা ও জাতিসংঘের সাহায্যে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে আত্মরক্ষা করল; তা না হলে ইরান ইরাক দখল করে নিতে সক্ষম হতো।

৪. আমেরিকার অস্ত্রে শক্তিমান হওয়ার পর সাদ্দাম হোসেন রাজ্য বিস্তারের নেশায় কুয়েত দখলের বাসনা করলেন; কিন্তু আমেরিকার সম্মতি না হলে জাতিসংঘ তা করতে দেবে না বলে ইরাক আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সাহায্য চাইল। রাষ্ট্রদূত আমেরিকার আপত্তি নেই বলে জানালে বিরাট ইরাকি সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র কুয়েত রাষ্ট্রটি এক রাতেই দখল করে নেয়। কুয়েতের প্রতিরোধ করার সাধ্য না থাকায় রাজপরিবার সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সৌদি সরকার ইরাকের কুয়েত দখলের পর সৌদি আরবের তেলসমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলে ইরাকি বাহিনীর আগ্রাসনের আশঙ্কায় আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করে। আমেরিকা এ আহ্বানেরই অপেক্ষায় ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদের উপর প্রাধান্য লাভের এ মহাসুযোগ পেয়ে আমেরিকা শক্তি প্রয়োগ করে কুয়েতকে দখলমুক্ত করে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্থায়ী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে নেয়। সাদ্দাম কুয়েত দখল করার ফলে মুসলিম উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

৫. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার জন্য বিনা তদন্তে ও বিনা প্রমাণে উসামা বিন লাদেনকে দায়ী করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেন। উসামা বিন লাদেন সৌদি নাগরিক। তিনি রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের বিরুদ্ধে জিহাদে বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মেহমান হিসেবে সে দেশে অবস্থান করছিলেন।

উসামা বিন লাদেনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগান সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন, যাতে তাদের মেহমানকে আমেরিকার হাতে তুলে

দেওয়া হয়। তালেবান সরকার এ অন্যায় দাবি মানতে অস্বীকার করায় বুশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি আদায় করে ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের উপর হামলা করে। তালেবান সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার বেসামরিক লোক হত্যা করে দেশটি দখল করে নেয়। হামিদ কারজাই নামক এক আফগান মীরজাফর জোগাড় করে আফগানিস্তানে পুতুল সরকার কায়েম করা হয়। রাজধানী কাবুল ও কতক শহর দখল করে পুতুল সরকার দেশ চালাচ্ছে; কিন্তু তালেবান মুজাহিদগণ এ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং গ্রামাঞ্চলে জনসমর্থন পাচ্ছেন। তালেবান সরকার দেশে পূর্ণ শান্তি কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন বাহিনী গোটা দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে। আফগান জনগণ কোনো কালেই বিদেশি আধিপত্য মেনে নেয়নি। বিদেশি সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল হতে পারে না।

৬. ইরানের বিরুদ্ধে সাদ্দামকে লেলিয়ে দিয়ে আমেরিকা ইরাকে যে বিরাট সামরিক শক্তি গড়ে তুলল, তা তাদের পোষ্য ইসরাইলের জন্য মারাত্মক পরিণতির কারণ হতে পারে বলে বুশ ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখলের পর মুসলিম বিশ্বের নৈতিক সমর্থন হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসরাইলের উপর দুটো মিসাইল নিক্ষেপ করায় আমেরিকা ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য ইরাককে হুমকি মনে করে।

আক্রমণের অজুহাত হিসেবে বুশ দাবি করেন যে, ইরাকে মানববিধ্বংসী বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে। জাতিসংঘের তদন্ত মিশন বারবার ইরাকে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েও ঐ জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র পায়নি। তবুও বুশ এ অভিযোগ অব্যাহত রাখায় তল্লাশিও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

বুশ ইরাক হামলার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের অনুমোদন চাইলেন; কিন্তু জাতিসংঘ আফগানিস্তানে হামলার অনুমতি দিলেও ইরাক আক্রমণের অনুমতি দিতে সম্মত হলো না। জাতিসংঘের অনুমতির পরওয়া না করে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে বসল। জাতিসংঘের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান বারবার প্রতিবাদ জানাতে থাকলেন। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি এ দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার সময়ও জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে ভুলেননি।

ইরাক দখল করার সময় হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়। বাগদাদের মতো প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন ধ্বংস করা হয়। দখল করার পর অস্ত্র তল্লাশি আরো জোরদার করা হয়। ২০০৫ সালে তদন্তকারীরা ঘোষণা করেন, ইরাকে মানববিধ্বংসী কোনো অস্ত্র নেই। প্রমাণিত হলো যে, প্রেসিডেন্ট বুশ চরম মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে হামলা করেছেন।

এরপরও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মহান উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ইরাকে তিনি গৃহযুদ্ধ চালু করার ব্যবস্থা করলেন। সাদ্দামের শাসনামলে গণতন্ত্র না থাকলেও রোজ এভাবে লোক নিহত হতো না।

সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচার করার কোনো অধিকার ইরাকে বুশের পুতুল সরকারের ছিল না। যে অপরাধে সাদ্দামকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এর জন্য জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আদালত রয়েছে। সাদ্দামকে বিচারের প্রহসন করে নির্মমভাবে ঈদের দিন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

বুশের ভ্রান্ত ইরাক নীতির ফলে নিজের দেশে তো তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেনই, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে চরম ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ইরাক আমেরিকার জন্য দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হলো। ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনীকে শুধু পরাজয় নয়, অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে হবে।

আমেরিকা গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসের নায়ক

প্রেসিডেন্ট বুশ নির্লজ্জের মতো দাবি করেন যে, তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। উপরিউক্ত ৬টি উদাহরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসের প্রবর্তক ও নায়ক। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমেরিকা জাতিসংঘকে পঙ্গু করে রেখেছে। ইরাক ইস্যুতে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে যে উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে, তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচিত হলো কি না কে জানে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে লীগ অব নেশন্স নামে জাতিসংঘের অনুরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধবাজ জার্মানির হিটলার ও ইটালির মুসোলিনি লীগ অব নেশন্সকে অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে পাস কাটিয়ে যেভাবে ইরাকে হামলা করল তাতে প্রমাণিত হলো যে, জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধ করতে অক্ষম। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাই প্রবল হলো।

আমেরিকাকে মোড়লগিরির দায়িত্ব কে দিল?

বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করে বলেই ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই জাতিসংঘকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জাতিসংঘই বিশ্বের স্বীকৃত অভিভাবক। জাতিসংঘ আমেরিকাকে বিশ্বে মোড়লগিরি করার কোনো দায়িত্ব দেয়নি। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বে সকল দিক দিয়ে শান্তি কায়েমের উদ্দেশ্যে অনেক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এর প্রতিটিই উক্ত সনদ অনুযায়ী বিশুদ্ধ বলে গণ্য। বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির কল্যাণের পক্ষেই ঐসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদি ঐসব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে উপরিউক্ত ৬টি অঘটনের একটিও ঘটতে পারত না।

জাতিসংঘের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে জাতিসংঘকে পঙ্গু করে রেখেছে। আমেরিকা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যকেই বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে।

দুনিয়ায় অহেতুক মাতুব্বরি না করে আমেরিকা নিজের দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুবিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে বিশ্বের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের সুযোগ পেত। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের নেশায় মেতে তারা শান্তিপ্রিয় মানবজাতির অভিশাপের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

আফগানিস্তান ও ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমেরিকাকে কেউ দেয়নি। গণতন্ত্র পেশীশক্তির জোরে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এটা জনগণের দায়িত্ব। বাহির থেকে চাপ দিয়ে কোথাও গণতন্ত্র চালু হতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট বুশ যদি সত্যি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তাহলে প্যালেস্টাইনে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হামাসকে স্বীকৃতি দিলেন না কেন?

মুসলিম বিশ্বের বেলায় আমেরিকার পলিসি

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জনগণকে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিলে ক্রমান্বয়ে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় আমেরিকা সেসব দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বানচালের জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকাকে যে দেশ সমর্থন করে, সেখানে রাজতন্ত্র থাকলেও তাদের আপত্তি নেই।

ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের আশঙ্কায় পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাবাহী হিসেবে আমেরিকার নীতি মুসলিম বিশ্বের বেলায় অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক। মুসলিম জাতির মানবাধিকার কোথাও তারা স্বীকার করে না। কাশ্মীর, আরাকান, প্যালেস্টাইন, ভারত কোথাও মুসলিমদের মানবাধিকারের পক্ষে তাদের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। আণবিক শক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার অধিকারও ইরানের নেই। ইরাককে দখল করে আমেরিকা ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল। ইসরাইলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় তারা এখন ইরানের বিরুদ্ধে ওঠেপড়ে লেগেছে।

প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা সিনিয়র বুশ যখন নব্বই দশকে প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম জাতির ব্যাপারে দমন নীতির সূচনা করে। সাদ্দামের কুয়েত দখলের অজুহাতে মধ্যপ্রাচ্যে তারা কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেয়ে যায়।

প্রফেসর হান্টিংটন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনামলে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে নিরাপত্তা পরিকল্পনার ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নন, তিনি আমেরিকা সরকারের গাইডের মর্যাদায় আসীন। তাঁর গ্রন্থে দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই জর্জ বুশ মুসলিম বিশ্বের সাথে আচরণ করছেন।

ইসলামের ধারক ও বাহক হওয়ার অপরাধেই তারা ইরান ও সুদানকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তারা গণতন্ত্রের বিকাশ চায় না। মিসরের হোসনি মোবারক ও পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফের মতো অনুগত রাষ্ট্রনায়কদের হাতে গণতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো সকল মুসলিম দেশ দখল করা সম্ভব নয়। তাই আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ায় ইসলামী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্য মিসর ও পাকিস্তানের চেয়ে অধিক যোগ্য একনায়ক জোগাড় করা হয়েছে।

কোনো মুসলিম দেশেই যাতে ইসলামের পুনরুত্থান না ঘটে, সেদিকে আমেরিকার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। মুসলিম সোমালিয়ায় সম্প্রতি আমেরিকার হামলার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব সেনাবাহিনী পালন করছে। বাংলাদেশে ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘসহ আমেরিকা ও ইউরোপের শেখ হাসিনাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। তা না হলে বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের এত গরজের অন্য কী কারণ থাকতে পারে?

৩০২.

১৯৯৪ সালে ব্যাপক জনসভা

১৯৯৪ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সর্বসম্মত রায়ে আমাকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ঐ বছরের বাকি ছয় মাস দেশে ব্যাপক সফর করেছি। ১৯৭১ সালের পর দীর্ঘ সাড়ে বাইশ বছর বাংলাদেশে জনগণের সামনে হাজির হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং কোনো জনসভায় বক্তব্য রাখারও সুযোগ পাইনি। ১৯৯৪ সালের শেষ ৬ মাস বিভাগীয় মহানগর ও প্রধান প্রধান জেলাশহরে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিরাট বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। আমিও পরম আগ্রহ সহকারে উৎসবমুখর পরিবেশে ঐসব সমাবেশে বক্তৃতা করে গভীর তৃপ্তিবোধ করেছি। পাকিস্তান আমলে সারা দেশে বিশ বছর অগণিত জনসভায় বক্তব্য রেখেছি। আমার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে সাড়ে বাইশ বছর আমাকে জনগণ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন তারা দেখতে পেলেন যে, তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল; পূর্বের চেয়েও অনেক বেশি সংখ্যায় জনগণ সর্বত্র আমার জনসভায় উপস্থিত হয়ে বিরোধীদের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিল।

বিদেশ সফরের প্রয়োজনীয়তা

১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকেই কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীও

এ আন্দোলনে শরীক। এ অবস্থায় আমীরে জামায়াত হিসেবে দেশে থাকা জরুরি বলে বিবেচনা করা সত্ত্বেও বিদেশে সফর করা প্রয়োজন কি না, সে বিষয়ে জামায়াতের নির্বাহী পরিষদে পরামর্শ করা হলো। প্রায় ৭ বছর বিদেশে নির্বাসন জীবনযাপনকালে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে আমার যে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা পুনর্বহাল করা জরুরি বলে সবাই মত প্রকাশ করলেন।

ইসলামী আন্দোলন বর্তমানে বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। শুধু মুসলিম দেশেই নয়, ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন অত্যন্ত সক্রিয়। তাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সফর করা অপরিহার্য। বিশ্বে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে পরিচিত করার জন্যও সফর করা প্রয়োজন।

তাছাড়া বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলা এবং প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোকে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যেও এ সফর অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে সংশ্লিষ্ট যত লোক বিদেশে অবস্থান করছেন তাদেরই প্রচেষ্টা ও পরিচালনায় বিদেশে ইসলামী সংগঠন গড়ে ওঠেছে। তারা মনে-প্রাণে কামনা করেন, যেন তাদের জন্মভূমিতে ইসলাম বিজয়ী হয়। তারা জামায়াতে ইসলামীকেই তাদের মূল সংগঠন হিসেবে গণ্য করেন।

আমীরে জামায়াত ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে যে কারণে দেশের সর্বত্র সফরে যেতে হয়, একই কারণে বিদেশে কর্মরত সংগঠনের প্রয়োজনে নেতৃবৃন্দের বিদেশ সফর করা অত্যন্ত জরুরি।

উপরিউক্ত সকল দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যথাসম্ভব শিগগিরই সফর শুরু হওয়া দরকার।

পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দিলাম

নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে ১৬ বছর একটানা দেশে আটকে রইলাম। বিদেশি বন্ধুরা মাঝে মাঝে জানতে চাইতেন যে, আমি আর যাচ্ছি না কেন। তাদেরকে প্রকৃত কারণ জানিয়ে বলতাম, ৭ বছর সরকার আমাকে জন্মভূমিতে আসতে দেয়নি, এখন আর যেতে দিচ্ছে না।

জুলাই (১৯৯৪) মাসেই পাসপোর্টের জন্য ফি জমা দিয়ে দরখাস্ত করলাম। এক মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়; কিন্তু তিন মাস চলে যাওয়ার পরও পাসপোর্ট ইস্যু না হওয়ায় বোঝা গেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমি তাঁকে ফোন করিনি। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব নিলেন।

দেড় মাসব্যাপী অগণিত বার ফোন করা সত্ত্বেও পাসপোর্ট ইস্যু হচ্ছে না দেখে বিস্মিত হলাম। ফোন করলেই মন্ত্রী বলেন, ডাইরেক্টরকে বলে দিচ্ছি; হয়ে যাবে। ডাইরেক্টরকে ফোন করলে বলেন, এখনো মন্ত্রী কিছু বলেননি। নিজামী সাহেব বিরক্ত হয়ে মন্ত্রীকে হুমকি দিয়ে বললেন, এর জন্যও কি হাইকোর্টে মামলা করতে হবে? কয়েকদিন পর পাসপোর্ট অফিস থেকে জানানো হলো, পাসপোর্ট রেডি আছে, নিয়ে যান। বললাম, আজ আসতে পারছি না, আগামীকাল আসব। অফিস থেকে বলা হলো, মন্ত্রীর হুকুম, আজই পাসপোর্ট আপনার হাতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। বললাম, আজ আমি কিছুতেই আসতে পারছি না। অফিস থেকে বলা হলো, সন্ধ্যার পর আপনার বাড়িতে একজন অফিসার পাসপোর্ট পৌঁছিয়ে দেবেন। যথাসময়ে দু জন অফিসার এসে একটা রেজিস্টারে আমার দস্তখত নিয়ে পাসপোর্ট হস্তান্তর করলেন। একদিন পর নিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সেদিনই জোর করে দিয়ে গেলেন।

সৌদি আরব ও কুয়েত সফরের প্রস্তুতি

জামায়াতের সিদ্ধান্তক্রমে সৌদি আরব ও কুয়েত সফরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। জামায়াতের তৎকালীন বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের দায়িত্ব নিলেন। বাংলাদেশে প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীবের সময় থেকে তিনি ১৩ বছর সৌদি দূতাবাসের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করায় সেখানে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতি। তিনি রাষ্ট্রদূতের সাথে আমার সৌদি সফর সম্পর্কে আলোচনা করলে রাষ্ট্রদূত পরমার্শ দিলেন যে, আমি সস্ত্রীক সরকারি মেহমান (রয়াল গেস্ট) হিসেবে গেলেই ভালো হয়। সে ব্যবস্থাই করা হলো।

সৌদি আরব সফর শেষে কুয়েত হয়ে ঢাকায় ফিরে আসার উদ্দেশ্যে কুয়েতের ভিসাও সংগ্রহ করা হলো।

সৌদি আরব সফর

সফরের সময় আমি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও সে দেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সমাবেশে হাজির হওয়ার কারণে আমাকে যথেষ্ট কর্মব্যস্ত থাকতে হবে। তাই আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গ দেওয়ার প্রয়োজনে আমাদের বড় ছেলে মামূনকেও সাথে নেওয়া হয়। মামূন তখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কর্মরত। তাই তাকে ছুটি নিতে হলো।

আমার সফরসঙ্গী হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি জনাব আবু নাসেরও ছিলেন। এভাবে চার জনের টিম তৈরি হয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত হলো যে, চার জন একসাথে প্রথমে সৌদি আরবে যাব এবং সেখান থেকে মামূন ওর মাকে নিয়ে ঢাকা ফিরে আসবে। আর আমরা বাকি দু জন কুয়েত যাব।

১৯৯৫ সালের ৪ জানুয়ারি সৌদি বিমানে রওয়ানা হয়ে আমরা বিকালে রাজধানী রিয়াদ বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। সৌদি সরকারের ইসলামী অ্যাফেয়ার্স ও আওকাফ

বিভাগের মন্ত্রী ড. আবদুল্লাহ্ আবদুল মুহসিন আত্‌তুর্কি বিমানবন্দরে আমাদেরকে রয়াল গেস্ট হিসেবে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সাথে ডেপুটি মিনিস্টার ড. আবদুর রহমান আল মাতরুদী ও একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বিমানবন্দরে তাঁদের সাথে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে কুশল বিনিময় হলো। এ খবর সৌদি আরবের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়।

ড. তুর্কির সাথে ১৯৭৪ সাল থেকেই আমার পরিচয়। তখন তিনি রিয়াদ ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক রিডার ড. মোহর আলীকে নিয়ে ড. তুর্কির সাথে ১৯৭৪ সালে সাক্ষাৎ করেছিলাম। 'বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাস' লেখার জন্য ড. মোহর আলীকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হন। এ সুযোগ না পেলে The History of the Muslims of Bengal নামে বিশাল ইতিহাসগ্রন্থটি রচনা করা সম্ভব হতো না। বিশ্ববিদ্যালয় এ ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশ করে বিনামূল্যে সৌদি দূতাবাসের মাধ্যমে বিলি করেছে। ড. তুর্কির এ অবদান বাঙালি মুসলমানদের জন্য এক বিরাট সম্পদ।

আমার আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেক লোক জমায়েত হওয়ায় সৌদি সরকারের প্রটোকলের সহযোগিতায় তাদের সাথে মিলিত হই। তারা অত্যন্ত আবেগের সাথে আমার সাথে কোলাকুলি করতে চান। আমি তাদের আগমনের জন্য শুকরিয়া জানিয়ে তাদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে বিদায় নিই।

ড. তুর্কি আমাদের জন্য ইহরামের কাপড়, বেল্ট ও স্যান্ডেলের ব্যবস্থা করলেন। রিয়াদ বিমানবন্দরেই আমরা যথানিয়মে ইহরামের পোশাক পরে বিমানে জেদ্দায় রওয়ানা হলাম।

জেদ্দায় অবস্থান

জেদ্দা বিমানবন্দরে রাত সাড়ে নয়টায় বিমান থেকে অবতরণের সময়ই রয়াল প্রটোকল অফিসার আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানেই সৌদি আরবে কর্মরত জনাব শহীদুল ইসলাম আমাদের সাথে মিলিত হন। আমরা তাকে সৌদি আরব সফরে আমাদের টিমের একজন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করায় গোটা সফরে আমরা ৫ জন একসাথেই ছিলাম।

জেদ্দাস্থ রাষ্ট্রীয় মেহমানখানা Royal Conference Palace-এ আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। প্রটোকল অফিসার জানালেন যে, পরের দিন বিকালে ওমরার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে তিনি নিয়ে যাবেন।

প্যালেসের তৃতীয় তলায় আমার জন্য ফ্যামিলি স্যুট বরাদ্দ করা হলো এবং বাকি তিন জনের জন্য পৃথক পৃথক কামরা বরাদ্দ করা হলো। খাবার জন্য সবাই একসাথে নিচে গেলাম। খাবারের বিরাট আয়োজন। অনেক রকম খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন রকম মিষ্টান্ন ও বহু ফল যথাস্থানে রাখা আছে। বসে খাবার জন্য চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। সবাই যার যার পছন্দমতো খাবার জিনিস বাসনে নিয়ে খেলাম। পর্দার সাথে বসার জন্য কয়েকটি কেবিন ছিল। এর একটিতে আমি, মামূন ও ওর মা একসাথে বসে খেলাম।

নিচ তলায় বিরাট খালি জায়গা আছে। সেখানে বসার জন্য প্রচুর আসন সাজানো রয়েছে। অনেক উঁচুতে ছাদের সাথে ঝুলন্ত বিরাট ঝাড়টি দেখার মতো। আমরা মন্তব্য করলাম যে, এ ঝাড়টির মূল্য কত বিরাট অংক হতে পারে তা ধারণা করাও কঠিন।

নিচ তলায় জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে নামায আদায় করতে গেলে প্যালেসে চাকরিরত কয়েকজন বাংলাদেশি আমাদেরকে পেয়ে খুব খুশি হলেন।

মক্কা শরীফ গমন

৫ জানুয়ারি (১৯৯৫) নাস্তার পরই সরকারি মোটর কারে মক্কা শরীফ রওয়ানা হলাম। দু গাড়িতে প্রটোকল অফিসারসহ রওয়ানা হয়ে যোহরের নামাযের পূর্বে কাবা শরীফের অতি নিকটে Royal Guest Palace-এ গিয়ে পৌঁছলাম। জিনিসপত্র রিসিপশনে রেখে নামাযের জন্য হারাম শরীফে পৌঁছলাম।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম মক্কা শরীফ যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। সে বিবরণ জীবনে যা দেখলাম-এর তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৮ বছর পর যখন পৌঁছলাম, তখন নতুনের মতোই আবেগ অনুভব করলাম। কাবা শরীফের সাথে মুমিনের সম্পর্কটা তো গভীর আবেগেরই ব্যাপার। কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো, কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকা– এ সবই গভীর আবেগ-অনুভূতিরই বিষয়।

যোহরের নামাযের পর ওমরার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হওয়ার কথা। নামায শেষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখা গেল যে, মক্কা শরীফ ও সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ইসলামী আন্দোলনের বাংলাদেশি শ' তিনেক ভাই আমার সাথে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন। আমাকে পেয়ে তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস উথলে ওঠল। সবাই ইহরাম পরা অবস্থায় ছিলেন।

তাঁরা ঐসব লোক, যাঁরা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আমার নাগরিকত্ব সম্পর্কে দু বছর মামলা চলাকালে কাবা শরীফে সমবেতভাবে অনেক বার চোখের পানি বইয়ে আল্লাহর দরবারে দোআ করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই তারা আমাকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের বেশির ভাগই আমাকে এর আগে দেখেননি। জানা গেল, তাদের কেউ কেউ এককালে আমাকে গালিও দিতেন। সৌদি আরবে সংগঠনভুক্ত হওয়ার পর তাদের মনের পরিবর্তন হয়েছে।

ওমরাহ্ পালন

আমরা সবাই একসাথে ওমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে প্রথম কাবা ঘর তাওয়াফ করলাম। সাত চক্করের প্রথম ও শেষ চক্করে রয়াল গেস্ট হিসেবে আমাদের পাঁচ জনকে পুলিশের সাহায্যে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

তাওয়াফের পর সবাই একসাথে সা'ঈ করলাম। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়াতে আধা ঘণ্টা লেগে যায়। দু পাহাড়ে উঠে দোআ করতে সময় বেশি লাগালে আরো অধিক সময় লাগে। ওখানে প্রশস্ত জায়গায় একসাথে কয়েক শ' মানুষ চলতে কোনো অসুবিধা ছিল না বলে দল বেঁধেই আমরা সা'ঈ করলাম।

কিছু পেশাদার মুয়াল্লিম থাকেন, যারা টাকার বিনিময়ে ওমরা পালনকারীদেরকে তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় উচ্চৈঃস্বরে দোআ পড়েন এবং অন্যরা তার সাথে সাথে দোআ পড়তে থাকেন। আমরা পেশাদার কোনো মুয়াল্লিম নিয়োগ করিনি। মক্কায় কর্মরত চট্টগ্রামের ফারুক আযম চৌধুরী নামক দীর্ঘদেহী ও উচ্চকণ্ঠধারী এক ভাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুয়াল্লিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত চমৎকার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করছিলেন এবং তিন শ' লোক একসাথে তাকে অনুকরণ করায় অন্য সকল মানুষ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

হারাম শরীফে ছদ্মবেশে অনেক পুলিশ থাকে। আমাদেরকে এভাবে দল বেঁধে এত লোককে সা'ঈ করতে দেখে তারা বিব্রতবোধ করল। সরকারি প্রটোকল অফিসার পুলিশদেরকে বুঝিয়ে দিলে তারা শান্ত হন। পুলিশকে বলে দেওয়া হলো যে, বাংলাদেশ থেকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে এক 'শায়খ' এসেছেন, যাঁর বাংলাদেশি অনেক ভক্ত সৌদি আরবে রয়েছে। তাঁর আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশিরা ওমরায় এসেছে। হারাম শরীফে অবস্থানকালে রাজকীয় প্রটোকল ছাড়াও এক পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন পুলিশ আমাদের সাথে ছিলেন।

ওমরাহর সকল আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হওয়ার পর কাবা শরীফের পূর্ব চত্বরে সবাই সমবেত হন। পুলিশের সম্মতি ছাড়া হারাম শরীফের কোথাও কোনো সমাবেশ করা বা বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ। রাজকীয় প্রটোকলের সাহায্যে পুলিশের সম্মতি নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বললাম, 'ইসলামী আন্দোলনের সাথী হিসেবে আপনাদের সাথে ওমরাহ্ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা এসে আন্তরিক মহব্বতের যে পরিচয় দিলেন সেজন্য শুকরিয়া জানাই। নাগরিকত্ব মামলায় বিজয়ের জন্য আপনারা যে দোআ করেছেন তা আল্লাহ তাআলা কবুল করায় আজ আপনাদের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ঐ দোআর জন্য আল্লাহ্ তাআলা যেন আপনাদেরকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ দান করুন।'

এরপর সবাইকে নিয়ে দীর্ঘ দোআ করা হয়। দোআতে বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার হেফাজত, উন্নয়ন ও অগ্রগতি, জনগণের সার্বিক কল্যাণ এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর দুনিয়া-আখিরাতের মঙ্গল ও সাফল্যের জন্য অত্যন্ত কাতরভাবে মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করা হয়।

ওমরাহ সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা Royal Guest House-এ বরাদ্দকৃত কামরায় পৌঁছলাম। গেস্ট হাউজটি হারাম শরীফসংলগ্ন সামান্য উঁচু পাহাড়ের উপর। হজ্জ ও রমযানের সময় হারাম শরীফের নামাযের জামায়াত যখন গেস্ট হাউজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন গেস্ট হাউজে থেকেও জামায়াতে শরীক হওয়া যায়। সৌদি রাজবংশের লোকেরা হজ্জ করতে এলে তা-ই করেন বলে জানা গেল।

মক্কা শরীফে তিন দিন

আমরা তিন দিন মক্কা শরীফ থাকাকালে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য হারাম শরীফে যেতাম। বাংলাদেশি ভাইদের সাথে হারাম শরীফ থেকে শুরু করে গেস্ট হাউজের গেট পর্যন্ত কথাবার্তা বলার সুযোগ হতো। পুলিশ আপত্তি করায় গেস্ট হাউজের ভেতরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। লন্ডনে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে যেমন সিলেটের লোকই বেশি, তেমনি মক্কা শরীফে চট্টগ্রামের লোক বেশি। চট্টগ্রামের লোকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক সাতকানিয়া ও লোহাগাড়ার লোক। যখন জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি কোথায়? জবাব পাই, চট্টগ্রামে। আবার জিজ্ঞাসা করি, সাতকানিয়ায় নয় তো? জবাব দেয়, সাতকানিয়ায়ই তো। কেউ কেউ বলেন, আমি শাহজাহান চৌধুরীর লোক।

সংগঠনের ভাইয়েরা জানতে চাইলেন যে, তাদের সাথে সমাবেশে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না। এ বিষয়ে আবু নাসের ও শহীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সৌদি আরবে আমাদের সফরের শেষের তিন দিন রাজকীয় মেহমান থাকব না। মেহমান হিসেবে মদীনা ও রিয়াদে বেশ কিছু দিন থাকার পর শেষ তিন দিন আবার মক্কায় থাকব। তখন সংগঠনের ভাইদের মেহমান হিসেবে থাকব এবং সাংগঠনিকভাবে সমাবেশে মিলিত হব। আমরা হিসাব করে ঠিক করলাম, ১৭ জানুয়ারি মক্কা শরীফ ফিরে এসে রয়াল গেস্ট হাউজে উঠব এবং পরদিন সকালে সরকারি মেহমান হিসেবে বিদায় নেব।

কাবা শরীফের প্রধান ইমাম শায়খ আবদুল্লাহ সুবাইল হলেন হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনার দু হারাম শরীফ) কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর অফিসে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। তিনি মাওলানা মওদূদী (র)-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলেন। প্রসঙ্গক্রমে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কেও ধারণা নিলেন।

এ ইমাম সাহেব একবার সরকারি মেহমান হয়ে ঢাকা এলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন খান (আমার ভাগ্নি-জামাই) তাঁর অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করায় ইমাম সাহেবকে আমাদের মহল্লার মসজিদে একদিন ফজরের নামাযে ইমামতি করার জন্য সম্মত করা সম্ভব হয়। সরকারি প্রোগ্রামের বাইরে তিনি আসেন। কাবা শরীফের ইমাম ইমামতি করবেন শুনে মহিলাসহ অনেক লোক ফজরের নামাযে শরীক হন। নামায শেষে মসজিদসংলগ্ন বাড়িতে তাঁর সাথে নাস্তা করার সুযোগ পেলাম। ঐ বাড়িটি আমার ভগ্নিপতি মরহুম মাওলানা আলাউদ্দিন আযহারীর বাড়ি, যেখানে তাঁর জামাতা মোফাজ্জল বাস করে।

মক্কা শরীফের আসল আকর্ষণ বলতে গেলে একমাত্র আকর্ষণই হলো কাবা শরীফ, সাফা-মারওয়া, যমযমের কূপ ও বিশাল মসজিদ যার ভেতরেই উপরিউক্ত সব দর্শনীয় জিনিস। মক্কা শহরে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান তেমন কিছু নেই, যা দেখার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে কেউ যায়।

প্রটোকল অফিসার আমাদেরকে দেখানোর জন্য এক কারখানায় নিয়ে গেলেন, যেখানে কাবা শরীফের গেলাফ তৈরি করা হয়। সেখানে দেখা গেল, একদল লোক নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আর কতক লোক বেকার অবস্থায় সেখানে অবস্থান করছে। জানা গেল, এ বেকার লোকেরা এ কারখানা থেকে অবসরপ্রাপ্ত হলেও তারা প্রতিদিন এখানে এসে সময় কাটান। তারা নিয়মিত বেতন পান বলেই এখানে এসে তৃপ্তিবোধ করেন।

বহু বছর এ গেলাফ মিসরে প্রস্তুত করা হতো। মিসরের সামরিক স্বৈরশাসক কর্নেল জামাল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের ফলে সৌদি আরবের সাথে মিসরের সম্পর্কে ছেদ পড়লে মাওলানা মওদূদী (র)-এর পরামর্শে এক বছর পাকিস্তানে এ গেলাফ তৈরি করা হয় এবং মক্কায় পাঠানোর পূর্বে ট্রেনযোগে সারা পাকিস্তানে প্রদর্শন করা হয়। পাকিস্তানি জনগন এটাকে ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত একটা উৎসব হিসেবে গ্রহণ করে।

'রাবেতা আলমে ইসলামী' নামে বিশ্ব মুসলিমের একটি সংস্থার হেডকোয়ার্টার মক্কা শরীফে অবস্থিত। ওআইসি মুসলিম দেশগুলোর সরকারি প্রতিনিধিদের সংগঠন; কিন্তু 'রাবেতা আলমে ইসলামী' সকল দেশের মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। যেকোনো বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বকেই এর সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আমরা রাবেতা অফিসে মেহমান হিসেবে গেলাম। তখন সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী। তাঁর সাথে দেখা হলে বাংলাদেশে ইসলামের হাল সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়। এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল শেখ নাসের আল ওবুদী ও শেখ আমীন আল আত্তাসের সাথেও দেখা হলো। শেখ আল আত্তাসের পিতা শেখ

আকীল আত্তাস হজ্জের মুয়াল্লিম ছিলেন। আমি '৭২ সালে হজ্জের সময় তাঁকেই মুয়াল্লিম বানিয়েছিলাম। আমি পাকিস্তান থেকে ঐ হজ্জে গিয়েছিলাম। মাওলানা মওদূদীর মুয়াল্লিমও তিনিই ছিলেন।

ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী

ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী আমার পূর্বপরিচিত। জীবনে যা দেখলাম ৪র্থ খণ্ডের ২২/২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি, রিয়াদে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে ওয়ামি (WAMY) নামক আন্তর্জাতিক ইসলামী যুবসংগঠনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করি। তখন ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে আমার সভাপতিত্বে সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আমি সম্মেলনে একজন সক্রিয় ডেলিগেট হিসেবে কর্মরত থাকায় তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা বিস্তারিত জেনে নিলেন।

ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে এমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন যে, একসময় তাকে রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব দিয়ে ড. উসামা জাফর ফকীহকে IDB-এর প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল; দু বছর পরই আবার তাঁকে IDB-এর দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি এ পদে এখনো বহাল আছেন। তিনি বিরাট কর্মবীর হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য।

আমার বড় ছেলে মামূন ঐ ব্যাংকে Community Development Specialist হিসেবে কর্মরত। ১৯৯৯ সালে আমি আবার রয়াল গেস্ট হিসেবে গেলাম। বাংলাদেশ থেকে ভিজিট ভিসায় সৌদি আরব যেতে হলে সেখান থেকে স্পন্সরশিপ ছাড়া ঢাকাস্থ দূতাবাস ভিসা দেয় না। তাই মামূন তার পিতামাতার জন্য রেসিডেন্ট ভিসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বোধ করল। আমি এ বিষয়ে ড. আহমদ মুহাম্মদ আলীর নিকট পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন, এ ঝামেলার প্রয়োজন নেই। ঐ ভিসা প্রতি ৬ মাসে আপনাকে একবার আসতে বাধ্য করবে। আপনি যখনই আসতে চান তখনই আমাকে জানালে ভিজিট ভিসার ব্যবস্থা করে দেব।

২০০৩ সালে তাঁরই ভিসায় সাড়ে তিন মাস থেকে এলাম। এবার ২০০৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেড়-দু মাসের জন্য যাওয়ার ভিসার ব্যবস্থা তিনিই করে দিলেন।

৩০৩.

সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের নিকট আমার বক্তব্য

আমার এ সফরে সরকারি ও বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি যে বক্তব্য পেশ করেছি, এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো– বাংলাদেশে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেশ করা। ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। পাকিস্তান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত থাকায় এর বিভক্তিতে বাংলাদেশে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমার বক্তব্যের মর্মকথা নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশে জনগণের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলিম এবং মুসলিমদের সকলেই সুন্নী। শিয়া এত নগণ্য সংখ্যক যে, নেই বললেই চলে।

২. বাংলাদেশ মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এলাকা। এখানে ১৩ কোটি মুসলমান বাস করে। এত ক্ষুদ্র এলাকায় এত মুসলমান দুনিয়ার কোথাও নেই।

৩. হাজার হাজার মাদরাসায় প্রতি বছর লাখ লাখ আলেম তৈরি হচ্ছে। আড়াই লাখ মসজিদ রয়েছে।

৪. ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পৃথক হয়ে ইসলামের নামে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাঙালি মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল।

৫. পশ্চিম পাকিস্তানিদের কুশাসন ও ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং পূর্ব পাকিস্তানিদের নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও বামপন্থি দলগুলো জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায়।

৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগকে শতকরা ৯০ ভাগ ভোট দিয়ে বিজয়ী করে; কিন্তু এ দল পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি। অপরদিকে মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী হয়; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তার দল একটি আসনও পায়নি।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে। সে হিসেবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে শেখ মুজিবের দলই মেজরিটি হওয়ায় তাঁরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান জেনারেল ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে বলে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। কিন্তু মি. ভুট্টো পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা হওয়া পছন্দ করেননি। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়ার সাথে যোগাযোগ করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে, শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে

৬

সম্পূর্ণ অচল করে ফেললেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এ বিদ্রোহ দমনের অপচেষ্টা চালায়।

নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আটক রাখে। ১৯৭০ সালে জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত দিল, তা জেনারেল ইয়াহইয়া খান বুলেটের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। জনগণের নিকট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান দখলদার হিসেবে গণ্য হয়।

গণ-প্রতিনিধিগণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নিকট ধরনা দেন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী থেকে মুক্ত করার আবেদন জানান।

পাকিস্তানের চিরদুশমন ভারত সরকার পাকিস্তানকে ভেঙে দু টুকরা করার এ মহাসুযোগ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে গ্রহণ করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর স্বাধীনতা আন্দোলন চাপিয়ে দেন, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হয়। ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করে।

স্বাধীনতা লাভের পর

স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিব ক্ষমতাসীন হন। জনগণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্বেচ্ছাচার শুরু করেন। দেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইসলামের নামে রাজনৈতিক দল করা শাসনতন্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক' বিলুপ্ত করা হয়। জনগণের নিকট এ সরকার ইসলামবিরোধী হিসেবে পরিচিত হয়ে গেল।

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বামপন্থিদের কুপরামর্শে তিনি ১৯৭৫ সালের শুরুতেই সংবিধান সংশোধন করে সোভিয়েট রাশিয়ার আদলে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করে গণতন্ত্রকে হত্যা করলেন। ঐ বছর আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁকে হত্যা করে। সারা দেশে জনগণ প্রকাশ্যে এমন উল্লাস প্রকাশ করে যে, কোথাও কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি।

ঐ বছর নভেম্বরের ৩ তারিখে এক ব্রিগেডিয়ার সেনাপ্রধানকে বন্দী করে ক্ষমতা দখল করেন। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা বিদ্রোহী হয়ে তাকে হত্যা করে এবং সেনাপ্রধানকে মুক্ত করে সেনা ছাউনি থেকে বের হয়ে রাজপথে মিছিল করে আসলে রাজধানীর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে শাসক হিসেবে মেনে নেয়।

বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি সরকারের পলিসি

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে আমি প্রথম হজ্জ করি। হজ্জের পরপর ১৯৭৩ সালের জানুয়ারির শুরুতেই জেদ্দায় বাদশাহ্ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে জানালেন, 'পাকিস্তান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশ ঐ ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদকে শাসনতন্ত্র থেকে খারিজ না করা পর্যন্ত আমরা এ দেশকে স্বীকৃতিই দেব না। ১৯৭৫ সালে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়নি। জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে রিয়াদে বাদশাহ্ খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। বাদশাহ্ বলে দিলেন, 'শাসনতন্ত্র থেকে ইসলামবিরোধী আদর্শ খারিজ করলেই আমরা রাষ্ট্রদূত পাঠাব'। জিয়াউর রহমান শাসনতন্ত্র সংশোধন করার পর ঐ বছরই শেষের দিকে সৌদি রাষ্ট্রদূত ঢাকায় আসেন।

শাসনতন্ত্র সংশোধনের সুফল

ঐ সংশোধনীর ফলে শাসনতন্ত্রের শুরুতেই 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' সংযোজন করা হয়; ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বদলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা' এবং সমাজতন্ত্রের বদলে সামাজিক সুবিচার' লেখা হয়; ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন বৈধ করা হয়।

এ সংশোধনীর ফলেই জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে কর্মতৎপর হয়েছে। নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক-কৃষক সকল মহলে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন চালু হয়েছে। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকায় জনগণ স্বাধীন মনোভাব নিয়ে যেকোনো দলে যোগদান করতে পারে।

মুসলিম জনগণ ইসলামের পক্ষে বলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলও নির্বাচনের সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্লোগান দেয়, যাতে তাদেরকে ইসলামবিরোধী মনে করা না হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচনপদ্ধতি

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচনে বিজয়ী দল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন হয়। মেয়াদ শেষে আবার যখন নির্বাচন হয় তখন দলীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। বাংলাদেশেও এ নিয়মই চালু ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, দলীয় প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রশাসনের উপর চাপ প্রয়োগ করে নির্বাচনে কারচুপি করার ব্যবস্থা করে।

নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী ১৯৮৩ সালে এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবটি হলো, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির

নেতৃত্বে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। ১৯৯০ সালে সকল রাজনৈতিক দল এ প্রস্তাবটি সমর্থন করায় ১৯৯১ সালে এ পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোনো দেশে এ পদ্ধতি চালু নেই। বাংলাদেশে এ পদ্ধতি জনপ্রিয় হওয়ায় অন্যান্য দেশেও এ পদ্ধতিটি বিবেচনাধীন আছে। যেসব দেশে নতুন করে গণতন্ত্র চালু হচ্ছে সেসব দেশেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে মতামত গড়ে ওঠছে।

এ পদ্ধতির ফলে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে আসীন থাকার কোনো অবকাশ নেই। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য। আবার নতুন কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হয়। যে দলই নির্বাচিত হয় সে দল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় থাকে।

ভারতের আধিপত্য সম্পর্কে সতর্কতা

বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করার জন্য ভারত এত উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র নীতিতে ভারতের লেজুড় হয়ে থাকুক, এটাই ভারত চায়। ভারত বাংলাদেশকে তার পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসেবে দেখতে চায়। শেখ মুজিবের আমলে এ অবস্থাই ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে এ অবস্থা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা চলে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ জনগণের নিকট ভারতপন্থি দল হিসেবেই পরিচিত। জিয়াউর রহমানের বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ভারতের আধিপত্য থেকে দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। জনগণ ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে না। মুসলিম বিশ্বকে এ বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে ভারতের আধিপত্য বাংলাদেশে বৃদ্ধি না পায়।

বাংলাদেশ সম্পর্কে উপরিউক্ত বিষয়গুলো সময়-সুযোগমতো সৌদি আরবের সরকারি ও বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

জেদ্দায় তৎপরতা

৭ জানুয়ারি কাবা শরীফে ইশার নামায আদায় করার পর রাজকীয় প্রটোকলের সাথে আমরা জেদ্দায় ফিরে যাই। রয়াল কনফারেন্স প্যালেসেই গিয়ে উঠি। একদিন পর মদীনায় যাওয়ার কথা। পরের দিন ৮ তারিখে দু জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়।

একজন হলেন লেবার ডেপুটি মিনিস্টার। মক্কায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয় যে তারা বেতন, থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে খুব অসুবিধা ভোগ করছেন। এ বিষয়ে লেবার ডেপুটি মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। পরে জানতে পারলাম যে, তাদের অসুবিধা লাঘব হয়েছে।

অপরজন হলেন ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (IDB) প্রেসিডেন্ট ড. ওসামা জাফর ফকীহ। বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকার এ ব্যাংকের মালিক। সৌদি সরকারের শেয়ারই সবচেয়ে বেশি।

জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওআইসি নামক রাষ্ট্রসংঘের ৫৭টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশের পুঁজি নিয়ে ব্যাংক শুরু হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য সদস্য দেশ মালিকানায় শরীক হয়। মালিকানার শতকরা ২৪ ভাগ সৌদি আরবের। বাংলাদেশ মাত্র ১.৩৫%-এর মালিক।

এ ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো এর সদস্য দেশসমূহের সরকারের পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রকল্প ও বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করা।

বর্তমানে প্রতি বছর আমেরিকান মুদ্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ পুঁজি এ ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা হয়।

এ ব্যাংক ইসলামী অর্থনৈতিক বিধি অনুযায়ী চলে। সদস্য দেশগুলোই এ ব্যাংকের গ্রাহক। তাদের নিকট থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের হারের চেয়ে কম হারে পুঁজি ফেরত নেওয়া হয়।

১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত IDB মোট ৪২ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করেছে।

এ ব্যাংক মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের মেধাবী মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করে। প্রতি বছর দেড় কোটি ডলার এ খাতে ব্যয় করা হয়। এ পর্যন্ত ১০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে।

মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নরতরাই এ বৃত্তি লাভ করে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা অধ্যয়ন করে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ভারতীয় মুসলমান এ বৃত্তি পায় এবং তারা নিজ দেশেই শিক্ষা লাভ করে। আমার বড় ছেলে মামূন IDB-এর এ স্কলারশিপ বিভাগেই কর্মরত। তার অন্যতম দায়িত্ব হলো বৃত্তিপ্রাপ্তদেরকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে ওকে ঐসব দেশে সফর করতে হয়, যেখানে বৃত্তিপ্রাপ্তরা শিক্ষা লাভের জন্য অবস্থান করে। প্রতি বছর আড়াই শ' ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

IDB-তে মামূনের চাকরি

১৯৯৫ সালে মামূন ওর আম্মাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই গিয়েছিল। জেদ্দা যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সে আমাকে না জানিয়েই IDB-তে গিয়ে কয়েক বছর পূর্বে প্রেরিত ওর দরখাস্তের খোঁজ-খবর নিল। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি নেওয়ার সময় নাকি সে Islamic Banking সম্পর্কে থিসিস পেশ করেছিল এবং ঐ সুবাদে IDB-তে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল। এসব আমি কিছুই জানতাম না।

ব্যাংকে কর্মরত সিদ্দীকুর রহমান নামে ইন্দোনেশিয়ার একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে আমার পরিচয় ছিল। তিনি ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে জেদ্দায় আমার সাথে পরিচয় হয়। মামূন তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি আমার পরিচয় পেয়ে সহযোগিতা করেন। কোনো কাজ সমাধা হওয়ার ফায়সালা যদি

আল্লাহ করেন তাহলে কাকতালীয়ভাবেই সবকিছু হতে থাকে। আমি মামূনকে নিয়ে যাইনি এবং সিদ্দীক সাহেবের সাথে পরিচয় করাইনি। কেমন করে তাদের মধ্যে পরিচয় হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা পাওয়া গেল।

এ সাক্ষাতের পর মামূনকে IDB ইন্টারভিউর জন্য ডাকল। ১৯৯৬ সালের ১ মার্চ মামূন চাকরিতে যোগদান করল।

মদীনা শরীফ সফর

৯ জানুয়ারি (১৯৯৫) রাজকীয় প্রটোকল আমাদেরকে বিমানে জেদ্দা থেকে মদীনায় নিয়ে গেল। গ্রিন প্যালেস নামে রাজকীয় গেস্ট হাউজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

রাসূল (স)-এর মাযার যিয়ারতে সবসময় ভিড় থাকে। সরকারি মেহমানদেরকে যিয়ারত করতে নিয়ে গেলে পুলিশ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মেহমানদেরকে সুযোগ করে দেয়। সরকারি মুআল্লিম সেখানে দোআ ইত্যাদি পড়িয়ে দেয়।

মহিলাদের জন্য যিয়ারতের নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়। তখন সেখানে কোনো পুরুষকে যেতে দেওয়া হয় না। আমার স্ত্রীকে প্রটোকল যথাসময়ে যিয়ারতের ব্যবস্থা করে দেয়। গ্রিন প্যালেস হারাম শরীফের নিকটে থাকায় প্রতি নামাযে আমরা যথাসময়ে সহজে শরীক হতে পেরেছি।

আমরা তিন দিন মদীনা শরীফে ছিলাম। আমাদের বেশ ব্যস্ততাই ছিল। মক্কা শরীফে এত যিয়ারতের জায়গা নেই, যত মদীনা শরীফে আছে। রাজকীয় প্রটোকলের সাথে আমরা কুবার মসজিদ (এখানে রাসূল (স) হিজরত করে এসে পৌঁছলে মদীনাবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিছিলেন), বদর ও উহুদ যুদ্ধে শহীদদের মাযার, মদীনার মসজিদের কাছে জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থান (এখান থেকে ৭০ হাজার সাহাবী হাশরের দিন উঠবেন), মসজিদে কিবলাতাইন নামক মসজিদ এখানে যোহরের নামাযের জামায়াত চলাকালে বাইতুল মুকাদ্দিস থেকে মক্কার বাইতুল হারামের দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশসম্বলিত আয়াত নাযিল হয় ইত্যাদি স্থান যিয়ারত করলাম।

কিং ফাহদ হলি কুরআন কমপ্লেক্স

'কিং ফাহদ হলি কুরআন কমপ্লেক্স' নামে মদীনা শরীফে বিশাল এক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমাদেরকে তা দেখানোর জন্য নিয়ে গেলে সেখানকার দায়িত্বশীল ড. মুহাম্মদ সালেম আল আওফী আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং গোটা কমপ্লেক্সটি ঘুরিয়ে দেখান। শেষে একটি মঞ্চে আমাদেরকে হাজির করা হয়, যেখান থেকে দেখা গেল যে, অগণিত আধুনিক প্রেসে কাজ চলছে। একজন দায়িত্বশীল মাইকে কমপ্লেক্স-এর কর্মতৎপরতার বিবরণ দিলেন। মাইকে আমাদেরকে মন্তব্য প্রকাশ করার অনুরোধ জানালেন।

আমরা অনুভব করলাম যে, এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। এখানে কর্মরত কয়েকজন বাংলাদেশি আমাদেরকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সাক্ষাৎ করলেন।

এখান থেকে কোটি কোটি কুরআন মাজীদ বিভিন্ন সাইজে প্রকাশিত হয়ে বিনামূল্যে সমগ্র বিশ্বে বিলি হচ্ছে; বহু ভাষায় কুরআনের তাফসীর প্রকাশিত হয়ে বিনামূল্যে বিলি হচ্ছে। কুরআনের এ বিরাট খিদমত আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। বিদায়ের সময় আমাদেরকে ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত তাফসীর উপহার দেওয়া হয়। এ কমপ্লেক্সটি দেখে আমরা সত্যিই অভিভূত।

জান্নাতুল বাকী' যিয়ারত

মসজিদে নববীর নিকটেই 'জান্নাতুল বাকী' নামে বিশাল কবরস্থান। এখানেই রাসূল (স)-এর বিবিগণের কবরসহ বহু সাহাবীর কবর রয়েছে। তুর্কি শাসনামলে বিশিষ্ট সাহাবীগণের কবরের উপর সুদৃশ্য ইমারত তৈরি করা হয়েছিল, যা করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বাদশা আবদুল আযীয ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সকল ইমারত ধ্বংস করা হয়। শুধু এক-একটি পাথর খাড়া করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে কবর আছে। কার কবর কোনটি তা কোথাও লেখা নেই। ওসমান (রা)-এর কবরটি চারদিকে পাথর দিয়ে চিহ্নিত আছে।

আমরা কবর যিয়ারতের সময় মাওলানা আবদুল আযীয শারকী থেকে জানতে পেরেছি যে, কোনটি হযরত ওসমানের কবর। এ কবর যিয়ারতের সময় মাওলানা শারকী একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, মাওলানা মওদূদী (র) এই কবর যিয়ারতের সময় অঝোরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী আছ যে, আমি তোমার এ বান্দাহর বিরুদ্ধে কোনো অসম্মানজনক কথা লিখিনি। কতক লোক আমার বিরুদ্ধে এ মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রচারণা চালিয়েছে। আমি এ কবরবাসীকে তেমনই মহব্বত করি, যেমন একজন মুমিনের করা উচিত।

'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডের ২১৯ পৃষ্ঠায় 'মাওলানা শারকী' শিরোনামে তাঁর পরিচয়ে আমি লিখেছি, তিনি ইসলামী আন্দোলনে মাওলানা মওদূদীর ঐ পাঁচ জন প্রাথমিক ঘনিষ্ঠ সাথির একজন, যাঁরা জামায়াতের সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর 'দারুল ইসলাম' নামক কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। চরম আশেকে রাসূল ছিলেন। তাঁর রচিত না'তে রাসূল মসজিদে নববীর এমন এক স্থানে বসে তিনি আমাকে শুনিয়েছেন, যেখান থেকে রাসূল (স)-এর মাযারের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজ দেখা যায়। তিনি আমার পিতৃতুল্য মুরব্বি ছিলেন। জান্নাতুল বাকী'তে সমাধিস্থ হওয়ার নিয়তে মাওলানা মওদূদীর অনুমতি নিয়ে তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পর সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

৩০৪.

মদীনায় মোমেনের সাথে দেখা

আমার তৃতীয় ছেলে মোমেন সপরিবারে ম্যানচেস্টার যাওয়ার পথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব আসে। আমাদের মদীনায় অবস্থানকালে সে গ্রিন প্যালেসে এসে দেখা করল। বৌমা নাহার, ১০ বছরের নাতি আনাস ও ৭ বছরের নাতনী শাম্মা মেহমান হিসেবে আমাদের সাথে খেল। খাবার এল মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরীর কন্যার বাসা থেকে। আমরা রাজকীয় মেহমান হিসেবে এক ধরনের খাবার খাচ্ছিলাম। দেশি খাবার পেয়ে আনন্দের সাথেই সবাই খেলাম।

মোমেন আমাদের আগেই মদীনায় পৌঁছেছে। প্রথমে ওরা মক্কা শরীফে গিয়ে ওমরা করে মদীনায় এসেছে। আমাদের সাথে দেখা হওয়ার পরই ওরা মক্কায় ফিরে গেল। সেখান থেকেই জেদ্দা হয়ে তারা ম্যানচেস্টারে পৌঁছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ সালেহ আবদুল্লাহ আল ওবায়দ তাঁর অফিসে আমাদেরকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়নে মাওলানা মওদূদীর অবদান ছিল বলে তিনি আজীবন এর একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। সে সুবাদেই আমি জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হই। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব কয়েকজন শিক্ষককেও আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেন। তিনি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সম্পর্কে অবহিত করেন। দুনিয়ার বহু দেশ থেকে বিনা খরচে মুসলিম ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে।

বাংলাদেশ থেকেও ইতোমধ্যে কয়েক ব্যাচ ছাত্র মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে দেশে বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন।

বিদেশি ছাত্ররা সেখানে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পায়। হোস্টেলে বিনা খরচে থাকে। দেশে আসা-যাওয়ার বিমান ভাড়া পায়। তদুপরি মাসিক এ পরিমাণ বৃত্তি পায়, যা থেকে হোস্টেলের খাবারের ব্যয় বহন করা ও প্রয়োজনীয় হাত খরচ স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।

আমার সুপারিশে বহু ছাত্র বাংলাদেশ থেকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুকরিয়া জানালাম। ঐ সময় বাংলাদেশি যারা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, তাদের সাথেও দেখা হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অবদান স্বীকার করে। সেখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে যারা বাংলাদেশে কর্মরত আছেন, তারা দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের একসময়ের কেন্দ্রীয় তারবিয়ত সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল গাফফার হাসান ঐ সময় মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি তখন জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে গেলেও পূর্বপরিচিত হিসেবে আমার সাথে খুবই মহব্বতের সাথে কথা বলেছেন।

সৌদি সরকারের নিকট মাওলানা মওদূদীর পরামর্শ

বাদশাহ ফায়সালের বড় ভাই বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযীয ক্ষমতাসীন থাকাকালে মাওলানা মওদূদী (র) তাঁকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন :

১. মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সরকারের প্রতিনিধিদের একটা সংগঠন প্রয়োজন, যাতে জাতিসংঘে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় এবং উম্মাহর উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করা যায়।

২. প্রত্যেক দেশের ইসলামপন্থিদের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন, যেটা গোটা মুসলিম উম্মাহর আস্থা অর্জন করতে পারে। এ সংস্থাটি দীনী ব্যাপারে উম্মতের নেতৃত্ব দেবে এবং দীনী ইস্যুতে উম্মতের করণীয় নির্দেশ করবে।

৩. এমন একটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন, যা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষা করবে। ইসলাম ও মুসলিমদের চির দুশমন ইহুদিরা গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মোকাবেলা করার উপযোগী একটি সংস্থা প্রয়োজন, যার উপর মুসলিম উম্মাহ আস্থা স্থাপন করতে পারে।

৪. এমন একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা প্রয়োজন, যেখানে আধুনিক বিশ্বে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে তুলে ধরার যোগ্য লোক তৈরি হবে। সকল দেশ থেকেই এ উদ্দেশ্যে মেধাবী ছাত্রদেরকে এ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ দিতে হবে।

৫. সৌদি আরবকে মুসলিম বিশ্বের মডেল হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতির নমুনা হিসেবে যাতে সৌদি আরব মুসলিম উম্মাহর আস্থা অর্জন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে জনপ্রতিনিধিদের সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বাদশাহ ফায়সালের শাসনামলে ১, ২ ও ৪ নং পরামর্শ অনুযায়ী ওআইসি, রাবেতা আলমে ইসলামী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য যে মহান উদ্দেশ্যে এসব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা এখনো যথার্থভাবে পূরণ হয়নি। ৩ ও ৫ নং পরামর্শ এখনো বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি।

মদীনার চিফ জাস্টিসের সাথে সাক্ষাৎ

মদীনার চিফ জাস্টিস একই সাথে মসজিদে নববীর খতীবও। রয়াল প্রটোকলই তাঁর অফিসে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। চিফ জাস্টিস আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'গাহওয়া' খাওয়ালেন এবং উদ কাঠের সুগন্ধি দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়ন করলেন।

তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন। শেখ মুজিব মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করার কথা জেনে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' বলে ওঠলেন। সৌদি সরকারের চাপে এ দুটো ইসলামবিরোধী মতবাদ উৎখাত হয়ে যাওয়ার কথা শুনে উচ্চৈঃস্বরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন।

ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তা জেনে আমাদেরকে উৎসাহ দিলেন এবং আমাদের জন্য দোআ করলেন।

বাংলাদেশিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

মদীনায় আমাদের তিন দিন অবস্থানকালে সেখানে কর্মরত বহু বাংলাদেশির সাথে মসজিদে নববীতে এবং গেস্ট হাউজ থেকে মসজিদে যাওয়া-আসার পথে দেখা হয়েছে। যারা সংগঠনের সাথে জড়িত তারা গেস্ট হাউজেও এসেছেন। বিশেষ করে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্ররা অত্যন্ত উৎসাহ ও আবেগের সাথে দেখা করেছে। ঐ সময় বাংলাদেশি ছাত্রদের মধ্যে যারা শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত ছিল তাদের অধিকাংশই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৯০-৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় যাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, তারা বাংলাদেশ থেকে শুধু আহলে হাদীসদেরকে সুযোগ দিচ্ছে। তাই নিচের বর্ষগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের লোক খুবই কম ছিল।

রিয়াদ রওয়ানা

আমি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বহু বার মদীনায় হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তবু এবার মাত্র তিন দিনে যেন মোটেই মন ভরল না। বেশ কয়েক বার মদীনায় ৮/১০ দিন থেকেছি। প্রোগ্রামের তাগিদে এবার মাত্র তিন দিন থাকার পরই রিয়াদ চলে যেতে হলো। শেষ রাতে রাওযাতুল জান্নাতে নামায ও দোআ এবং রাসূল (স)-এর মাযার যিয়ারতের মজা যে পেয়েছে তার পক্ষে মদীনা ছেড়ে যাওয়া বিরাট মানসিক যাতনার বিষয়। তবু যেতেই হয়। ১১ জানুয়ারি (১৯৯৫) বিমানযোগে রিয়াদ যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমরা সে উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর মাযার শরীফে বিদায়ী সালাম জানালাম।

রিয়াদ পৌঁছলাম

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছার পর রাজকীয় প্রটোকল আমাদেরকে সরকারি মেহমানখানা 'রিয়াদ কনফারেন্স প্যালেস'-এ পৌঁছিয়ে দিল। সরকারের পক্ষ থেকে মেজবানের দায়িত্ব যিনি পালন করছিলেন তিনিই ঢাকা থেকে রিয়াদ পৌঁছার দিন বিমানবন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর অফিসে আমাদের সাথে ফরমাল সাক্ষাতের মাধ্যমে রিয়াদের কর্মসূচি শুরু হলো। ১১ তারিখ সন্ধ্যায় রিয়াদ পৌঁছলাম এবং পরের দিন ১২ জানুয়ারি ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স ও আওকাফ মন্ত্রী ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত-তুর্কি তাঁর অফিসে আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মক্কা ও মদীনার সফর কেমন লাগল জানতে চাইলেন। সরকারি প্রটোকলের পরিচালনায় আমরা অত্যন্ত আরামে মক্কা-মদীনার যিয়ারত সমাধা করতে সক্ষম হয়েছি বলে শুকরিয়া জানালাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালে তিনি ড. মোহর আলীকে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস লেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং সে বিরাট ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের মুসলমানদের যে বিরাট খিদমত করেছেন, এর জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, 'এটা এমন এক ঐতিহাসিক অবদান, যার জন্য সৌদি আরবকে বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।'

ওয়ামি অফিসে সম্বর্ধনা

ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (WAMY)-এর হেডকোয়ার্টার রিয়াদেই। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলনের মাধ্যমে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। উক্ত সম্মেলনে আমি একজন ডেলিগেট ছিলাম। ৮৩টি দেশের ইসলামী যুবসংগঠনের প্রতিনিধিদের ঐ সম্মেলনে যারা ডেলিগেট হিসেবে এসেছিলেন, তাঁদের প্রথম অধিবেশনে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর WAMY-এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ড. আবদুল হামীদ আবু সুলায়মান। ১৯৭৩ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েক বার সেখানে গিয়েছি বিধায় পুরনো স্টাফদের নিকট আমি পরিচিত ছিলাম।

১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে ওয়ামি'র দাওয়াতে তাদের অফিসে গেলাম। সেক্রেটারি জেনারেল ড. মানে আবদুর রহমান আল জোহানী আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ড. জোহানী একবার ঢাকা এসেছিলেন বিধায় সরাসরি পরিচয় হয়েছিল। ওয়ামি'র কেন্দ্রীয় অফিসের হল রুমে সমবেত ১৫/২০ জনের উপস্থিতিতে ড. জোহানী আমাকে সবার সাথে পরিচিত করান। রাবেতা অফিসের কর্মকর্তারাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ওয়ামি'র অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ড. ইবরাহীম আল কুয়াইদ ও ওয়ামি'র রিয়াদ অফিসের ডাইরেক্টর ড. আবদুল ইলাহ আল মুয়াইয়েদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেক্রেটারি জেনারেল আমাকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে যাকিছু বললেন, জবাবে আমি তাঁদের শুকরিয়া জানালাম। ওয়ামি'র প্রতিষ্ঠালগ্নে আমার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করলে সবাই আনন্দ প্রকাশ করেন। আমি বাংলাদেশের অবস্থা ও ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিলাম। আমার সফরসাথি জামায়াতের বিদেশ বিভাগের সেক্রেটারি আবু নাসেরের সাথে সবার পরিচয় হলো। সব সাক্ষাতেই তার এ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সৌদি গ্র্যান্ড মুফতীর সাথে সাক্ষাৎ

মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজীজ বিন বায সৌদি সরকারের গ্র্যান্ড মুফতি। সে দেশের আলেমসমাজ তাঁকে শ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে শ্রদ্ধা করে। অত্যন্ত প্রখর মেধাবী হিসেবে তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সে ইসলামী উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে খ্যাতি অর্জন করেন; কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। দীনের যে ইলম তিনি হাসিল করেছেন এর ভিত্তিতেই জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখতে তিনি সক্ষম হন।

১৯৭২ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জামায়াতের বাংলাদেশি দায়িত্বশীলদের সাথে হজ্জ উপলক্ষে আমি লন্ডন থেকে মক্কায় এসে মিলিত হতাম। কয়েক বারই হজ্জের পর মক্কায় অথবা রিয়াদে শায়খ বিন বাযের সাথে দেখা হয়েছে। তিনি মাওলানা মওদূদীকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তাঁর সাথে ১৯৭৩ সালে প্রথম সাক্ষাতেই বুঝতে পারলাম যে, মাওলানা মওদূদীর কারণেই তিনি আমাকে এত গুরুত্ব দিলেন। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি আশা করেছিলেন, পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠবে।

তাঁর সাথে কয়েক বার সাক্ষাতের মাধ্যমে আমি এতটা স্নেহধন্য হই যে, বাংলাদেশের কেউ তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, 'কাইফা আখী গোলাম আযম?' (আমার ভাই গোলাম আযম কেমন আছেন?) পীর মুহসিনুদ্দীন দুদু মিয়া একবার তাঁর কাছে গেলে তাঁকেও তিনি এ প্রশ্ন করেন। এ কথা মাওলানা মাযহারুল হক দেওবন্দী আমাকে বলেছেন। ইত্তেহাদুল উম্মাহর কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারি হিসেবে মাওলানা মাযহার পীর সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে পীর সাহেবই তাঁকে এ কথা জানিয়েছেন।

এ সফরে রাজকীয় প্রটোকলের মাধ্যমে শায়খ বিন বাযের সাথে ফরমালি সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। ১৭ বছর পরে সাক্ষাৎ হলেও তিনি অত্যন্ত সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বাংলাদেশে নাগরিকত্বহীন অবস্থায় আমার পড়ে থাকার কথা তিনি জানতেন। নাগরিকত্ব পুনর্বহাল হওয়ায় আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। বাংলাদেশের বর্তমান

হাল, ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি, আমার ব্যক্তিগত খবরাখবর ইত্যাদিও তিনি জানতে চাইলেন।

আমার নির্বাসিত জীবনে পাকিস্তানি পাসপোর্টেই আমাকে সফর করতে হয়েছিল। '৭২ সালে নেওয়া পাসপোর্টের ৫ বছর মেয়াদ শেষ হলে লন্ডনস্থ পাকিস্তানি হাই কমিশনে পাসপোর্ট নবায়ন করতে গেলে হাই কমিশনার মুসলিম লীগের সাবেক নেতা মমতায দৌলতানা থেকে জানা গেল যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মি. ভুট্টো আমার পাসপোর্টের মেয়াদ মাত্র ৬ মাস বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। আইয়ূববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একসাথে সফর ও জনসভায় বক্তৃতা করায় মি. দৌলতানার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

ছয় মাসের পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবে গেলাম। শায়খ বিন বাযকে পাসপোর্ট সমস্যা সম্বন্ধে জানালাম। তিনি বললেন, আপনি যদি সৌদি নাগরিক হতে চান তাহলে আমি বাদশাহকে বলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। চিন্তা-ভাবনা করে পরে এ বিষয়ে জানাব বলে বিদায় নিলাম। যোগ্য পরামর্শদাতা হিসেবে আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুমকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বাদশাহ ফায়সালের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবং তিনিই ১৯৭৩ ও '৭৪ সালে বাদশাহ ফায়সালের কাছে আমাকে নিয়ে যান। তিনি বললেন, আপনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সৌদি নাগরিক হলে রাজনৈতিক জীবন খতম হয়ে যাবে। তাঁর এটুকু কথায়ই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, শায়খ বিন বাযকে এ বিষয়ে আর কিছুই বলব না।

শায়খ বিন বাযের অফিসে আমাদের সাথে তিনি তাঁর অফিসের অন্য দায়িত্বশীলদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাতে তাঁর বাসায় খাবারের দাওয়াত দিলেন। এর আগেও বেশ কয়েক বার সেখানে দাওয়াত খেয়েছিলাম। স্টিলের বিশাল খানচায় স্তূপ করে রাখা পোলাও এবং চারপাশে কতক পেয়ালা খানচার ভেতরেই বসানো আছে। পেয়ালায় বিভিন্ন রকম সালুন। খানচার চারপাশে ৭/৮ জন বসে খানচা থেকে খেলাম। নিজস্ব বাসনে খাবার অভ্যাস আমাদের। সেখানে আরবদের পদ্ধতিতেই খেলাম। খাওয়া শেষ হলে দেখা গেল, প্রায় অর্ধেক পোলাও রয়ে গেছে।

ড. আহমদ তুতুনজির সাথে সাক্ষাৎ

ড. আহমদ তুতুনজি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছেন। ওয়ামি গঠনকালে তিনি রিয়াদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অত্যন্ত কর্মতৎপর ব্যক্তি হিসেবে ওয়ামি'র প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি অনেক দিন ওয়ামি'র সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭২ সালে আমি হজ্জ উপলক্ষে পাকিস্তান থেকে সৌদি আরবে আসার পর মদীনা শরীফে অবস্থানকালে ড. তুতুনজিই আমাকে ওয়ামি সম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৭৩ সালে তিনি লিবিয়ার ত্রিপলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালে সেখানেও আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে যোগদানের জন্য লন্ডনে তিনিই আমাকে দাওয়াতনামা পাঠিয়েছেন।

১৯৯৫ সালে যখন আমরা রিয়াদ গেলাম, তখন তিনি আলরাজহী কোম্পানির দাওয়াত ও সমাজসেবা বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন এবং বিশ্বের ইসলামী সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহযোগিতা দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বেসরকারি ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে রাজকীয় প্রটোকলের মাধ্যমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা যায়নি; কিন্তু আমরা প্রাইভেট ব্যবস্থায় প্রটোকলকে না জানিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির লোক। হাসিমুখে কথা বলে অতি সহজেই সবাইকে আপন করে নেন। আমাদেরকে দেখে অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সাথে কোলাকুলি করলেন।

তিনি গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরিচিত। বহু দেশে দীনের খাতিরেই সফর করেছেন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মেলনে কয়েক বার এসেছেন। আমার সাথে এখনো পত্রযোগাযোগ রয়েছে। তিনি আমেরিকায় বেশ কয়েক বছর ছিলেন। বর্তমানে সৌদি নাগরিক হিসেবে রিয়াদেই থাকেন।

সাংগঠনিক প্রোগ্রাম

রিয়াদে বাংলাদেশি কর্মরত লোকেরা সাংগঠনিকভাবে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে অন্য বাংলাদেশিদেরকে এ পথে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন।

আমাকে পেয়ে তারা দু দিন দুটো সমাবেশে মিলিত হন। আমি বক্তব্য রাখার পর তারা অনেক প্রশ্ন করেন; প্রশ্নের জবাব পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি, যারা দেশে থাকাকালে দীনের পথে ছিলেন না। এমনকি এমন লোকও রয়েছেন, যারা দেশে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন; বিদেশে এসে দীনের দাওয়াত পেয়েছেন।

সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ হীরা মেস নামক যে মেসে থাকেন আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং তাদের আবেগ ও ভালোবাসা উপভোগ করার সুযোগ দিলেন।

জেদ্দা প্রত্যাবর্তন

রিয়াদ সফর সমাপ্ত করে ১৬ জানুয়ারি দুপুরে বিমানে জেদ্দা রওয়ানা হলাম। ঘটনাক্রমে রিয়াদ বিমানবন্দরে ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামিদ আল গাবেদের সাথে ভিআইপি লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল। আমার পরিচয় পেয়ে আগ্রহের সাথে বাংলাদেশ সম্পর্কে যা জানতে চাইলেন তা জানালাম এবং আমি যা জানাতে চেয়েছি তা-ও পেশ করলাম। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর জন্য ওআইসি অনেক কিছু করতে পারে বলে আমি দাবি জানালাম। তিনি ওআইসি'র দুর্বলতার কারণ নিশ্চয়ই জানেন। তাই আমাকে উৎসাহ দেওয়ার মতো কিছু জানাতে পারলেন না। আমাদের এ সাক্ষাতের খবর টিভি ও পত্রিকায় প্রচারিত হয়।

মুহাম্মদ আল ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ

বাদশাহ ফায়সালের ছেলে মুহাম্মদ আল ফায়সাল গোটা সৌদি পরিবারে শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৬ সালে লন্ডনে এক বিরাট আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফায়সাল ঐ সম্মেলনে চমৎকার ও আকর্ষণীয় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ঐ সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম' ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ বিন ফায়সালের পরিচয় ৫ম খণ্ডেরই ৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ঘটনাক্রমে তাঁর সাথে জেদ্দা বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল। তিনি রিয়াদ যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাদের সাথে কথা বললেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জেনে নিলেন।

তিনি বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের নেতা। সৌদি আরবে তিনি আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। বাদশাহ ফায়সালের সাথে আমার দু বার একান্ত সাক্ষাতের বিবরণ শুনে তিনি খুব খুশি হলেন।

৩০৫.

শায়খ জামজুমের বাসায় ডিনার

রিয়াদ থেকে জেদ্দায় ফিরে আসার দিনই শায়খ আহমদ সালাহ জামজুমের বাসায় ডিনারের দাওয়াতে গেলাম। তিনি বেশ বড় আয়োজনই করলেন। ৪০-৫০ জন মেহমানের সমাবেশ হয়ে গেল। শায়খ জামজুম মেহমানদের নিকট আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন; আমার সাথে তাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচয়ের কথা উল্লেখ করলেন। 'আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সরকার রাজনৈতিক কারণে আমার নাগরিকত্ব বাতিল করায় আমাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল এবং হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইনের লড়াই করে নাগরিকত্ব ফিরে পেতে হয়েছিল'– এসব কথা উল্লেখ করায় মেহমানগণ অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আমার বক্তব্য শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আমি সর্বপ্রথম এ বৈঠকের আয়োজন করার জন্য শায়খ জামজুমের প্রতি শুকরিয়া জানালাম। এরপর পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পৃথক হওয়ার পটভূমি তুলে ধরলাম। '৭২ সালের হজ্জের পর বাদশাহ ফায়সালের সাথে জেদ্দায় সাক্ষাতের বিবরণ দিলাম। এ কথাও উল্লেখ করলাম যে, শায়খ জামজুম স্বয়ং আমাকে বাদশাহর নিকট নিয়ে না গেলে এত বড় সুযোগ আমি পেতাম না। এর পরের বছরও হজ্জের পর বাংলাদেশ থেকে আগত জামায়াত নেতাদেরকে নিয়ে আবার বাদশাহ ফায়সালের সাথে দেখা করার ব্যবস্থাও শায়খ জামজুমই করেছেন। ১৯৭৫ সালের জুন মাসেও তিনি বাদশাহ খালেদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আমি সৌদি সরকারের প্রতি শুকরিয়া জানালাম যে, তাদের কূটনৈতিক চাপ ছাড়া বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ইসলামবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র বাতিল হতো না এবং ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন করা সম্ভব হতো না। এরপর আমি বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দিলাম।

শায়খ জামজুমের আরো একটি অবদানের কথা উল্লেখ করে বললাম, ১৯৭৭ সালে মক্কা মুকাররামায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠানের পেছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ড. সৈয়দ আলী আশরাফ ঐ সম্মেলনের আয়োজক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময় তিনি ও আমি ছাত্র ছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগ না নিলে শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের প্রভাবশালী সদস্য শায়খ জামজুম যদি এ বিষয়টা সিন্ডিকেটে উত্থাপন করেন তাহলেই বিশ্ববিদ্যালয় এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু শায়খ জামজুমের সাথে তাঁর পরিচয় না থাকায় তিনি তখনো শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি।

আমি শায়খ জামজুমের সাথে যোগাযোগ করে নিজেই ড. সৈয়দ আলী আশরাফকে সাথে করে শায়খের নিকট নিয়ে গেলাম। শায়খ উদ্যোগ নেওয়ার ফলে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়।

আমার বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। ডিনারে উপস্থিত মেহমানদের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

শায়খ জামজুম বর্তমানে বড় ব্যবসায়ী ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি একসময় বাদশাহ ফায়সালের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শেয়ার হোল্ডার। আশির দশকে ড. সৈয়দ আলী আশরাফের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন।

চেচনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

জেদ্দা কনফারেন্স প্যালেসে চেচনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুদ্দীন ইউসুফের সাথে দেখা হয়ে গেল। চেচনিয়ার করুণ ইতিহাস শুনলাম। তিনিও বাংলাদেশ ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা নিলেন। চেচনিয়ার দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকে প্রাণ রক্ষার জন্য যারা দেশ ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে তাঁর পরিবার ও স্বাধীন চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট জাওহার দুদায়েভের পরিবারও শামিল ছিল। তিনি জানালেন যে, ঘটনাক্রমে তাঁরা দু'জনই পালানোর পথে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা বড় হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯১ সালে ভেঙে যাওয়ার পর ইউনিয়নের ১৫টি রিপাবলিকের মধ্যে ১১টিই ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস (সিআইএস) গঠন করেছে; কিন্তু রাশিয়া অন্যদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে

স্বীকৃতি দিলেও এখন পর্যন্ত চেচনিয়াকে স্বীকৃতি না দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দীর্ঘায়িত করছে।

সফরের শেষ পর্যায়ে মক্কা শরীফে

১৭ জানুয়ারি সরকারি ব্যবস্থাপনায় আমরা মক্কা শরীফ পৌঁছে আবার ওমরাহ পালন করে রয়াল গেস্ট হাউজে অবস্থান করলাম। মক্কাবাসী বাংলাদেশিদের সাথে আমাদের পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী পরদিন রাজকীয় মেহমান থেকে মুক্ত হয়ে দীনী ভাইদের মেহমান হলাম। শহীদুল ইসলামের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থার কথা রয়াল প্রটোকলকে জানালে তারা সে বাসায় গিয়ে দেখে এসে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হলো যে, ২২ জানুয়ারি তারা মক্কা থেকে আমাদেরকে জেদ্দা বিমানবন্দরে নিয়ে যাবেন এবং রাজকীয় মেহমান হিসেবে বিদায় দেবেন।

দীনী ভাইদের মেহমান

রাজকীয় মেহমান থাকাকালে বাংলাদেশি ভাইয়েরা স্বাধীনভাবে আমাদের কাছে আসতে পারতেন না। আমরা তাদের মেহমান হওয়ায় তারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। হারাম শরীফে আমাদের প্রটোকলমুক্ত অবস্থায় পেয়ে প্রতি নামাযের সময়ই হাত মোলানো ও কোলাকুলি চলতে থাকল।

সৌদি আরবে সরকারি অনুমতি ছাড়া কোনো সমাবেশ করা নিষিদ্ধ। প্রকাশ্যে সংগঠন করার অনুমতি নেই। দীনের উদ্দেশ্যেও সংগঠন করা যায় না। দীনী ভাই ও বোনেরা পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেন। এ অবস্থায় তাদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠক করা সম্ভব ছিল না। অনুমতি নিয়ে ছোট ছোট সমাবেশ করার সময়ও পাওয়ার উপায় নেই।

আমরা মক্কা শরীফে কয়েকদিন অবস্থান করছি বলে জানাজানি হওয়ার ফলে মক্কার বাইরে অবস্থানরত দীনী ভাইদের অনেকে মক্কায় ছুটির দিন শুক্রবারে হাজির হতে আগ্রহী। তাই সমাবেশ বড় হওয়াই স্বাভাবিক। মক্কা শহরে এত বড় সমাবেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মক্কা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক খেজুর বাগানে সমাবেশের ব্যবস্থা করা হলো। এ জাতীয় বাগানকে 'আফরাহ' বলা হয়। সেখানে উৎসব হয়, বিয়ে-শাদীর বড় অনুষ্ঠানও সেখানে হয়।

ঐ বাগানের মালিকের সাথে দীনী ভাইদের কয়েক জনের পরিচয় থাকায় সহজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রায় দেড় হাজার ভাই সমবেত হলেন। বিকাল থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ সময় আমার বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে আমিও ক্লান্তি ভুলে গেলাম। এত লোকের খাবারের জন্য অনেক পশু জবাই করে রান্নার ব্যবস্থা করা হলো। বাগানের মালিকের সাথে আমার সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানালেন। আমার বক্তব্য একজন ভাই অনুবাদ করে তাকে শোনানোর ফলে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে হাত মিলালেন।

সাংগঠনিক দায়িত্বশীলদের সাথে মক্কায় থাকাকালে কয়েকটি বৈঠক হয়। তাদের সাথে ওখানকার কাজ সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং জরুরি পরামর্শ দেওয়া হয়।

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শরফের বাসায়

প্রফেসর ড. শরফের পূর্ণ নাম জোগাড় করা গেল না। তিনি মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তাঁর বাসায় খাবারের দাওয়াতে গেলাম। তিনি আরো বেশ কয়েক জন অধ্যাপককে দাওয়াত দিয়েছিলেন। খাবার গ্রহণের আগে তাঁরা বাংলাদেশ ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমরা তো এমন সুযোগই কামনা করি। তাঁরা আমাদেরকে উৎসাহ দিলেন।

সেখানে আমার পূর্বপরিচিত অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কুতুব উপস্থিত থাকায় আলোচনা বেশ প্রাণবন্ত হলো। তিনি তাঁর কয়েকটি বইয়ের বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বিশেষ করে 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' বইটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তাঁর বড় ভাই শহীদ সাইয়েদ কুতুব তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর জন্য অত্যন্ত পরিচিত। লন্ডনস্থ আল কোরআন একাডেমী এ তাফসীরের বাংলা অনুবাদ করার ফলেই তাঁর পরিচিতি এত ব্যাপক হয়।

ড. মুহাম্মদ কুতুবের সাথে ১৯৭৪ সালের আগস্টে আমার পরিচয় হয়েছে। লন্ডনের ইউকে ইসলামী মিশন এক হোটেলে মাওলানা মওদূদীর সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল। ড. কুতুব সেখানে অতিথিবক্তা ছিলেন। এর বিবরণ পূর্বে লিখেছি। ১৯৭৮ সালে আমি দেশে ফিরে আসার কয়েক বছর পর ড. সৈয়দ আলী আশরাফের উদ্যোগে আয়োজিত ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ড. কুতুব ঢাকা এসেছিলেন। তখন তিনি মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। ১৯৭৫ থেকে '৭৭ সালের মধ্যে কয়েক বার তাঁর সাথে মক্কা শরীফেই দেখা হয়েছে।

কুয়েত রওয়ানা

২২ জানুয়ারি (১৯৯৫) যোহরের নামাযের পর রাজকীয় গাড়িতে শহীদুল ইসলামের বাসা থেকে জেদ্দা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ঘণ্টা দেড়েক পর বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। রাজকীয় প্রটোকল যথারীতি আমাদেরকে বিদায় জানানোর ব্যবস্থা করল।

মামূন ওর আম্মাকে নিয়ে ঢাকাগামী সৌদি বিমানে উঠল। আমি ও আবু নাসের কুয়েতের উদ্দেশে বিমানে আরোহণ করলাম। মাত্র এক ঘণ্টার পথ। আমরা বিকালে কুয়েত বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার ও সেক্রেটারি ড. আদিল ফালাহ উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দরে কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশিরা বিরাট সংখ্যায় হাজির হলেন এবং বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়মে স্লোগান দিতে থাকেন। বাংলাদেশি পদ্ধতির অভ্যর্থনা সম্পর্কে সরকারি অভ্যর্থনাকারীগণ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অবহিত না থাকায় তারা রীতিমতো বিব্রতবোধ করলেন।

অল্প সময়েই ইমিগ্রেশনের ফরমালিটি শেষে আমাদের গাড়িবহর কুয়েত শহরের দিকে চলল। কুয়েত আমার অতি পরিচিত শহর। ১৯৭৩ থেকে '৭৮ পর্যন্ত প্রতি বছরই রমযানের প্রথমাংশ কুয়েতে ও দ্বিতীয়াংশ মক্কা ও মদীনায় কাটিয়েছি। ১৯৭৭-'৭৮ সালে আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে সালমান ১০ মাস কুয়েতে অবস্থান করেছে। আমি একটানা সেখানে না থাকলেও ৪/৫ মাস অবশ্যই ছিলাম। ১৬ বছর পর ১৯৯৫ সালের ২২ জানুয়ারি পরিচিত শহরটিতে প্রবেশ করলাম।

আওকাফ মন্ত্রণালয়ের মেহমান হিসেবে 'হোটেল হলিডে ইন'-এর নিকট পৌঁছতেই বাংলাদেশি একদল লোকের স্লোগান শুনতে পেলাম। বিমানবন্দরে যারা গিয়েছিলেন, মনে হয় তারাই আমাদের আগে এখানে পৌঁছে গেছেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ পেরেশান হয়ে গেলেন। আবু নাসের সাহেব এগিয়ে গিয়ে বাংলাদেশি ভাইদেরকে থামালেন। বোঝালেন যে, এ দেশে বাংলাদেশের মতো মিছিল-স্লোগান হয় না বলে সরকারি প্রটোকলও বিব্রতবোধ করছে। স্লোগান বন্ধ হলে আমি তাদের কাছে গিয়ে তাদের আগমনের জন্য শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, আমরা সপ্তাহখানেক থাকব, ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ হবে। হোটেলে আপনাদের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি না। আপনারা আমাদের নিকট থেকে সময় নিয়ে যেখানে সমবেত হতে পারেন, সেখানেই আমরা যেতে পারব। তারা নীরবে চলে গেলে আমাদের সরকারি মেজবান ও হোটেল কর্তৃপক্ষ স্বস্তিবোধ করলেন।

এক সপ্তাহ অবস্থান

২৯ জানুয়ারি (১৯৯৫) আমরা ঢাকা প্রত্যাবর্তনের কথা। এক সপ্তাহ কুয়েতে অবস্থান করার ইচ্ছা। আমরা কুয়েত পৌঁছার আগেই মুহাম্মদ ইউনুস (মরহুম) এক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কুয়েত পৌঁছে গেলেন। শায়খ ইউসুফ জাসেম আল হিজ্জির যোগ্য নেতৃত্বে কুয়েতকেন্দ্রিক একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে ঐ সংস্থার তিন জন সদস্যের মধ্যে ইউনুস সাহেব একজন ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বছর নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশনে হাজির হতেন। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফও সদস্য হিসেবে প্রায়ই হাজির হন। আমাকেও সদস্য বানিয়ে রাখা হয়েছে; কিন্তু আমি কোনো অধিবেশনেই হাজির হতে পারিনি। আমাকে সদস্য না রাখার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বহু দিন পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দাওয়াত পাঠায়। ২০০৪ সালে আমাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত করা গেল।

কুয়েতে ৭ দিনের কর্মসূচির মধ্যে প্রধান প্রধান হলো আওকাফ অফিসে ডেপুটি মিনিস্টারের সাথে বৈঠক (ঐ সময় মিনিস্টার বিদেশে ছিলেন), বাইতুয যাকাত নামক সেবা সংস্থার দায়িত্বশীলগণের সাথে আলোচনা, 'জমিয়তুল ইসলাহ' নামক ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা এবং শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়ার বাড়িতে ডিনার– সরকারি মেহমান হিসেবে এ কয়েকটি প্রোগ্রাম ঠিক হয়। এর ফাঁকে ফাঁকে ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের সাথেও কয়েকটি বৈঠক হয়েছে, যেখানে আমি ও নাসের সাহেব বক্তব্য রেখেছি এবং আমি তাদের প্রশ্নাবলির জবাব দিয়েছি।

আওকাফ অফিসে

আওকাফ অফিসে ড. আদিল ফালাহর সভাপতিত্বে কয়েকজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আমাদের সাথে বৈঠক হয়। ডেপুটি মিনিস্টার মন্ত্রী সাহেবের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর পক্ষ থেকে আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমাদেরকে মেহমান হিসেবে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজন তা জানালাম। তাঁরাও কিছু প্রশ্ন করে জেনে নিলেন।

বাইতুয যাকাত অফিসে

বাইতুয যাকাত কুয়েতের ধনীদের নিকট থেকে বিরাট অংকের যাকাত সংগ্রহ করে এবং গরীব দেশের মুসলমানদের সেবামূলক প্রকল্পে ব্যয় করে। বাইতুয যাকাতের ডাইরেক্টর দোহী আবদুল কাদির আল আজিল থেকে জানা গেল যে, তারা নিজেদের উদ্যোগে বাংলাদেশে গিয়ে দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে যাকাতের অর্থে সেবামূলক কাজ করতে চান। এ বিষয়ে তাঁরা পরামর্শ চাইলেন। আমরা তাঁদেরকে যেসব পরামর্শ দিলাম তা তাঁরা অত্যন্ত উপযোগী বলে মন্তব্য করলেন এবং বাংলাদেশে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন বলে জানালেন।

গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা, গৃহহীনদের জন্য থাকার উপযোগী ঘর তৈরি করে দেওয়া, এতিমখানায় সাহায্য করা ইত্যাদি পরামর্শ তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে।

জমিয়তুল ইসলাহ

কুয়েতে রাজনৈতিক সংগঠন করার অনুমতি নেই। তবে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের লোকেরা জমিয়তুল ইসলাহ নামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাদের বিরাট অফিস রয়েছে, যেখানে বড় আকারের হল আছে। তাতে তারা দীনী সমাবেশ করেন। সেখানে যুবক ও কিশোরদের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে; তাদেরকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

এ সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে জমিয়তের অফিসে গিয়ে দেখা গেল, তুরস্কের রেফাহ পার্টির প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানও সেখানে উপস্থিত আছেন। বোঝা গেল যে, আমাদের দু জনকে একই সাথে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

সংগঠনের সভাপতি শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়া এবং তাঁর সহকর্মীগণ আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমাদের দু জনের পরিচয় সংগঠনের উপস্থিত সদস্যদের নিকট তুলে ধরলেন।

ড. আরবাকানের সাথে আরেক দিন আমার একান্তে আলাপ হয়েছিল। তিনি ইংরেজি বলেন না। জার্মান থেকে পিএইচডি করেছেন। জার্মান ভাষা জানেন। তাঁর সাথে দলের একজন এমপি ছিলেন, যিনি তাঁর তুর্কি ভাষার বক্তব্য আমাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন এবং আমার ইংরেজি ভাষার বক্তব্য তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করে তাঁকে জানিয়েছেন। তাঁর সাথে এর আগে আমার পরিচয় ছিল না। তিনি আমার ঠিকানার কার্ড নিলেন এবং পরবর্তী জুন মাসে ইস্তাম্বুলে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দাওয়াত দেবেন বলে জানালেন এবং যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে যাওয়ার ওয়াদা করলাম।

জমিয়তে ইসলাহের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাদের পরিচয় দেওয়ার পর প্রথমে ড. আরবাকানকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি তুর্কি ভাষায় বক্তব্য দিতে থাকলেন এবং একাংশ বলার পর একজন আরবীতে অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন। তিনি এত দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন যে রাত বেশি হয়ে গেল। সভাপতি বললেন যে, আগামী দিন তাঁর বাড়িতে ডিনারে সবার দাওয়াত রইল; সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তব্য রাখবেন।

আবু নাসের পরের দিনই ঢাকা ফিরে যাবেন বলে তিনি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে আমার সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। আমার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'প্রফেসরকে এ পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য ২৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং ৭ বছর নির্বাসনজীবন কাটাতে হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানীতেই তাঁর জন্ম; অথচ সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল এবং হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে তিনি নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছেন।' পরের দিনের ডিনারে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং আমার বক্তব্য শোনার জন্য সবাইকে উপস্থিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

আবু নাসের আমাকে ইউনুস সাহেবের হাওয়ালা করে দিয়ে জরুরি প্রয়োজনে ঢাকা চলে এলেন।

আল মুতাওয়ার বাড়িতে ডিনার

শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়ার বাড়িতে সন্ধার পর আমি ও ইউনুস সাহেব পৌঁছলাম। তাঁর বিরাট বাড়িতে আমি আগেও গিয়েছি। তাঁর সাথে আমার ১৯৭৩ সাল থেকে পরিচয়। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসেবে তিনি প্রথম পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমার সাথে আচরণ করেন। তাঁর প্রেরিত ভিসা নিয়ে প্রতি রমযানে লন্ডন থেকে কুয়েত যেতাম। তাঁরই ভিসায় আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে কুয়েতে ১০ মাস ছিল। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের এক ভাই তাঁর বাসায় আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

শায়খ আল মুতাওয়া কুয়েতে ইসলামী সংগঠনের নেতা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রচুর সম্পদ দান করেছেন। তিনি সারা দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। কয়েক মাস আগে তিনি ৮২ বছর বয়সে হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। আমেরিকাতে দুই বার তাঁর হার্টে বাইপাস অপারেশন হয়েছে। তিনি বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ডিনারের পূর্বে আমি ২০/২৫ মিনিট বক্তব্য রাখলাম। উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে অনেকেই আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। বক্তব্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার একপর্যায়ে আমার সম্পর্কে বললাম, '১৯৭৮ সালে কুয়েত থেকে লন্ডন ফিরে যাওয়ার পর বাংলাদেশে এসে নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে ১৬ বছর জন্মভূমিতেই বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি। শেষদিকে কারাগারে থাকা অবস্থায় হাই কোর্টের নির্দেশে মুক্তি পেয়েছি ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছি।'

৩০৬.

ডিনার শেষে আলোচনা

ডিনার শেষ হওয়ার পর মেহমানরা চলে গেলেন। শায়খ আল মুতাওয়া একেবারে কাছে এসে বসে একান্তে কথা বললেন। দীর্ঘ ১৬ বছর পর তাঁর বাড়িতে পেয়ে যেভাবে মহব্বতের পরিচয় দিলেন তা ভোলার নয়। ১৬ বছর দেশে আটক থাকাকালে তাঁর সাথে পত্রালাপ জারি ছিল। ১৯৯১ সালে তিনি একবার ঢাকা এসেছিলেন। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশে ইসলাম সম্পর্কে আমার নিকট থেকে তিনি যা জানলেন এবং এখানে নিজে এসে যা দেখলেন, তাতে খুবই মুগ্ধ হলেন।

কুয়েতে পত্রিকায় সাক্ষাৎকার

গত কিস্তিতে কুয়েত সফরের বিবরণ সমাপ্ত করা হয়। কিন্তু ইংরেজি দৈনিক The Gulf Times ও আরবী মাসিক আলমুজতামায় আমার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লেখা বাকি রয়ে গেছে।

The Gulf Times কুয়েত থেকে প্রকাশিত তখনকার একমাত্র ইংরেজি দৈনিক। পত্রিকাটিতে যারা কর্মরত তারা প্রায় সবাই ভারতীয়। আমার সাক্ষাৎকার যিনি নিয়েছেন তিনিও ভারতীয়। তিনি সাক্ষাৎকারে জানতে চেয়েছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? আমি বলেছি, বাংলাদেশ ভারতকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পেতে চায়। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই বাংলাদেশের নীতি। বাংলাদেশ ভারতের পক্ষ থেকে বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে আধিপত্যবাদী আচরণ কামনা করে না। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিবেদক আরো জানতে চান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদ বোধ করে কি না? আমি তাঁকে বাংলাদেশ সফর করে সরেজমিনে দেখার আহ্বান জানাই। ভারতীয় কতক পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশত অপপ্রচার চালায়। ভারতে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার খবর সেখানে পৌঁছা সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের প্রতি সামান্যতম অন্যায়ও করা হয় না। এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীই সবচেয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে মুসলিম জনগণকে সতর্ক করা হয় যে, ইসলাম একজনের দোষে অপরজনকে শাস্তি দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ভারতে যারা দাঙ্গা লাগায় তারা দোষী। বাংলাদেশের কোনো হিন্দু এর জন্য দায়ী হতে পারে না। বাংলাদেশে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যন্ত স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে। সেখানে সবসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহাল রয়েছে। কোনো সরকারই এ ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করেনি। এটা বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য।

এরপর তিনি জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চান। আমি বললাম, জামায়াত জনগণকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। জামায়াত ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে না; স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য যে জীবনবিধান দান করা হয়েছে এরই নাম ইসলাম। স্রষ্টার দেওয়া ইসলাম মানবসমাজে চালু না হলে মানবজীবনে সুখ-শান্তি ভোগ করা সম্ভব নয়। যে ঐশী বাণীর মাধ্যমে এ জীবনবিধান প্রেরিত হয়েছে তারই নাম কুরআন।

জামায়াতে ইসলামী জনগণকে এ কথাও বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী যারা জীবন যাপন করে স্রষ্টা তাদেরকেই মুসলিম বলে গণ্য করেন। 'ইসলাম' শব্দ থেকেই মুসলিম শব্দ গঠিত। যারা ইসলামী জীবনবিধান মেনে চলে তারাই মুসলিম। মুসলিম একটি গুণগত নাম। এ গুণ অর্জন করতে হয়। জন্মগতভাবে কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

আমার এ বক্তব্য শুনে ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে বিশ্বে যত লোক মুসলিম জাতি হিসেবে দাবি করে তারা কি সত্যিকার মুসলিম নয়?

জবাবে বললাম, পরকালে স্রষ্টাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন যে কে সত্যিকার মুসলিম, আর কে নয়। যেমন আমরা ডাক্তারের সন্তান হলেই তাকে ডাক্তার বলে স্বীকার করি

না। ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা না করলে কোনো লোক যত দাবিই করুক তাকে ডাক্তার হিসেবে গণ্য করা হয় না। স্রষ্টাও শুধু মুসলিম হওয়ার দাবি করলেই তিনি মুসলিম বলে গণ্য করবেন না।

তাকে উদাহরণ দিয়ে জানালাম যে, বাংলাদেশে একজন ব্রাহ্মণ উচ্চশিক্ষিত লোক কুরআন অধ্যয়ন এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য নাম ধারণ করেছেন। তিনি 'ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সারা দেশে ইসলাম প্রচার করছেন। মুসলিম সমাজে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে গণ্য। মুসলিম নামধারী উচ্চশিক্ষিত কোনো লোক এ মর্যাদার অধিকারী নয়।

মাসিক আলমুজতামায় সাক্ষাৎকার

'আলমুজতামা' নামে আরবী ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাটি গোটা মুসলিম বিশ্বে একটি উচ্চমানের ইসলামী ম্যাগাজিন হিসেবে সমাদৃত। কুয়েত থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত। এ পত্রিকাটির পক্ষ থেকে আমার যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তা কয়েক পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ছিল। তাদের প্রশ্নগুলো শুধু তুলে ধরছি। এসবের জবাব এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। এ লেখার পাঠক-পাঠিকাগণ আমার লেখায় ঐসব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিম্নোক্ত বিষয়ে জানতে চেয়েছেন–

১. বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। পৃথক হওয়ার কারণ কী?
২. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের কোনো মর্যাদা আছে কি?
৩. বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা কী?
৪. জামায়াতে ইসলামীর কর্মপদ্ধতি কী?
৫. রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান কেমন?

কুয়েত থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন

২৯ জানুয়ারি (১৯৯৫) ইউনুস সাহেবের সাথে আমি কুয়েত থেকে রওয়ানা হয়ে পরের দিন সকালে ঢাকা পৌঁছলাম। বাংলাদেশে তখন সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরেশোরে চলছে।

১৯৯৫ সালের রাজনীতি

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির যে যুগপৎ আন্দোলন ১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে তার এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর উপরিউক্ত তিন বিরোধী দলের মোট ১৪৭ জন সংসদ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। বিরোধী দলসমূহের এত বড় পদক্ষেপ নেওয়ার পরও কেয়ারটেকার

সরকারব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিএনপি'র মনোভাবে সামান্য নমনীয়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়নি।

১৯৮৭ সালের ৩ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর দশ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বৈরশাসক এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। অথচ বিএনপি সরকার সংসদ সদস্যদের প্রায় অর্ধেক সদস্য পদত্যাগ করা সত্ত্বেও অর্ধমৃত সংসদ চালু রাখে।

১৯৯৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশন শুরু হলে স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী রুলিং দেন যে, ১৪৭ জন সদস্যের পদত্যাগ বৈধ নয়। সংবিধান অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য নিজের স্বাক্ষরে পদত্যাগপত্র স্পিকারের নিকট জমা দেওয়ার সাথে সাথেই ঐ আসন শূন্য হয়ে যায়। অথচ স্পিকার সাহেব পদত্যাগ বৈধ হয়নি বলে রুলিং দিয়ে বসলেন।

এতে বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্য বোঝা গেল যে, তারা অর্ধমৃত সংসদই চালু রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। তাদের এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরোধী দলের অবিরাম আন্দোলনের মুখে একগুঁয়েমি করে সরকার চালু রাখা হয়। ভঙ্গুর সংসদ ও বিএনপি সরকার চলতে থাকে। আর বিরোধী দলের আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এমন ধরনের কর্মসূচি দিতে সম্মত হয়, যা জামায়াত পছন্দ না করায় কিছুটা নমনীয় করে তাতে জামায়াত শরীক হতে বাধ্য হয়।

১৯৬২ সালে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনর্বহালের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সাথে জামায়াতে ইসলামী একই মঞ্চে শামিল হয়ে আন্দোলন করেছে। ঐ আন্দোলনে আরো কয়েকটি দল শরীক ছিল। আমি তখন থেকে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করে এসেছি।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ১৯৯৪ থেকে যে আন্দোলন চলেছে এর কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে বিবেকের যে দংশন অনুভব করেছি, এর পূর্বের কোনো আন্দোলনে এমনটা বোধ করিনি। রাজনৈতিক কারণেই ঐ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় ছিল না বলে বিবেকের বিরুদ্ধেই ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক থাকতে বাধ্য হয়েছি।

এমপিদের পদত্যাগের পর

১৯৯৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগের পর সরকারের স্বাভাবিক করণীয় ছিল সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু জিদ ধরে ৫ বছর মেয়াদ পূরণ করার উদ্দেশ্যে স্পিকার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। সংসদে কোনো আসন শূন্য হলে উপনির্বাচন করা বাধ্যতামূলক। তাই স্পিকার ১৪৭টি আসন শূন্য বলে ঘোষণা না করে উপনির্বাচন থেকে জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করলেন।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন থেকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সংসদ বর্জন করায় ১৯৯৫ সালের ২০ জুন বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতির ৯০ দিন পূর্ণ হয়ে যায়। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিন কোনো সদস্য একাধারে অনুপস্থিত থাকলে স্পিকার সংসদে ঘোষণা করে দেন যে, অমুক আসন শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু ১৪৭টি আসন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো ঘোষণা হলো না। শূন্য ঘোষণা করলেই উপনির্বাচন করতে বাধ্য হতে হবে। তাই রাজনৈতিক চালবাজির আশ্রয় নিয়ে ৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়ে পাঠান। এমন একটি স্পষ্ট বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধু কালক্ষেপণ করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হলো।

অপরিহার্য কারণেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে, ১৪৭টি আসন শূন্য হয়ে গেছে এবং ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রতিবছরই কোথাও কোথাও ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে। সংবিধানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপনির্বাচন মুলতবি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ অজুহাতে সরকার তিন মাসের জন্য উপনির্বাচন স্থগিত করে দেয়।

এ হিসাব অনুযায়ী ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে উপনির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। মার্চের মাঝামাঝিই সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। সরকার ও নির্বাচন কমিশন জানে যে, নির্বাচনী শিডিউল ঘোষণা করলেও মাত্র দু মাসের জন্য কেউ এমপি হওয়ার উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেবে না। তবু সংবিধানের নির্দেশ পালনের প্রয়োজনে নির্বাচনী শিডিউল ঘোষণা করা হলো। ২২ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। কেউ নমিনেশন পেপার জমা দেয়নি। বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রপতি ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। এরপর তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। এভাবে রাজনৈতিক চতুরতার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে ৫ বছর পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকল।

নবীনগর ফোরামের প্রস্তাব

পাঠক-পাঠিকাদের নিকট নবীনগর ফোরাম অপরিচিত নয়। 'জীবনে যা দেখলাম' ২৬০ নং কিস্তিতে এ ফোরামের তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা ষষ্ঠ খণ্ডের শেষদিকে সংকলিত আছে। ১৯৯২ সালের মার্চে আমাকে গ্রেফতার করার পর নবীনগর শহরের অধিবাসী ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ারের উদ্যোগে 'নবীনগর ফোরাম' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি আমার ছোট ভাই ডাক্তার মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম এবং সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার। এ ফোরাম আমার সম্পর্কে এক সেমিনারের আয়োজন করে অনেক বিশিষ্ট লোকের অভিমত প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এ ফোরামের একটি স্থায়ী অবদান হলো 'মযলুম' নামে একটা চমৎকার ম্যাগাজিন প্রকাশ। আমি গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা, গ্রেফতারের

সময় ইসলামী আন্দোলনের সমবেত কর্মীদের উদ্দেশে আমার বক্তব্য, আমার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের ছবিসহ বিবরণ এবং আমার সম্পর্কে অনেকের লেখা ও বিবৃতির উদ্ধৃতি ইত্যাদি এতে সংকলিত হয়েছে।

১৯৯৪ সালের ২২ জুন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সর্বসম্মত রায়ের ফলে আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল হওয়ার পরদিনই ঢাকায় ২৩ বছর পর প্রথম জনসমাবেশে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়। এরপর সারা দেশেই জনসভার আয়োজন হতে থাকে। নবীনগর ফোরামের পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার প্রস্তাব দিলেন, 'নবীনগর ফোরামের পক্ষ থেকে জনসমাবেশের আয়োজন করতে চাই। কারণ, নবীনগরবাসী আপনাকে দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ও আপনার বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব।' আমি পরামর্শ দিলাম, কেন্দ্রীয় জামায়াতের নিকট প্রস্তাবটি পেশ করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তাই সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট প্রস্তাব দিন।

নবীনগরে আমি অপরিচিত ছিলাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বীরগাঁও ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামে আমার বাপ-দাদার ভিটে-মাটি। মায়ের প্রথম সন্তান হিসেবে ঢাকা শহরে নানার বাড়িতে আমার জন্ম হয়। তাই বীরগাঁও আমার জন্মস্থান না হলেও ঐ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেছি। গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছি। আব্বা কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানায় বদলি হওয়ায় কুমিল্লা শহরে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর ক্লাস নাইন থেকে এমএ পর্যন্ত ঢাকা শহরেই লেখাপড়া করেছি। বন্ধের সময় বীরগাঁও না গিয়ে চান্দিনায়ই কাটাতাম।

বীরগাঁওয়ের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন পরম স্নেহপরায়ণ দাদি। বড় চাচা ছিলেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। আব্বা আমাদেরকে নিয়ে বীরগাঁও যাওয়ার পরিবর্তে বড় চাচাকে বলতেন দাদিকে নিয়ে চান্দিনায় আসতে। দাদির সান্নিধ্য চান্দিনায়ই পাওয়া যেত বলে ছুটির সময়ও বীরগাঁও যাওয়ার প্রয়োজন হতো না।

এমএ পড়ার সময় আমার দাদি ইন্তিকাল করেন। বীরগাঁওয়ের একমাত্র আকর্ষণই আর রইল না। শিক্ষাজীবন শেষে আমার কর্মজীবন শুরু হয় উত্তরবঙ্গে। রংপুর থেকে একবার তাবলীগী চিল্লার লোক নিয়ে বীরগাঁও গিয়েছিলাম ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর আমার কর্মতৎপরতা রাজশাহী বিভাগেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদীর এ দেশে সফরের পর আমাকে তিনি রাজশাহী বিভাগের আমীর নিয়োগ করায় ঐ অঞ্চলই আমার কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯৫৭ সালে যখন আমাকে জামায়াতের প্রাদেশিক সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) আমার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

সংগঠনের প্রাদেশিক দায়িত্বে আসার পর জামায়াতের সংগঠন সারা দেশে যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই আমার সফর হয়। নবীনগর নিজের উপজেলা হলেও তখন পর্যন্ত সেখানে সংগঠন শুরু না হওয়ায় আমার সফরও হয়নি। সারা দেশে জেলা, মহকুমা (পরে জেলা হয়েছে) ও থানা (পরে উপজেলা হয়েছে) পর্যায়ে যেখানে সংগঠন সক্রিয় ছিল সেখানেই আমি গিয়েছি; কিন্তু আমার নিজের থানায়ই যাওয়ার কোনো সুযোগ পাইনি। তাই বলতে গেলে নবীনগরের জনগণের নিকট আমি পরিচিতই ছিলাম না।

আমার ছাত্রজীবন কাটল ঢাকায়। আর কর্মজীবন চলল রংপুরে। ভাষা আন্দোলনের কারণে রংপুরে ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে দু বার আমাকে কারাগারে যেতে হয়েছে। হাইকোর্টে মামলা করে মুক্তি পেয়েছি। পত্রিকায় এসব খবর বের হতো। নবীনগরের লোকেরাও আমাকে উত্তরবঙ্গের লোক মনে করত।

১৯৯২ সালে নাগরিকত্বের ইস্যুতে আমাকে গ্রেফতার করার পর আমার মুক্তির জন্য জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন করেছে সারা দেশেই। নবীনগর ফোরাম এ আন্দোলনে ঢাকায়ও অবদান রাখে। বিশেষ করে এ ফোরামের নামেই নবীনগরে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। বলতে গেলে নবীনগরের জনগণের মাঝে এ ফোরামের মাধ্যমেই আমার পরিচয় হয়। আমার চাচা মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট শফীকুল ইসলাম নবীনগর থেকে পাকিস্তান আমলে দু বার নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করায় তিনি ঘরে ঘরে পরিচিত ছিলেন; কিন্তু আমি মোটেই পরিচিত ছিলাম না। নবীনগর ফোরামই আমাকে পরিচিত করে। ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার নবীনগরে জনসভা করে সে পরিচয়কে পূর্ণতা দিতে চাচ্ছিলেন।

নবীনগরে জনসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নবীনগরে আমি জনসভায় যাওয়ার ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট দাবি জানানোর পর এ বিষয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই আমাকে লিখে দিয়েছেন। আমার এত কথা মনেও ছিল না। আমি তার লেখাটাই উদ্ধৃত করছি :

"দেশের কিছু কিছু স্থানে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের জনসভাগুলোতে কমিউনিস্ট এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ষড়যন্ত্রকারীরা বিভিন্নভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এমন একটি পরিস্থিতিতে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, নবীনগরে জামায়াতে ইসলামী নিতান্তই একটি দুর্বল সংগঠন। এমতাবস্থায় অধ্যাপক সাহেবকে নিয়ে এত বড় একটি রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে কি না। নবীনগরে জামায়াতের অবস্থা দুর্বল হলেও নবীনগরে আমাদের পারিবারিক অবস্থান অত্যন্ত মযবুত এবং নবীনগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ফেইস করার মতো ক্ষমতা আমাদের পরিবারের রয়েছে বলে আমি তাঁদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

পরিশেষে বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় জামায়াত কয়েক জন নেতার সমন্বয়ে একটি টিম তৈরি করে দিল। এ টিমে যাঁরা ছিলেন বলে আমার মনে পড়ছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মরহুম মাস্টার শফিকুল্লাহ ও মাওলানা রফিউদ্দিন আহমদ। জনাব রফিউদ্দিন আহমদ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তদারককারী। তাঁর সাথে আমাকে এ বিষয়ে বহু বার বৈঠক করতে হয়েছে। উক্ত টিম একাধিক বার নবীনগর সফর করে। উক্ত টিমের সদস্যদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। নবীনগরের গোটা পরিস্থিতি তাঁরা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শেষ পর্যন্ত 'নবীনগর ফোরাম'-এর নামে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নবীনগরে জনসভার অনুমোদন দেন। এ অনুমোদনের খবর নবীনগরে সংশ্লিষ্ট ভাইদের জানানোর পর বিদ্যুৎগতিতে খবরটি গোটা থানায় ছড়িয়ে পড়ল। সকলের মধ্যে উৎসাহের বন্যা বইতে শুরু করল। অধ্যাপক সাহেবের নিরাপত্তা এবং সভার সার্বিক শৃঙ্খলার বিষয়টিকে সামনে রেখে উক্ত টিম নিম্নরূপ পরামর্শ দিল।

অধ্যাপক সাহেব ডাক বাংলোতে থাকার পরিবর্তে আমাদের বাড়িতে অবস্থান করবেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করবেন আমার পিতা নবীনগর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক, দীনের খাদেম ও অধ্যাপক সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু এবং আত্মীয় জনাব আব্দুল আউয়াল। জনসভার তারিখও নির্ধারিত হলো। ১২ মে ১৯৯৫ বিকাল ৪টা। স্থান হচ্ছে, নবীনগরের বৃহত্তম ঈদগাহ ময়দান। এ ঈদগাহ কমিটির সভাপতিও জনাব আব্দুল আউয়াল।"

জনসভার প্রস্তুতি

"জনসভা নিয়ে সকলের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। কেন্দ্রের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা শহরের জামায়াত ও শিবিরের ভাইয়েরা প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। তাদের অনেকের চেহারা হৃদয়পটে ভাসলেও নামগুলো মনে নেই। তবে বি.বাড়িয়া জেলা আমীর কাজী নজরুল ইসলাম খাদেম ভাই, ঢাকার এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার ভাইদের সহযোগিতার কথা এখনো অনুভব করি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, মুহতারাম আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের কথা, যিনি এ জনসভা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে আমাকে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিয়ে উৎসাহ এবং সাহস জুগিয়েছিলেন। জনসভার প্রস্তুতির জন্য আমি ১৪ দিনের ছুটি নিয়ে যশোর থেকে নবীনগর চলে গেলাম। শ্রদ্ধেয় আব্বাকেও ঢাকা থেকে নবীনগর নিয়ে আসলাম। হক প্রিন্টার্সের সিরাজ ভাই (জামায়াতের মতিঝিল থানা সভাপতি)-এর সৌজন্যে অধ্যাপক সাহেবের ছবি সম্বলিত ১০,০০০ মনোরম লিফলেট ছাপালাম। তিনি এ জন্য একটি পয়সাও নেননি। জনসভার দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল নবীনগরের স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের সকল জনশক্তিসহ সকল স্তরের জনগণের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনাও জোরদার হতে লাগল। অপরদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের স্থানীয় এজেন্টরাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু করল।"

বিরোধিতার প্রতিকার

"ষড়যন্ত্রকারীরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম দিয়ে জনসভাবিরোধী তৎপরতা শুরু করল। তারা জানত যে, জনসভা বন্ধ করার তৎপরতা চালিয়ে জাতীয় পত্রিকায় মুখরোচক খবর তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব। তারা সে ধরনের প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে শ্রদ্ধেয় আব্বা জনাব আব্দুল আউয়াল সাহেব নবীনগরের প্রভাবশালী ইউনিয়নসমূহের চেয়ারম্যান, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিদেরকে নবীনগর বাজারে আলোচনার দাওয়াত দিলেন। তিনি সে বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় নেতাদের জানালেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযম নবীনগরের কৃতী সন্তান, নবীনগরের গর্ব এবং জাতীয় নেতা। তাঁর প্রতি কোনো প্রকার অসম্মান মেনে নেওয়া হবে না। সবশেষে তিনি জানালেন, অধ্যাপক গোলাম আযম তার ব্যক্তিগত মেহমান; কাজেই তাঁর সম্মানের হেফাজত করা ব্যক্তিগতভাবেও তার উপর ফরয। তার আলোচনায় উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ওয়াদা করলেন যে, জনসভার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার তৎপরতাকে তারা কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেবেন না। উক্ত আলোচনায় নবীনগর থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সভাপতিও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের বিষয়বস্তু ও ফলাফল নবীনগর থানাসদরের বিভিন্ন মহলে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রকারীরা হতাশ হয়ে মুষড়ে পড়ল।"

নিরাপত্তাকর্মীদের আগমন

১১ মে (১৯৯৫) জনসভার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। কুমিল্লা শহর থেকে ২টি গাড়িভর্তি জামায়াত-শিবিরের নিরাপত্তাকর্মীরা উপস্থিত। বি.বাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী থেকেও জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা হাজির। জনসভার জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি হলো। নিরাপত্তাব্যবস্থার চেহারা দেখে জনসভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার স্বপ্ন শয়তানদের স্বপ্নই রয়ে গেল। নিরাপত্তাকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা হলো আমাদের বাড়ির বিভিন্ন ঘরে। কেউ কেউ আমাদের বাড়ির মসজিদেই রাত কাটালেন। এ সকল মেহমান কর্মীদের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন সেক্রেটারি মুহতারাম এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার ভাই। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কর্মীদের জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনার মতো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের আঞ্জাম দিয়েছিলেন জামায়াতের বি.বাড়িয়া জেলা আমীর মুহতারাম খাদেম ভাই। নবীনগর থানা আমীর শ্রদ্ধেয় সিরাজ মাস্টার ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থানার জামায়াত-শিবিরের সকল জনশক্তি সর্বাত্মক আন্তরিকতা নিয়ে যার যার দায়িত্ব পালন করেছেন। থানা আমীরের বাসায় আমাদেরকে প্রতিদিন একাধিক বার বৈঠক করতে হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত নবীনগরের ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকেরা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তখন

নবীনগরে আগমন করেছিলেন। নবীনগরজুড়ে বিরাজ করছিল এক সাজ সাজ রব এবং উৎসবের আমেজ। তাদের সকলের সম্মিলিত সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

জনসভার দিন

"১২ মে ১৯৯৫ সাল। সকাল ৮টার দিকে আমরা সকালের নাশতা সেরে জনসভা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল, আমাদের বাড়ির মসজিদের সামনে একটি পাজেরো গাড়ি এবং পেছনে দুটি মাইক্রোবাস এসে উপস্থিত। ইসলামী আন্দোলনের মুরব্বি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংগ্রামী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম আমাদের বাড়িতে পৌছলেন। আলহামদুলিল্লাহ। আহলান সাহলান আমীরে জামায়াত। এলাকাজুড়ে হৈচৈ পড়ে গেল। আব্বাসহ এলাকার মুরব্বিরা নেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসলেন। নিরাপত্তাকর্মীরা সকলেই এলার্ট হয়ে গেলেন। এ যেন এক স্বপ্নের মতন। নিরাপত্তার স্বার্থেই নেতার আগমনের সঠিক সময়টি পূর্বে কাউকেই জানানো হয়নি। দীর্ঘ সফর সত্ত্বেও বর্ষীয়ান এ নেতার চোখে-মুখে কোনো প্রকার ক্লান্তির ছাপ ছিল না। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নাশতা খেলেন। তারপর মনে হলো, গোটা নবীনগরের ফোকাল পয়েন্ট আমাদের বাড়িটি। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন লোকজন এল নেতাকে কাছ থেকে একনজর দেখার জন্য।

এদের মধ্যে গ্রামের মহিলারাও ছিলেন, তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখা যায়নি। অনেকে নেতার সাথে কুশল বিনিময় করে তৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে গেলেন। দুপুরের খাবার গ্রহণের পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে জনসভায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন আমীরে জামায়াত।"

গণসম্বর্ধনা

এদিকে বিকাল ৪টায় জনসভা শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির মসজিদে আসর নামায পড়ে সভাস্থলে রওয়ানা হলেন তিনি। মসজিদ থেকে জনসভাস্থল ঈদগাহ পর্যন্ত সড়কের দু পাশে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ নেতাকে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সম্ভবত বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তিনি সভামঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। ঈদগাহভর্তি মানুষ দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে নেতাকে শুভেচ্ছা জানালেন। এ দৃশ্য না দেখলে পরিপূর্ণ অনুভব করা সম্ভব নয়। জনাব আব্দুল আউয়াল সাহেবের সভাপতিত্বে জনসভা চলছে। ঢাকা, কুমিল্লা, বি.বাড়িয়া ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে আবেগাপ্লুত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে স্বাগত জানালেন। বিভিন্ন পেশার নেতৃবৃন্দ তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন; বিভিন্ন প্রকার দর্শনীয় উপহার প্রদান করলেন। এ দৃশ্য যেন দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা পুঞ্জিভূত আবেগের এক নয়নাভিরাম বিস্ফোরণ। আমীরে

জামায়াত এ দৃশ্য দেখে উৎফুল্ল হয়ে উপভোগ করছিলেন। নবীনগরের জনগণ তাঁকে এতটাই যে ভালোবাসেন, সেটা তিনি নতুনভাবে অনুভব করছিলেন।

বিকাল ৫:৪৫ মিনিটে ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। চারদিকে তাকবীর ধ্বনি বিস্ফোরিত হচ্ছিল। এর মাঝে স্বভাবসুলভ অদ্ভুত ভঙ্গিমায় তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। নবীনগরে তাঁর পূর্বপুরুষের ইতিহাস, নবীনগরে দীর্ঘদিন না আসার কারণ, বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনকে ইসলামের রঙে রাঙানো ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। পিনপতন নীরবতার মধ্যে সবাই তাঁর বক্তৃতা শোনলেন। তিনি নবীনগরবাসীর আবেগসিক্ত ভালোবাসার জন্য উপস্থিত সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। সন্ধ্যা ৬:২৫ মিনিটে উপস্থিত জনতাকে পিপাসার্ত রেখেই অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ শেষ করলেন। পরদিন ফজরের নামায পড়েই তিনি নবীনগর ছেড়ে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

জনসভায় উপস্থিত জনগণ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করল, 'ফেরেশতার মতো এ মানুষটির বিরুদ্ধে কেন এত ষড়যন্ত্র? আল্লাহ তাআলা ষড়যন্ত্রকারীদের হেদায়াত দিন, নতুবা ধ্বংস করে দিন। আর এ মানুষটিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে আরো সম্মানিত করুন এবং দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।' এ আলোচনা-পর্যালোচনার ঢেউ ধীরে ধীরে গোটা নবীনগরে ছড়িয়ে পড়ল।

শ্রদ্ধেয় আব্দুল কাদের মোল্লা ভাই পরবর্তীতে এ জনসভার জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরে দোআ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অনেক কারণে এ জনসভা ঐতিহাসিক। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, কোনো প্রকার সামান্যতম বিরোধিতার সম্মুখীন না হয়ে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়া একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেও এ জনসভায় জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তার প্রমাণ হলো, পরবর্তীতে তিনি একাধিক বার আমাকে বলেছেন, আমার পূর্বপুরুষদের মতো আমিও নবীনগরের গ্রামে গ্রামে দীনের দাওয়াত দেব। বর্ষাকালে নৌকা ঠিক করবা, তোমাকে নিয়ে আমি গ্রামে গ্রামে ইসলামের দাওয়াত দেব। আমি তাঁর এ নির্দেশ রাখতে পারিনি বলে হৃদয়কোণে এখনো ব্যথা অনুভব করি। আসলে চাকরি করলে অনেক জরুরি কাজও করা যায় না।"

৩০৭.

সৌদি আরব রওয়ানা

১৫ ফেব্রুয়ারি (২০০৭) আমিরাত এয়ারলাইন্স-এর বিমানে আমি সস্ত্রীক জেদ্দার উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। বিমানবন্দরে অনেকখানি পথ হাঁটতে হয়। ২০০৩ সাল থেকেই আমরা দু জনই হুইল চেয়ারের সাহায্য নিতে বাধ্য হই। বিমানবন্দরে আমার ৪র্থ ছেলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমান আযমী, আমার একান্ত সচিব নাজমুল হক, কামিয়াব প্রকাশন-এর মালিক মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ও মগবাজারস্থ আমাদের ২১ ফ্ল্যাটবিশিষ্ট বিল্ডিং-এর ম্যানেজার আযাদ আমাদেরকে বিদায় জানায়।

বিমান ঢাকা থেকে এক ঘণ্টা বিলম্বে উড্ডয়ন করে। দুবাইয়ে বিমান বদল করতেও এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়। ফলে জেদ্দায় যথাসময়ের এক ঘণ্টা দেরিতে বিমান পৌঁছে।

আমিরাত এয়ারলাইন্স দুবাই ও জেদ্দায় হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। দুবাই বিমান বন্দরে একজন ভারতীয় মুসলিম কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ গাড়িতে করে আমাদেরকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। জেদ্দা বিমান ঘাঁটিতে বিমান থেকে হ্যাঙ্গারে নামার ব্যবস্থা নেই বলে আমাদেরকে দীর্ঘ সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাসে উঠতে হয়। বাস থেকে নামার পর হুইল চেয়ারের সেবা পাওয়ার কথা; কিন্তু এমন ব্যবস্থাই ছিল না। আবদুর রউফ নামে বাংলাদেশি এক ব্যবসায়ী বাস থেকে নামার সাথে সাথে আমাদের হাতের সব জিনিস তাঁর হাতে তুলে নিলেন। তিনি চেষ্টা করেও হুইল চেয়ার জোগাড় করতে পারলেন না। আমি এক হাতে ক্রাচ ও অপর হাত দিয়ে তার কাঁধে ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে বাধ্য হয়েছি।

জেদ্দা সময় রাত ১১টায় মামূনের গাড়িতে ওর বাসায় পৌঁছলাম। ঢাকার বাড়ি থেকে সকাল ৭টায় রওয়ানা হয়ে ঢাকার সময় রাত দুটায় জেদ্দার বাসায় পৌঁছতে পারলাম। মোট ১৯ ঘণ্টার মধ্যে ৯ ঘণ্টা বিমানে, আর ১০ ঘণ্টা বিমানবন্দরে কেটেছে। এত ঘণ্টা একটানা বসে থাকায় দু জনেরই পায়ের পাতা ফুলে গেল। আমিরাতের জেদ্দাস্থ অফিস থেকে আমাদের টিকিট কেনা হয়েছে। এখানে এয়ারলাইন্স-এর ম্যানেজার মামূনের বন্ধু। তিনি ভারতীয় মুসলমান। প্রতি টিকিটে ঢাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা কম নিয়েছে। হুইল চেয়ার সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ ম্যানেজারের নিকট পৌঁছাতে মামূনকে বলেছি।

জেদ্দায় ৩ দিন অবসর

একটা বয়সে মানুষ কর্মজীবন থেকে অবসর নেয়। রিটায়ার্ড লাইফ বলতে এটাই বোঝায় যে, কোনো কাজের চাপ নেই। এমন কোনো দায়িত্ব নেই, যা পালন করতেই হবে; না করলে কোথাও কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি আমি জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিই। অবসরজীবনের হালকা ভাব অনুভব করি। সম্পূর্ণ বিনা কাজে কোনো সুস্থ দেহের মানুষ থাকতে পারে না। বিরাট দায়িত্বমুক্ত হয়ে আমি নিজের ইচ্ছায় লেখার কাজে হাত দেই। আল্লাহ তাআলা দীন সম্পর্কে আমাকে যে স্বচ্ছ ধারণা দান করেছেন, তা সহজ বাংলায় লিখে রেখে যাওয়ার জযবা নিয়ে গত ছয় বছরে প্রচুর লিখেছি। আলহামদু লিল্লাহ! মহান মা'বূদ এ তাওফীক দেওয়ায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত। আরো কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করছি; কিন্তু তা লিখতে না পারলে কোনো আফসোস থাকবে না। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আমার অবসরজীবন যাপনের অনুভূতিই বোধ করার কথা।

কিন্তু এমন একটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, যা আমাকে অবসরজীবনের স্বাদ অনুভব করতে দিচ্ছে না। ২০০১ সাল থেকেই 'জীবনে যা দেখলাম' শিরোনামে আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দিয়ে ঠেকে গেছি। প্রতি সপ্তাহে দৈনিক সংগ্রামে একটা কিস্তি লিখে পাঠাতে হয়। কোনো জুমাবারে লেখা প্রকাশিত না হলে এর নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করবেন যে, আমি বোধ হয় লেখা ক্ষান্ত করে দিয়েছি। অনেকেই এ লেখার অপেক্ষায় থাকেন বলে শুনেছি।

সৌদি আরবে দেড় মাসের জন্য এলাম। ৬টি কিস্তি লিখে দিয়ে আসতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। ৪ কিস্তি দিয়ে এসেছি। দু সপ্তাহ না লিখে অবসর কাটাতে পারতাম। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর চেয়ারম্যান আবু নাসের সাহেব আসবেন। তাঁর হাতে কমপক্ষে দু কিস্তি লেখা দেওয়ার প্রয়োজনে জেদ্দায় পৌঁছার তিন দিন পরই লেখা শুরু করতে বাধ্য হলাম। মাত্র তিন দিন অবকাশজীবন উপভোগ করলাম। অবসরজীবন মানে এমন কোনো কাজের দায়িত্ব নেই, যা না করলে জবাবদিহি করতে হয়; নিজের ইচ্ছায় করলাম, না করলে নেই।

পাঠক-পাঠিকাদের নিকট দায়বদ্ধতা

আমার জন্ম ১৯২২ সালে। গত ৬ বছরে যা লিখেছি, তাতে ১৯৯৪ সালের কথা ৩০০ নং কিস্তিতে সমাপ্ত হয়েছে। সপ্তম খণ্ডে ৩০০ নং কিস্তি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের কথা ৩০১ নং কিস্তি থেকে লেখা শুরু হলো। গত শতাব্দীর ৬ বছর এখনো লেখা বাকি রইল। এদিকে এ শতাব্দীর ৬ বছরও চলে গেল। ১২ বছরের কাহিনী কবে লিখে শেষ করতে পারব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি আর কত দিন লেখার তাওফীক দেবেন তাও তিনিই জানেন।

গত নভেম্বরে (২০০৬) আমার বয়স ৮৪ বছর পূর্ণ হলো। আল্লাহর রহমতে এখনো নিজের হাতেই লিখি। ডিক্টেশন দিয়ে অন্যদের দ্বারা লেখানোর অভ্যাস আমার নেই। তাতে আরো একজনের সময় ও শ্রম ব্যয় হবে বলে শুরু করিনি।

আল্লাহর রহমতে এ লেখা যেটুকু পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে, এর ফলে লেখা বন্ধ করার চিন্তাও করতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার এ দায়বদ্ধতার কারণেই লিখতে বাধ্য হচ্ছি। তাদের কাছে দোআ চাই, যেন এ লেখা চালু থাকে। আরো দোআ চাই, যতদিন আল্লাহ তাআলা হায়াতে রাখেন, আমাকে যেন কর্মক্ষম রাখেন। অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় দীর্ঘ দিন পড়ে থাকার জীবন থেকে তাঁর নিকট পানাহ চাই। হঠাৎ মৃত্যু থেকেও তাঁর দরবারে আশ্রয় চাই।

রাসূল (স) এ দু রকম মৃত্যু থেকেই পানাহ চেয়েছেন। মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি যে দোআ শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি নিয়মিতই করি। আমার দোআ যেন কবুল হয় সেজন্য সবার নিকটও দোআ চাই।

ঐ দোআ আমার লেখা 'আল্লাহর দরবারে ধরনা' পুস্তিকার ২৩ নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছি। এর অনুবাদ– 'হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে আছি বেশি বেশি নেকী কামাই করার তাওফীক দাও এবং মওত যেন আমাকে সকল মন্দ থেকে রেহাই দেয়। হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখো এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিও।'

মুন্নীবিহীন জেদ্দা

১৯৯৬ সাল থেকে মামূন জেদ্দায় আছে। তখন থেকে যত বার এসেছিলাম বৌমা 'মা মুন্নী'র সেবা-যত্ন উপভোগ করেছি। ২০০৩ সালে সাড়ে তিন মাস মা মুন্নীকে কাছে পেয়েছি। মামূন তো সারাদিন অফিসেই কাটায়। আমি অবশ্য বেশি সময় লেখায় ব্যস্ত থাকতাম। মুন্নী আমার সাথে আলোচনা করতে চাইত। আমি তার সাথে নাশতা ও খাবার সময় প্রচুর আলাপ করে তৃপ্তি বোধ করতাম। ওর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মুসলিম বিশ্বের সংকট, ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম সরকারসমূহের নিষ্ক্রিয়তা, ইসলামের বিজয়ের জন্য করণীয় ইত্যাদি।

এবার জেদ্দায় এসে যে বাসায় উঠলাম, তা নতুন বাসা হলেও মা মুন্নীর সাজানো পরিচিত বাড়িই পেলাম। এখন যে চেয়ারে বসে এবং যে টেবিলে লেখা-পড়া করছি তাও অতি পরিচিত। শুধু সে-ই অনুপস্থিত। এসব কথা মনে মনেই ভেবেছি। মামূনের সাথে বলে ওর মনোবেদনা তাজা করতে চাইনি। আমার স্ত্রীর কাছেও এ অনুভূতি প্রকাশ করিনি।

মামূনের বড় মেয়ে লুবাবা লন্ডনে পড়ে। আমরা এখানে থাকাকালেই সে দু সপ্তাহের ছুটি পেয়ে আসতে চায়। আমি বললাম, জুন মাসেই তো আমরা ইনশাআল্লাহ লন্ডন যাচ্ছি। সেখানেই তো দেখা হয়ে যাবে। এখন এত খরচ করে আসার দরকার কী?

মামূন বলল, আমি মুন্নীর শাড়িগুলো ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় এবং ব্যবহারের জিনিসে হাত দিতে গেলে নিজেকে সামলাতে পারি না। তাই লুবাবা এসে এগুলো

গুছিয়ে নিয়ে যাবে বা যা করার করবে। বুঝলাম, মুন্নীর স্মৃতি ওর অন্তরে কতটা করুণভাবে গভীর।

মা মুন্নীর ইন্তিকালের পর মামূনের ১০ বছর বয়সী ছোট মেয়ে নুসাইবার দেখাশোনার প্রয়োজনেই তাড়াহুড়া করে দ্বিতীয় বিয়ে করালাম। এ বৌমাই এবার মুন্নীর বদলে আমাদের সেবা-যত্ন করছে। নুসাইবা অবশ্য এখন লন্ডনেই পড়ছে। ওর বড় ভাই ও ভাবীর বাসায় খুশিতেই আছে। মামূন ওর অভাব বোধ করে। নুসাইবার অভাবে বৌমা খুব একাকিত্ব বোধ করে। মামূন অফিসে চলে গেলে বৌমা একেবারেই একা। আমরা আসায় সে খুব খুশি।

তুরস্ক সফর

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে ঘটনাক্রমে ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের সাথে কুয়েতে দেখা হয় এবং তিনি আমাকে তুরস্ক সফরের দাওয়াতনামা পাঠাবেন বলে জানালেন। রেফাহ পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি পার্টির পক্ষ থেকে ইস্তাম্বুলের বিজয়োৎসবের বিরাট আয়োজন করেন; ঐ মহা-উৎসবে বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান।

১৯২৩ সালে মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্কের সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন কঠোরভাবে চালু করেন যে, ইসলামের জন্য শুধু ধর্ম হিসেবেও টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। বদিউয্‌যামান সাঈদ নুরসীর দীর্ঘ অবিরাম প্রচেষ্টায় জনগণের মাঝে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও সরকারিভাবে ইসলাম ও কুরআনের নামে কোনো কিছুই করা বৈধ নয়। এ পরিবেশেই ড. আরবাকানের নেতৃত্বে ইসলামের নাম উল্লেখ না করেই ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়। রেফাহ্‌ পার্টি তেমনি একটি সংগঠন। এ সংগঠনের পক্ষ থেকেই তুরস্ক সফরের দাওয়াত পেলাম।

১৯৯৫ সালের ২৮ জুন আমি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের তুরস্কের সবচেয়ে বড় শহর ইস্তাম্বুলে পৌঁছলাম। বিমানবন্দর থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদেরকে হোটেল বসফোরাস নামক বিশাল পাঁচতারা হোটেলে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। ১৪তলা হোটেলের ১০ম তলায় আমরা ছিলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা গেল বিস্তীর্ণ জলরাশি। তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী বসফোরাস প্রণালি। রাশিয়ার 'সস্তিকা' চিহ্নিত জাহাজও দেখা গেল। নিচের দিকে তাকালে দেখা গেল প্রশস্ত রাস্তার সাথেই ছোট-বড় নৌকা বাঁধা। রাস্তা দিয়ে অবিরাম গাড়ি চলছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেও দেখা গেল।

তুরস্কের পূর্বস্মৃতি

১৯৯৫-এর তুরস্ক সফরের পূর্বে আমার নির্বাসনজীবনে ১৯৭৭ সালে জুলাই মাসে লন্ডন থেকে ইস্তাম্বুলে গেলাম। IIFSO (International Islamic Federation of

Students Organization)-এর সম্মেলন উপলক্ষে আমাকে দাওয়াত করা হয়। তখনো এ এলাকায়ই অন্য একটি হোটেলে ছিলাম। ঐ সফরের বিবরণ ১৯০ নং কিস্তিতে রয়েছে, যা জীবনে যা দেখলাম পঞ্চম খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠা থেকে কয়েক পৃষ্ঠার মাঝে বর্ণিত হয়েছে।

বিগত সফরের ১৮ বছর পর এই সফর হলো। বিগত সফরের স্মৃতিচারণ করে অনুভব করলাম যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দাপট সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়। তখন পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে তুরস্কের মহিলাদেরকে ইউরোপীয়ই মনে হয়েছে। হিজাবপরা মহিলা খুবই বিরল ছিল। এবার রাজপথে হিজাবপরা মহিলার সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। পূর্বসফরে যে যুব সম্মেলনে এসেছিলাম, তাতে তুরস্কের যুবকদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িতদের সংখ্যা অল্পই মনে হয়েছে। এবার বিপুল সংখ্যায় যুবক ও ছাত্রদেরকে উৎসবের আয়োজনে কর্মতৎপর দেখা গেল।

ইস্তাম্বুল বিজয়ের উৎসব

ইস্তাম্বুলের পূর্ব নাম কনস্টান্টিনোপল। এটা গ্রিকদের দখলে ছিল। ১৩ শতাব্দীর শেষদিকে হালাকু খাঁ আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করে দেওয়ার পর গ্রিস, ইটালি, স্পেন খিলাফতের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়। তুরস্কের একাংশের আমীর উসমান ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে ঈমানী জযবা নিয়ে অগ্রসর হন। অসীম সাহসী সেনাপতি হিসেবে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের মতোই বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে থাকেন। আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর উসমানী খিলাফত ৩০০ বছর পর্যন্ত ইসলামী আদর্শ ও নৈতিক মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় মিসর থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত খিলাফত বিস্তৃত হয়।

খলীফা উসমান এত বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও তিনি বারবার চেষ্টা করেও কনস্টান্টিনোপল গ্রিকদের দখল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হননি। খলীফা উসমানের তৃতীয় প্রজন্ম সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ১৪৫৩ সালে এটা দখল করে ইস্তাম্বুল নামকরণ করেন। ঐ যুদ্ধে স্বয়ং গ্রিক সম্রাট অংশগ্রহণ করে নিহত হন।

ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের রেফাহ্ পার্টি ঐ বিজয়ের স্মরণে এক বিশাল বিজয়োৎসবের আয়োজন করে, যাতে যুবসমাজকে ইসলামী জযবায় উদ্বুদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কে ইসলামী বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

উৎসবের বিবরণ

ইস্তাম্বুল তুরস্কের সর্ববৃহৎ শহর। বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা করা হয় ইসমত উনূনু স্টেডিয়ামে। ইসমত উনূনু কামাল পাশার সময়ে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কামাল

পাশার মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘদিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারই নামে নির্মিত বিশাল স্টেডিয়ামে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এমন বিশাল স্টেডিয়াম আমি ইতঃপূর্বে দেখিনি।

বিশাল মাঠের চারদিকে নিচ থেকে অনেক উপর পর্যন্ত সাজানো গ্যালারি। সিঁড়ির সংখ্যা কত তা গণনা করার খেয়াল করিনি। এত উঁচু গ্যালারিও কোথাও দেখিনি।

গ্যালারির যে দিকটায় বিদেশি মেহমানদের বসার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে আমাদেরকে মাগরিবের নামাযের পর নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে উৎসবের প্রধান উপাদানসমূহ একটানা দেখা সম্ভব হয়। আসরের পর গেলে মাগরিবের নামাযের জন্য ওঠে আসতে হতো। এত প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আসা-যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল।

গ্যালারিতে বসার পর প্রথমে চারদিকে তাকিয়ে লক্ষ করলাম যে, নিচ থেকে উপর পর্যন্ত গ্যালারির কোথাও সামান্য জায়গাও খালি নেই। প্রতিটি সিঁড়ি লোক ঠাসা। আমরা অনুমান করলাম যে, দু লাখের কম হবে না। স্টেডিয়াম গোলাকৃতি হয় বলে এক জায়গায় বসেই সবটুকু দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যেখানে বসেছিলাম এর ডানদিকে সামান্য দূরেই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা। হাজার হাজার মহিলাকে গ্যালারিতে গাদাগাদি করে বসা দেখা গেল। তাদের সবাই হিজাবপরা অবস্থায় ছিলেন। রাস্তা-ঘাটে ইউরোপীয় পোশাকপরা অনেক মহিলা দেখা গেলেও স্টেডিয়ামে একজনকেও ঐ পোশাকে দেখা গেল না। ইস্তাম্বুল বিজয়োৎসব পালন করতে ইউরোপীয় পোশাক যে মানানসই হতে পারে না তা নিশ্চয়ই তারা উপলব্ধি করেছেন।

নিচে মাঠের দৃশ্য

গ্যালারি থেকে নিচের দিকে বিশাল মাঠেই উৎসবের আসল দৃশ্য। যুদ্ধসাজে সজ্জিত একদল অশ্বারোহী বিজয়ের আনন্দে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে। মঞ্চ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে গান পরিবেশন করা হচ্ছে।

আমাদের আগে উৎসবের শুরু থেকে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের নিকট থেকে জানা গেল, মঞ্চ থেকে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআনের দীর্ঘ তিলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছে। তুরস্কে কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াতের রেওয়াজ নেই। সরকার সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক।

মাঠের অপরূপ, বিচিত্র ও চমকপ্রদ যেসব দৃশ্য দু লাখ লোককে উৎসবে মাতিয়ে রাখছিল, এর বিস্তারিত বিবরণ লেখা সম্ভব নয়। ঘটনার এগারো বছর পর লিখতে গিয়ে সব দৃশ্য স্মৃতির সাগর থেকে তুলে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ঐ পরিবেশটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উপভোগ করার কথা কিছুতেই ভোলার নয়। মঞ্চ থেকে তুর্কি ভাষায় যেসব বক্তব্য ও গান পরিবেশন করা হচ্ছিল, এর অর্থ বোঝার সাধ্য আমাদের ছিল

না বটে; কিন্তু গ্যালারিতে উপস্থিত সকলের ভাবভঙ্গি, উল্লাস ও উচ্চৈঃকণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিক্রিয়া থেকে আমরাও তাদের আনন্দে পূর্ণরূপে শরীক বলে অনুভব করেছি।

আমরা উপলব্ধি করেছি যে, ইস্তাম্বুলে ইসলামের ঐতিহাসিক বিজয়ের সাড়ে পাঁচ শ' বছর পর অনুষ্ঠিত এ মহোৎসব তুরস্কের জনগণের মাঝে নতুন করে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯২৩ সাল থেকে দীর্ঘ ৭২ বছর কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চেতনায় জনগণকে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অন্তর থেকে ঈমানের অগ্নিকণা নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ড. আরবাকানের রেফাহ পার্টি ঐ উৎসবের ব্যবস্থা করে ঐ অগ্নিকণাকে অগ্নিশিখায় পরিণত করতে সক্ষম হয়।

রেফাহ্ পার্টির অগ্রগতির পটভূমি

১৯৯৪ সালে তুরস্কে স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন, পৌরসভা ও নিম্নপর্যায়ের সংস্থার এ নির্বাচনে রেফাহ্ পার্টি ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। ড. আরবাকানের নেতৃত্বে রেফাহ্ পার্টি এর পূর্বে সারা দেশে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালায় এবং জনগণের মধ্যে সৎ লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবিরাম প্রচারণা চালিয়ে এ চেতনা সৃষ্টি করে যে, জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত হয়, তারা যদি ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রবান ও সৎ না হয় তাহলে তাদের নিকট থেকে জনসেবা কিছুতেই আশা করা যায় না।

রেফাহ্ পার্টি জনগণের মাঝে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালায় এবং সমাজে যারা সৎ বলে পরিচিত এবং যারা সততা অবলম্বন করতে আগ্রহী, তাদেরকে সংগঠিত করতে থাকে। সাধারণত সমাজের ভালো লোকেরা নিরিবিলি থাকতে চায়। ঝামেলা এড়িয়ে চলাই তারা পছন্দ করে। তাই অসৎ লোকেরা সংগঠিত হয়ে জনগণের নেতা হওয়ার উদ্দেশ্যে তৎপরতা চালায়। রেফাহ্ পার্টি সমাজের ভালো মানুষগুলোকে সংগঠিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়।

ঢাকা শহরে লক্ষ করা যায় যে, একটি মহল্লায় গুটিকতক লোক সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারী। তারা সুসংগঠিত হওয়ায় মহল্লার শত শত অধিবাসী তাদের ভয়ে অস্থির; কিন্তু মহল্লাবাসীরা যদি সংগঠিত হয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে সন্ত্রাসীরা পালাতে বাধ্য হবে।

তুরস্কে রেফাহ্ পার্টি কয়েক বছরের অবিরাম প্রচেষ্টায় জনগণের মাঝে এ চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে, সকল নির্বাচনে সৎ লোকদেরকে ভোট দিতে হবে। যারা রেফাহ্ পার্টির দাওয়াত জনগণের মাঝে প্রচার করছে, তারা সমাজে ভালো বলে পরিচিত হওয়ায় এ দলের জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৯৪ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাফল্য

রেফাহ পার্টি এ নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। সবচেয়ে বড় শহর ইস্তাম্বুল ও রাজধানী শহর আংকারা কর্পোরেশনসহ অধিকাংশ কর্পোরেশন, পৌরসভা ও নিম্নপর্যায়ের

স্থানীয় সরকার সংস্থায় এ পার্টি বিজয়ী হয়ে সারা দেশে তাক লাগিয়ে দেয়।

এ বিরাট বিজয়ের কারণেই ১৯৯৫ সালে রেফাহ পার্টি ইস্তাম্বুল বিজয়ের মহোৎসব এত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ নির্বাচনে ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন রাসেফ তাইয়েব এরদোগান, যিনি বর্তমানে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী।

এ নির্বাচনে বিজয়ের ফলে রেফাহ পার্টির নির্বাচিত লোকদের জনসেবায় মুগ্ধ হয়েই ১৯৯৬ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও রেফাহ পার্টি সকল দলের চেয়ে অধিক সংখ্যক আসনে বিজয়ী হয় এবং ড. নাজমুদ্দীন আরবাকান প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৯৫ সালে সফরে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম, ১৯৯৪ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর রেফাহ পার্টির বিজয়ী সৎ লোকেরা তাদের জনসেবা দ্বারা জনগণকে এমন সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন, পরবর্তী পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

ইস্তাম্বুল সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কে জানা গেল, বিজয়ের সাথে সাথেই মেয়র তাইয়েব এরদোগান ঘোষণা করেন যে, ট্যাক্স আগে যা ছিল তা-ই থাকবে; বাড়ানো হবে না। কর্পোরেশনের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে যেন কাজের জন্য ঘুষ দেওয়া না হয়। ঘুষ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ বাক্সে নালিশ করতে হবে। ঘুষখোর কোনো লোককে চাকরিতে বহাল রাখা হবে না।

আগে ট্যাক্স দিতে গেলেও ঘুষ দিতে হতো। কোনো বৈধ সেবাই ঘুষ ছাড়া পাওয়া যেত না। ঘুষ বন্ধ হওয়ায় করদাতারা খুশি হয়ে দলে দলে অফিসে ট্যাক্স দিতে চায়। ফলে বিনা খরচে সকল কর সংগ্রহ হয়ে যায়।

সততা চালু হওয়ার ফলে পূর্বে কর্পোরেশন যে পরিমাণ জনসেবা দিতে পেরেছে, রেফাহ পার্টি এর দ্বিগুণ জনসেবা দিয়েছে। ট্যাক্স বৃদ্ধি না করেও বেশি খিদমত করতে পারায় জনগণ দারুণ খুশি।

ইস্তাম্বুল মহানগরীতে পানি ও বিদ্যুৎ সংকটে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। মাত্র এক বছরের মধ্যে এ সংকটের সমাধান হওয়ায় অতি দ্রুত রেফাহ পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

সারা দেশে স্থানীয় সরকার সংস্থার মাধ্যমে রেফাহ পার্টি জনগণকে যে সেবা দান করতে সক্ষম হয়েছে, এর ফলে জনগণ সহজেই উপলব্ধি করেছে যে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে রেফাহ পার্টির হাতেই দেশের ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। এক বছর পর পার্লামেন্ট নির্বাচনে জনগণ এ দলকেই বিজয়ী করে সরকার গঠনের সুযোগ করে দেয়।

৩০৮.

ইংল্যান্ড সফর

আমার নির্বাসনজীবনে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ সালের জুলাইয়ের ১০ তারিখ পর্যন্ত লন্ডন শহরেই আমার সাথে সকলের যোগাযোগের ঠিকানা ছিল। আমার ছেলেরা ম্যানচেস্টারে থাকলেও আমার ঠিকানা লন্ডনেই ছিল। আমি মাঝে মাঝে ওদেরকে দেখার জন্য বেড়াতে যেতাম। এমনকি ১৯৭৩ সালে আমার স্ত্রী ছোট দু ছেলে নোমান ও সালমানকে নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর লন্ডনে এলেন; কিন্তু তারাও ম্যানচেস্টারেই গিয়ে অবস্থান করল। আমার ঠিকানা লন্ডনেই রইল।

লন্ডনে আমার দূরসম্পর্কের ভাতিজা রিয়াজুদ্দীনের ৮৭ নং লুইশাম রোডের বাড়িতে আমার স্থায়ী ঠিকানা হলেও আমি একটানা ৪ মাসও ইংল্যান্ডে বসবাস করিনি। আমি বিভিন্ন উপলক্ষে বহু দেশ সফর করেছি। ম্যানচেস্টারে আমার স্ত্রী ও ছেলেদের সাথে একটানা কয়েক মাস থাকলেও আমি কয়েক দিনের বেশি একসাথে থাকিনি।

আমার নির্বাসনজীবনের ৭ বছরের মধ্যে প্রায় ৬ বছরই আমার ঠিকানা লন্ডনই ছিল। দেশি-বিদেশি ইসলামী ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে ঢাকা ফিরে যাওয়ার পর আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে দীর্ঘ ১৮ বছর আমার জন্মভূমিতেই আটক অবস্থায় ছিলাম। নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিদেশে ৭ বছর ও দেশে ১৭ বছর থাকতে হয়। ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের সর্বসম্মত রায়ে নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার এক বছর পর ১৯৯৫ সালের আগস্টের ৩ তারিখে পুরনো পরিচিত লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

লন্ডনে আমার সফরের আয়োজন

ইউরোপে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর সহযোগী ইসলামী সংগঠন 'ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ'-এর প্রেসিডেন্ট ড. আবদুল বারীকে আমার সফর সম্পর্কে ঢাকা থেকে জামায়াতের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের বিস্তারিত পরামর্শ দেন :

১. লন্ডনস্থ সকল ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী রিসিপ্‌শন কমিটি করতে হবে।
২. এ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এমন ব্যক্তিকে বাছাই করতে হবে, যিনি সকল ইসলামী সংগঠনের নিকট গ্রহণযোগ্য।
৩. অভ্যর্থনা উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলন লন্ডনের সর্ববৃহৎ হলে অনুষ্ঠিত হতে হবে।
৪. সম্মেলনটি আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে এবং বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বকে মেহমান হিসেবে উপস্থিত করতে হবে।

৫. এ সম্মেলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্যে যোগদানকারীদেরকে টিকিট খরিদ করার সুযোগ দিতে হবে, যাতে জনগণের মাঝে এ ধারণা জন্মে যে, টিকিট কিনেই সম্মেলনে আসতে হবে।

রিসিপ্‌শন কমিটি গঠন

উপরিউক্ত পরামর্শ অনুযায়ী ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সকল ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে রিসিপশন কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য সম্মত করতে সক্ষম হয়। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে লন্ডনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ইসলামী ব্যক্তি আগ্রহের সাথে সম্মত হন। তিনি হলেন শায়খ সালেম আযযাম। তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমি যখন (১৯৭৩-'৭৮) লন্ডনে নির্বাসনজীবন যাপন করছিলাম তখন তিনি সৌদি দূতাবাসের কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি সবাইকে ইসলামী তৎপরতায় উৎসাহ দিতেন। সে হিসেবেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ মার্চ তাঁর অফিসে আমি আরো দু জন সাথি নিয়ে একটি ইসলামী কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। আলোচনা শুরু করার মুহূর্তেই রয়টার থেকে ফোনে তিনি জানতে পারলেন যে, বাদশাহ ফায়সালকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

শায়ক সালেম আয্যান এক সীরাত মাহফিলে সভাপতিত্ব করছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে নারী-পুরুষ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের লোক, এমনকি কয়েক জন ব্রিটিশ পুরুষ এবং মহিলাও ছিলেন। আমার বক্তব্য পেশ করার পর সভাপতি এত খুশি হলেন যে, আমাকে জড়িয়ে ধরে মুবারকবাদ জানাতে থাকলেন।

১৯৭৪ সালের আগস্টে লন্ডনে এক হোটেলে ইউকে ইসলামিক মিশনের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে জনাব সালেম আযযাম বলেন, 'দুনিয়ার সর্বত্রই যাঁরা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় তাঁরা মাওলানা মওদূদীকে তাঁদের প্রিয় নেতা মনে করেন। শুধু পাকিস্তানিরা আপনার কর্মী নয়। আপনি আমাদেরকেও আপনার কর্মী মনে করবেন। আপনার চিন্তাধারা আমাদের মাঝেও প্রেরণা জোগায়।'

১৯৭৬ সালের মে মাসে লন্ডনে সপ্তাহব্যাপী বিরাট এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মহাসম্মেলনের জন্য যে রিসিপ্‌শন কমিটি গঠন করা হয়, এর চেয়ারম্যান হিসেবে ঐ সালেম আযযামই দায়িত্ব পালন করেন।

আমি ইংল্যান্ড থেকে দেশে চলে যাওয়ার পর জনাব সালেম আযযাম সৌদি দূতাবাস থেকে অবসর গ্রহণ করে ইসলামের খিদমতের উদ্দেশ্যে 'ইসলামিক কাউন্সিল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বাংলাদেশ থেকে এর সদস্যপদ গ্রহণের জন্য তিনি আমাকে চিঠি দেন। আমি এ পদ গ্রহণ করলেও নাগরিকত্ব সমস্যার দরুন কোনো বৈঠকেই যোগদান করতে পারিনি।

ইসলামিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তিনি স্থায়ী অবদান হিসেবে গণ্য দুটো বিরাট কাজ করেছেন :

১. ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তিনি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি মডেল ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করেন। আরবী ও ইংরেজিত তা প্রকাশ করে সকল মুসলিম দেশে পাঠান; আমার নিকটও পাঠিয়েছেন।

২. তিনি Human Rights in Islam নামে একটি মূল্যবান পুস্তক আরবী ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। আমার নিকট এ বইটিও পাঠিয়েছেন। এ দুটো মূল্যবান বই আমি সযত্নে রেখেছি।

আমার লন্ডন সফর উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সালেম আযযাম সাহেব গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর সভাপতি ঐ কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। নাসের সাহেব এমন শক্তিশালী কমিটি গঠনের কথা জেনে ড. আবদুল বারীকে অভিনন্দন জানান।

লন্ডন পৌঁছলাম

১৯৯৫ সালের ৩ আগস্ট ভোরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে রওয়ানা হয়ে সেদিনই সন্ধ্যার পর হিথ্রু বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। আমার সফরসাথি জামায়াতের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি আবু নাসের। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করে বের হতেই একদল উৎফুল্ল দীনী ভাইকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের পুরোভাগে রিসিপশন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সালেম আযযাম স্বয়ং উপস্থিত দেখে আমরাও উৎফুল্ল হলাম। দীর্ঘ আঠারো বছর পর তাঁর সাথে দেখা। অত্যন্ত আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। তিনিও আবেগ প্রকাশ করলেন, তাঁর সাথিদের সবার সাথেই কোলাকুলি হলো। ড. আবদুল বারী, চৌধুরী মুঈনুদ্দীন, মুসলেহুদ্দীন ফারাদীর মতো পুরনো সাথিদের ছাড়াও বেশ কিছু নতুন মুখ দেখলাম।

কোলাকুলির পালা শেষ হলে আমার লন্ডন আগমনকে স্বাগত জানিয়ে রিসিপশন কমিটির চেয়ারম্যান সালেম আযযাম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে হাজির হওয়ায় আমি সবার প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে আপনাদের সাথে আমার সম্পর্ক। এর চেয়ে গভীর ও এর মতো মধুর সম্পর্ক আর হতে পারে না। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (স)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই আমরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মযবুত বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা সবাই একই দীনের খাদেম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আজীবন ইসলামের বিজয়ের জন্য যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করুন।

অভ্যর্থনার আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমাকে সাথে নিয়ে তাঁদের গাড়িবহর লন্ডন শহরে এগিয়ে চলল। লন্ডন আমার পরিচিতি শহর। প্রায় ৬ বছর এখানে কেটেছে। পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে যেখানে পৌঁছলাম তা নামে অতি পরিচিত হলেও আকারে

একেবারেই নতুন। ইস্ট লন্ডন মসজিদ– আমি কাঠের তৈরি মসজিদ দেখে গেছি। এখন সুরম্য বিল্ডিং দেখার মতো, চমৎকার গম্বুজ, মসজিদসংলগ্ন মেহমানখানার ব্যবস্থা করা হলো।

সম্বর্ধনা সম্মেলন

আমাকে সম্বর্ধনা জানানো উপলক্ষে বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৬ আগস্ট উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ সম্মেলনের আয়োজন করে। ড. আবদুল বারী তখন ফোরামের প্রেসিডেন্ট।

ইস্ট লন্ডনের ডকল্যান্ড এলাকায় London Arena নামক বিশাল হলে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, লন্ডনের অনেক ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যে সম্বর্ধনা কমিটি গঠিত হয় এর চেয়ারম্যান সকলের শ্রদ্ধাভাজন শায়খ সালেম আযযাম তাঁর কমিটিসহ হলে আমার আগেই উপস্থিত হন।

আমি সম্মেলনে যে গাড়িতে গেলাম তাতে আমার সাথে জামায়াতের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি আবু নাসের ছিলেন। তিনি আমার পাশেই বসেছিলেন। আমি লক্ষ করলাম যে, তার চোখে অবিরাম পানি ঝরছে। কিছু বিব্রত বোধ করলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি সম্মেলনের সাফল্যের জন্য আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়ে আছেন।

সম্মেলনস্থলের নিকটে দেখা গেল, ১৫/২০ জন বাংলাদেশিকে পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে এবং তারা কিছু স্লোগান দিচ্ছে। জানা গেল, আওয়ামী লীগপন্থিরাই আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হাজির হয়েছে। সম্মেলন অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা করার সম্ভাবনা আঁচ করেই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ পুলিশকে জানিয়ে রাখায় তারা ঘেরাও অবস্থায় ছিল। দেশে আমার অনেক সমাবেশে এ জাতীয় লোকেরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। দেশে পুলিশ তামাশা দেখেছে, আর আমাদের কর্মীরা তাদেরকে প্রতিহত করেছে। আমাকে সম্মেলনস্থলে পৌঁছিয়ে দিয়ে নাসের সাহেব বাইরে গেলেন। পুলিশের সাথে কথা বললেন। পুলিশ জানতে চাইল, কী কারণে ওরা বিরোধিতা করল? নাসের সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, সম্মেলনে কত লোক যোগদান করছে? পুলিশ বলল, অনেক। আবার প্রশ্ন করা হলো, বিরোধিতা করেছে ক'জন? পুলিশ বলল, অল্প কয়েক জন। নাসের সাহেবকে আর কিছু বলতে হলো না, পুলিশ বুঝ পেয়ে গেল।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানস্থল

আমি মঞ্চে উপস্থিত হলে রিসিপশন কমিটির চেয়ারম্যান সালেম আযযাম ও ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর প্রেসিডেন্ট ড. আবদুল বারী আমাকে সাদরে গ্রহণ করে যথাস্থানে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

হলে উপস্থিত শ্রোতাদের বিরাট সংখ্যা দেখে আয়োজকগণ অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলেন। এ ধরনের সম্মেলনে টিকিট কিনে আসার রেওয়াজ বাংলাদেশে নেই। তাই আমি একটু চিন্তিত ছিলাম যে, সম্মেলনে উপস্থিতি সন্তোষজনক হবে কি না।

ফোরামের সভাপতি ড. আবদুল বারীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুরু হলো। সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ থেকে তিলাওয়াতের পর জনাব সালেম আযযাম আমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখলেন। ইসলামী আন্দোলন করার কারণে আমাকে যে যাতনা সহ্য করতে হয়েছে তা তিনি উল্লেখ করলেন। সাত বছর নির্বাসনে ও তেইশ বছর নাগরিকত্ববিহীন অবস্থায় থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, মুজাহিদের জীবনে এ জাতীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হয়। আমাকে 'মহান মুজাহিদ' হিসেবে সম্বোধন করে তিনি আমার দীর্ঘ জীবন ও সাফল্যের জন্য দোআ করলেন।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন কাবা শরীফের প্রধান ইমাম ও হারামাইন শরীফাইন কমিটির তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট শায়খ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সুবাইল। তিনি ইসলামের প্রতি মুসলিমদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শুধু ব্যক্তিজীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট নয়; ইসলামের শিক্ষা জনগণের মাঝে সাধ্যমতো প্রচার করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। প্রত্যেক মুসলিমকে কথায় ও কাজে ইসলামের নমুনা পেশ করতে হবে, যাতে অমুসলিমরা তাদের জীবন থেকে ইসলামের সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। তিনি আরবী ভাষায় ভাষণ দান করেন।

সম্মেলনে অন্যতম অতিথি বক্তা হিসেবে সুদানের তদানীন্তন ইখওয়ান নেতা ড. মুহাম্মদ হাসান তুরাবীকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তিনি আসতে অক্ষম হওয়ায় তাঁর বক্তৃতার ভিডিও শোনানো হয়। একটি বড় পর্দায় তাঁকে ভাষণ দিতে দেখা যায়। ১৯৭২ সালে হজ্জের মওসুমে তাঁর সাথে জেদ্দায় পরিচয় হয়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আমার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় ভাষণ দান করেন।

আমেরিকা থেকে দু জন নওমুসলিম অতিথি বক্তা হিসেবে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। একজন সাদা রংয়ের। তাঁর নাম হামযা ইউসুফ। তিনি সারা আমেরিকায় ইসলামের একজন বলিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে খ্যাত। অপরজন কালো রংয়ের, সিরাজ ওহ্যাজ নামে পরিচিত। ইমাম সিরাজ ওহ্যাজ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে আরবী ভাষাও আয়ত্ত করেন। নিউইয়র্কে তিনি এক মসজিদের খতীব।

এ দু জনই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্টাইলে সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। আলোচ্য বিষয় ছিল Islam, the only way for humanity. হামযা ইউসুফ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করেন। ইমাম সিরাজ ওহ্যাজ এমন জোশের সাথে বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন।

লিস্টারের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর খুরশিদ আহমদ ও ডাইরেক্টর জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার খুররম মুরাদও অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মুরাদ সাহেব ঢাকা শহরে জামায়াতের আমীর হিসেবে আমার সাথী ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করলেন এবং আমার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ায় মুবারকবাদ জানালেন।

সম্মেলনে আমার ভাষণ

'মানবজাতির জন্য ইসলামই একমাত্র পথ' বিষয়ে আমার বক্তব্যে যা বলেছি এর সারকথা নিম্নরূপ :

১. সৃষ্টিজগতে ছোট-বড় প্রতিটি সৃষ্টির জন্য বিধান রয়েছে। কতক মানুষ ঐ বিধানকে Laws of Nature বলে। Nature বা প্রকৃতি কোনো বিধান রচনা করে না। স্রষ্টাই এসব বিধানদাতা। মানবদেহের জন্য যাবতীয় বিধান মানুষ বানায়নি। যিনি গোটা সৃষ্টিলোকের জন্য বিধান প্রণয়ন করেছেন তিনিই মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সামষ্টিক জীবনের বিধানও দান করেছেন। মানবদেহসহ সকল সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধান তিনি নিজেই জারি করেন। তাই সৃষ্টিজগৎ কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো সৃষ্টিই তা অমান্য করতে সক্ষম নয়।

   মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের জন্য স্রষ্টা যে বিধান দিয়েছেন তা নবী ও রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। সে বিধান মেনে চলতে তিনি মানুষকে বাধ্য করেননি। মানুষ যদি সে বিধান স্বেচ্ছায় মেনে চলে তাহলে প্রাকৃতিক জগতের মতোই শান্তি উপভোগ করতে পারে। স্রষ্টার বিধানকে অমান্য করার ফলেই মানবসমাজে এত অশান্তি বিরাজ করছে।

২. আজ বিশ্বে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা Divine Guidance-এর কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিকেই যথেষ্ট মনে করেন। এ চিন্তাধারার নামই সেক্যুলারিজম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করায় মানবজাতির অকল্যাণই বৃদ্ধি করছে।

৩. মুহাম্মদ (স) ঐতিহাসিক যুগেই স্রষ্টার রচিত বিধানকে প্রয়োগ করে পরম কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করে বাস্তবে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামই মানবজাতির জন্য একমাত্র পথ।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সম্মেলনের বিরাট সাফল্য ফোরামের সকলের মাঝেই ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। YMO (ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন)-এর কর্মীরা এতটা উদ্দীপ্ত হয় যে, পরবর্তীতে প্রতিটি কর্মসূচি সফল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

লন্ডনে আমার কর্মতৎপরতা

১৯৯৫ সালের ৩ আগস্ট সন্ধ্যার পর লন্ডন পৌঁছলাম এবং ২৯ আগস্ট আমেরিকা সফরে গেলাম। ২৫ দিন ইংল্যান্ডে আমি কিভাবে কাটালাম এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি :

১. একটি বিশাল সুধী সমাবেশ

   লন্ডন এরেনার সম্মেলনে বাংলাদেশি ছাড়াও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক ছিল। তাই সেখানে সবাই ইংরেজিতে বক্তব্য রেখেছেন। তাছাড়া সেখানে

আলোচ্য বিষয় ছিল ইসলাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে সেখানে কোনো আলোচনা হওয়ার কথাই ছিল না।

লন্ডনস্থ বাংলাদেশি সুধীবৃন্দের একটি বড় সমাবেশ করা খুবই প্রয়োজন ছিল, যেখানে বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখা ও শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ এ উদ্দেশ্যে লন্ডন কুইন মেরি কলেজের হলে সুধী সমাবেশের আয়েজন করে।

আওয়ামীপন্থিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও লন্ডন এরেনার সম্মেলন অত্যন্ত সফল হওয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। ফলে সুধী সমাবেশে বিপুল লোক সমাগম হওয়ায় হলের বাইরে ও বারান্দায় অনেককে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনতে হয়। ফোরামের প্রেসিডেন্ট ড. আবদুল বারী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

সমাবেশে আমার বক্তব্যে তিনটি পয়েন্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি :

ক. ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত থেকে পৃথক হয়। বিশ্বে বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ।

খ. বাংলাদেশের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরাও ধর্মে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ ভারতের চাপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দেশের আদর্শ হিসেবে শাসনতন্ত্রে স্থান দিয়েছিল; কিন্তু ১৯৭৭ সালে এ কুফরী মতবাদ গণভোটের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়। শাসনতন্ত্রে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। ঐ গণভোটে তা-ও বাতিল হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকে বৈধ দল হিসেবে রাজনীতি করছে। রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। যে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েছে তা জামায়াতে ইসলামীরই অবদান।

গ. কুরআনের মতে, মানবজাতির সকল অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসন। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। মুহাম্মদ (স) দুনিয়ার সবচেয়ে অসভ্য, বর্বর ও বিশৃঙ্খল মানবসমাজে আল্লাহর আইন কায়েম করে ইতিহাসের সভ্যতম রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করেছেন।

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সাড়ে পাঁচ শ' বছর সেখানে আল্লাহর আইনই চালু ছিল। ইংরেজরা সে আইন উৎখাত করে তাদের আইন জারি করেছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসন চলে গেলেও তাদের আইনে এখনো দেশ চলছে। জামায়াতে ইসলামী ইংরেজদের আইনের বদলে আল্লাহর আইনকে আবার চালু করতে চায়।

আল্লাহর আইন নিজে নিজে চালু হয় না। রাসূল (স) আল্লাহর আইন চালু করার যোগ্য একদল মানুষ তৈরি করে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করেন। জামায়াতে ইসলামীও ঐ নিয়মেই লোক তৈরি করছে।

সমাবেশে উপস্থিত সুধীগণকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি আল্লাহর আইন চান? সমস্বরে হাত তুলে সবাই সাড়া দিলেন। তখন আমি বললাম, বাংলাদেশি যারা এদেশে বাস করেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারাও নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলুন, যাতে বাংলাদেশে আল্লাহর আইন চালু করার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এ যোগদান করার পরামর্শও দিলাম।

সর্বশেষ বললাম, বাংলাদেশ বিরাট সম্ভাবনাময় দেশ। জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাই সেখানে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব এবং একটি উন্নত মানের ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলা অসম্ভব নয়।

এরপর শ্রোতাদের লিখিত অনেক প্রশ্নের জবাব দিলাম। বিরোধীরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করে সেসবের জবাব শুনে শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট হলেন বলে বোঝা গেল।

২. ইউকে ইসলামী মিশনের সম্মেলনে প্রধান অতিথি

পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও এলএলবি পাস করে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ষাটের দশকের শুরুতেই লন্ডন আসেন। তাঁরই উদ্যোগে পশ্চিম পাকিস্তানি জামায়াতের লোকদের সহযোগিতায় 'ইউকে ইসলামী মিশন' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র হওয়ার পর বাংলাভাষীরা পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

যারা ইউকে ইসলামী মিশন পরিচালনা করেন, তারা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সমর্থক। এ সংগঠনের অনেক সম্মেলনে আমি অতিথিবক্তা ছিলাম। ২০০৩ ও '০৫ সালে আমি ইংল্যান্ড সফরে গেলে তাদের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেছি। গত বছরও (২০০৪) তারা চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি সময় দিতে পারিনি।

তাদের সাথে আমার এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ১৯৯৫ সালে লন্ডন সফরে গেলে তাদের সম্মেলনেও আমাকে যোগ দিতে হলো। তাদের সম্মেলনে উর্দুতেই বক্তৃতা করতে হয়।

৩. বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকার

বিবিসি লন্ডনে আমার ইন্টারভিউ নেয়। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা, কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি ইসলামী মৌলবাদ, জামায়াতের গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলাম।

৪. মাসিক ইমপেক্ট পত্রিকা অফিস পরিদর্শন

লন্ডন থেকে প্রকাশিত একমাত্র ইসলামী মাসিক 'ইমপেক্ট'। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব হাশের ফারুকী তাঁর অফিসে দাওয়াত করে নিয়ে ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন।

৩০৯.

ইংল্যান্ডে ২৬ দিনের কর্মতৎপরতা

পূর্বের কিস্তিতে ইংল্যান্ডে আমার কর্মতৎপরতার বিবরণে বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকদের যে সমাবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে আমার পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের পর প্রথমেই জনাব আবু নাসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এ কথাটি ঐ লেখায় উল্লেখ করা হয়নি। এত বছর পর স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে এ কথাটি বাদ পড়ে গেছে।

আমার কর্মতৎপরতার চারটি বিষয় ঐ কিস্তিতে এসেছে। বাকিগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো।

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন লিস্টারে অভ্যর্থনা

লন্ডন থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে লিস্টার শহরে পাকিস্তানের অধ্যাপক খুরশিদ আহমদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বিশাল আকার ধারণ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো– (ক) মুসলিম ও অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান করা, (খ) অমুসলিম ও মুসলিমদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, (গ) বৃহত্তর মানবতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ায় অবদান রাখা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন মানবজাতির উন্নয়নে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি উন্নততম মানের গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠানের অনেক বিভাগের মধ্যে প্রধান প্রধান হলো :

১. কুরআন ও সুন্নাহর উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
২. ইউরোপে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;
৩. আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধানে ইসলামী অর্থনীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করা;
৪. পাশ্চাত্যে মুসলিমদের শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করা;
৫. নওমুসলিমদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান ও ট্রেনিং প্রদান;
৬. যেসব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে কাজ করে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টি করা;
৭. প্রকাশনা বিভাগ;

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশনের বিশাল চত্বরে ২০০০ সালে উচ্চশিক্ষার ক্লাসে শিক্ষাদানের উপযোগী বিল্ডিং নির্মাণ শুরু হয় এবং ২০০৩ সালে ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ কিং প্রিন্স চার্লস 'মার্কফিল্ড ইসলামিক হাইয়ার এডুকেশন' (MIHE) নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। লাইফবুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ প্রতিষ্ঠান এমএ ও পিএইচডি-র ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষা দান করে।

প্রকাশনা বিভাগ থেকে ৩০০ বই প্রকাশিত হয়েছে। জার্নাল, ম্যাগাজিন ও নিউজ লেটার নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

এ প্রতিষ্ঠান ইউরোপে মুসলিম উম্মাহর গৌরব। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে আমার ইংল্যান্ড সফর উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেওয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডক্টর খুরশিদ আহমদ। ঐ সময় এর ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার খুররম মুরাদ, যিনি ঢাকায় পাকিস্তান আমলে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের প্রধান ছিলেন এবং জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর আমীর ছিলেন।

অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত সমাবেশে ফাউন্ডেশনে কর্মরত বিভাগীয় দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও লিস্টারের স্থানীয় গণ্যমান্য লোকও আমন্ত্রিত ছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার মুরাদ আমার পরিচিতি উপস্থাপন করতে গিয়ে অনেক কথাই বললেন। অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করলেন।

আমার বক্তব্যে প্রথমে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। বললাম, এ প্রতিষ্ঠানকে আমি এতটা আপন মনে করি যে, এখানে আমি নিজেকে অতিথি মনে করি না। পূর্বে এ দেশে আমার ৬ বছর নির্বাসন জীবনযাপনকালে ১৯৭৭ সালে এখানে এসেছি। আঠারো বছর পর আজ এলাম। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আমি গৌরববোধ করি এবং দোআ করি এর মহান উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ তাআলা সফল করেন।

এরপর দুপুরের খাবারে সবাই শরীক হলেন। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। বিকালে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখলাম। সর্বশেষে প্রফেসর খুরশিদ, ইঞ্জিনিয়ার মুরাদ, ড. মানাযির আহসানের সাথে একান্তে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও আমার নাগরিকত্ব বহালের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চান।

৬. ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর সদস্য-কর্মীদের সমবেত ও পৃথক বৈঠকে কয়েক প্রকার কর্মসূচিতে আমি যোগদান করেছি। এর মধ্যে তারবিয়াতমূলক কর্মসূচিই প্রধান। তারা ইসলামের জীবনবিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে অনেক প্রশ্ন করেছে। তাদের জানার আগ্রহ দেখে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

৭. ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন (YMO) যুবকর্মীদের পৃথক সংগঠন। তারা পাশ্চাত্যের পরিবেশে মুসলিমদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এর সমাধান সম্পর্কেই জানার জন্য বেশি আগ্রহী। তাই তাদের সমাবেশে পৃথকভাবে সময় দিতে হয়েছে।

৮. আমার সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একান্ত সাক্ষাৎকার

ক. ইউসুফ ইসলাম। সাবেক প্রখ্যাত পপ গায়ক ক্যাট্‌স্ স্টিভেন্স ইসলাম গ্রহণের পর ইউসুফ ইসলাম নামে বিশ্বে পরিচিত। তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদের মেহমানখানায় আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তার সাথে আগেও পরিচয় ছিল। একবার সম্ভবত ১৯৮৪ সালে তিনি ঢাকা এসেছেন এবং আমার বাড়িতেও এসেছিলেন।

ইসলামের একটা বিধান সম্পর্কে তিনি আলোচনা করলেন। কোনো মুসলিম সংগঠনে আমীরের মতামতের মর্যাদা কী? সংগঠনের মজলিসে শূরার অধিকাংশের রায় মেনে নেওয়া কি আমীরের উপর বাধ্যতামূলক? তিনি বললেন, 'আমার মতে, মজলিসে শূরা মতামত প্রকাশ করবে; কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইখতিয়ার আমীরের থাকা উচিত।'

আমি বললাম, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমীর মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য। তিনি তাবলীগ জামায়াতের কথা উল্লেখ করে বললেন, তাদের আমীরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। আমি বললাম, রাসূল (স) ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও যে বিষয়ে ওহীর বিধান নেই, সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তাআলাও রাসূল (স)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি উদাহরণ তাঁর মতের পক্ষে পেশ করলেন। আবূ বকর (রা) খলীফা হওয়ার পর একদল লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করলে হযরত ওমর (রা)-সহ সাহাবীগণের পরামর্শ গ্রহণ না করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। আমি বললাম, হযরত ওমরের পরামর্শের পর হযরত আবূ বকর যখন তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করলেন, তখন হযরত ওমর আর আপত্তি করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমরের মতের বিরুদ্ধে তিনি সিদ্ধান্ত নেননি।

পরে আমি জানতে পারলাম, তিনি মুসলিম এইড নামক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে অন্য একজনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করায় তিনি তাদের সিদ্ধান্ত মানতে সম্মত হননি। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে যান।

খ. তিউনিশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা রাশেদ গনৌশী সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি দেশ থেকে চলে এসে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন এবং বিদেশে অবস্থান করেই দেশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে ইতঃপূর্বে দু কিস্তিতে লিখেছি। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান লাহোরে মাওলানা মওদূদী (র)-এর জন্মের শতবর্ষ উপলক্ষে যে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে, সেখানে তিনিও আমার মতো অতিথিবক্তা ছিলেন। ২০০৫ সালে লন্ডনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী আন্দোলনের কয়েকজন নেতার ডকুমেন্টারি সাক্ষাৎকারের ভিডিওচিত্র গ্রহণ করে। সেখানে প্রথমে আমার এবং পরে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ঐ দু প্রসঙ্গে তাঁর কথা দু কিস্তিতে আলোচনা করেছি।

তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের সময় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জেনে নিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে তিউনিশিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেলাম।

গ. ড. কামাল হালবাভী। তিনি মিসরি নাগরিক। ১৯৯৫ সালে আমার সাথে যখন সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি লন্ডনে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সংগঠনের দায়িত্বশীল ছিলেন। বর্তমানে তিনি সমগ্র ইউরোপে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেন। আমিও মিসরের অবস্থা জেনে নিলাম।

যারা যে দেশেই ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনের সাথে জড়িত, তাদের মূল চিন্তাধারায়– আকীদা-বিশ্বাস, কর্মনীতি, কর্মসূচি ও বিদেশনীতির মধ্যে চমৎকার মিল দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, তারা সবাই রাসূল (স), খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ মনে করেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার যত দেশেই গিয়েছি, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় সর্বত্রই এ মিল পেয়েছি। কিন্তু যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে মনে করে না, মানবরচিত বিধানের অধীনেই ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পালন করাকে দীনদারীর জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং দীনকে বিজয়ী বা কায়েম করা দীনী কর্তব্য বা ফরয হিসেবে গণ্য করে না তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যে কত রকম আজব ধারণা আছে তা শুনে শেষ করা যাবে না।

আমি যত বারই ইংল্যান্ডে গিয়েছি, কোনো না কোনো উপলক্ষে ড. কামাল হালবাভীর সাথে দেখা হয়েই যায়। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এতটা ঘনিষ্ঠ যে, দেখা হলেই 'ইয়া মারহাবা আখ গোলাম' বলে জড়িয়ে ধরেন। আরবরা নামের প্রথম অংশকেই নাম মনে করে এবং নামের দ্বিতীয় অংশ পিতার নাম হিসেবে গণ্য করে। আমাদের দেশে নামের শেষ অংশকেই ব্যক্তির নাম মনে করা হয়। সে হিসেবেই লোকেরা আমাকে আযম সাহেব বা আযম ভাই ডাকে। আরবদের হিসেবে আমি 'আখ গোলাম' মানে ভাই গোলাম।

৯. রিজেন্ট পার্ক মসজিদে রিসিপশন। লন্ডন শহরে রিজেন্ট পার্কের মসজিদকেই সবচেয়ে বড় মসজিদ বলা হয়। মসজিদের সাথে সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সম্পর্ক রয়েছে। এ মসজিদটি তাদের উদ্যোগ ও অনুদানেই নির্মিত এবং তারাই এর পরিচালক। এ মসজিদের পক্ষ থেকেও আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারিনি। একটি মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তারা আমাকে সম্মান জানানো প্রয়োজন বোধ করেছেন।

১০. আমার সাথে বিভিন্ন গ্রুপের সাক্ষাৎ

ক. ইমামগণের সাথে সাক্ষাৎ। লন্ডনে ছোট-বড় অনেক মসজিদ আছে। সব মসজিদ আকারে মসজিদের মতো না দেখালেও মুসলমানগণ জামাআতে নামায আদায়ের, বিশেষ করে জুমুআর নামাযের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে কোনো একটি বাড়ি খরিদ

করে সেখানে নিয়মিত জামাআতে নামাযের ব্যবস্থা করেন। সকল মসজিদেই একজন আলেমকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশিদের উদ্যোগে যেসব মসজিদ গড়ে ওঠে, তাতে ইমাম হিসেবে বাংলাদেশ থেকেই আলেমকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এমন ২০/২৫ জন বাংলাদেশি ইমাম আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।

তাদের নিকট থেকে জানা গেল, এ দেশে মসজিদই মুসলমানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মসজিদ শুধু নামাযের জন্যই নয়; মুসলিম শিশুদের কুরআন ও নামায শিক্ষার কেন্দ্রই হলো মসজিদ। এমনকি সপ্তাহে যে দু দিন ছুটি থাকে সে সময়ে ছেলে-মেয়েরা সরকারি স্কুলে না গিয়ে মসজিদেই পড়ে।

এ দেশে ইংরেজিতে মোটামুটি কথাবার্তা বলতে না পারলে চলে না। জানা গেল, ইমামদের মধ্যে বেশির ভাগই এ দেশে এসে ইংরেজি শিখতে বাধ্য হয়েছেন। যারা আলিয়া মাদরাসায় পড়ে এসেছেন তাদের ইংরেজি বলার অভ্যাস দেশে না হলেও এখানে এসে বেশি বেগ পেতে হয়নি। যারা কওমী মাদরাসায় পড়েছেন তাদের যথেষ্ট মেহনত ও সাধনা করে শিখতে হয়েছে।

আমি তাদেরকে মুবারকবাদ জানালাম যে, তারা এ অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসললিমদের সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিরাট অবদান রাখছেন।

খ. ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও একাউন্টেন্টদের সাথে সাক্ষাৎ। তারা ১৩/১৪ জন এলেন, যাদের মধ্যে ডাক্তারের সংখ্যাই বেশি। তারা বাংলাদেশ থেকে পাস করে এ দেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে এসে এখানেই থেকে গেছেন। তারা ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সাথে কোনো না কোনো পর্যায়ে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাই তারা আমার সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করেছেন।

আমি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসায় শুকরিয়া জানালাম। আমি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলাম যে, ছাত্রজীবনে ইসলামের যেটুকু চর্চা করেছেন তা যাতে হারিয়ে না যায়, সে কারণেই এখানে সংগঠনভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে অমুসলিম পরিবেশে ঈমান ও আমলে মুসলিম হিসেবে টিকে থাকতে হলে এটা অপরিহার্য। তারা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, এ বিষয়ে তারা এগিয়ে যাবেন।

গ. লন্ডনে বাংলাদেশি গণ্যমান্য লোকদের ৮/১০ জন দেখা করতে এলেন। তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি; বহু বছর ধরে এ দেশে আছেন। এ দেশে তারা প্রতিষ্ঠিত। তাদের কয়েক জনের নিজস্ব বাড়ি আছে। কয়েক জন ব্যবসায়ী। বাংলাদেশিদের সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে তারাই নেতৃত্ব দেন।

জানা গেল, তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কোনোটার সাথে সরাসরি জড়িত নন। তারা মনে করেন যে, এ দেশে তো বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশিদের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। এ দেশের রাজনীতিতেও তারা কোনো অবদান রাখার সুযোগ পাবেন না। বাংলাদেশের যারা এ দেশে বসবাস করছেন, তারা একটি কমিউনিটি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হলে নিজেদের অনেক কল্যাণ করা সম্ভব হতে পারে। দেশের রাজনীতি এখানে চর্চা করা দ্বারা বাংলাদেশিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া কোনো লাভ হতে পারে না।

আমি তাদের অভিমতের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করলাম। তবে দেশের দলীয় রাজনীতি থেকে একশ্রেণীর লোকদেরকে বিরত রাখা সম্ভব হবে না বলে আমি প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করলাম।

আমার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগপন্থিরা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি রোধের হীন উদ্দেশ্যে যেমন আমার উপর হামলার অপচেষ্টা চালিয়েছে, লন্ডনেও তারা তেমন কিছু করতে পারে বলে আশঙ্কা করে আমার নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। YMO-এর ছেলেরা এবং ইসলামিক ফোরামের যুবকেরা একটা নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তুলে আমার অবস্থানের জায়গায় এক গ্রুপ ২৪ ঘণ্টা ডিউটি দিত। আমার কোথাও যাবার সময় এক গ্রুপ আমার সাথে থাকত। গাড়িতে আমাকে মাঝের আসনে বসতে হতো এবং দু পাশে দু জন বসত। আমার গাড়ির সামনে ও পেছনে তাদের গাড়ি সাথে সাথে চলত। কোথাও কোনো প্রোগ্রামে গেলে তারা সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করত। আল্লাহর রহমতে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, যেখানে বিরোধীদেরকে দমনের প্রয়োজন হয়েছে। হয়তো তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই তারা কোনো কিছু করার অপচেষ্টার সাহসই পায়নি।

আমার খাওয়ার ব্যবস্থা

যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আমার সময় ব্যয় করতে না হয় এবং কোথাও খাওয়ার জন্য কষ্ট করে যেতে না হয়, সে উদ্দেশ্যে আমার অবস্থানস্থলেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থার পেছনে নিরাপত্তার দিকটাও হয়তো বিবেচনায় রাখা হয়ে থাকবে।

আমার অবস্থানস্থলে রান্নার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। কোনো হোটেল থেকেও খাদ্য আনা হয়নি। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত পরিবার থেকে সকল খাদ্য সরবরাহ করা হতো। এ ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা ও জযবায় আমি অভিভূত ছিলাম। দীনের ভিত্তিতে মহব্বত যে কত গভীর হয় তা বাস্তবে উপলব্ধি করলাম।

আমরা তো মেহমান মাত্র দু জন ছিলাম। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য এত বেশি পরিমাণে সরবরাহ করা হতো যে, নিরাপত্তাকর্মীরা ছাড়াও সংগঠনের কিছু মেহমানের জন্যও যথেষ্ট হতো। প্রতি বেলায়ই ভিন্ন স্বাদের খাদ্য গ্রহণে বিরল তৃপিবোধ করেছি।

আমেরিকা সফর

ব্রিটেনে ২৬ দিন থাকার পর ২৯ আগস্ট ১৯৯৫, আমি ও আবু নাসের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্কে পৌঁছলাম। জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে 'মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা'র সভাপতি ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম, সেক্রেটারি মাওলানা আসাদুজ্জামান খান ও সংগঠনের ১৫/২০ জন নেতাকর্মী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের গাড়িবহর আমাদেরকে শহরে নিয়ে গেল। কোনো হোটেলের পরিবর্তে সংগঠনের এক ভাইয়ের বাসায় আমরা মেহমান হলাম।

এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার দ্বিতীয় সফর। ১৯৭৩ সালের ৩১ আগস্ট সর্বপ্রথম ঐ দেশে যাবার সুযোগ পেলাম। তখন আমি লন্ডনে নির্বাসন জীবনযাপন করছি। 'মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' (MSA) তখন আমেরিকায় বসবাসকারী বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ছিল। ১৯৭৩ সালে এ সংগঠনের ১১তম বার্ষিক সম্মেলন মিলিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে আমাকে বিদেশি অতিথিবক্তা হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়। ঐ সফরের বিস্তারিত বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম'-এর ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৮ সালে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পর নাগরিক সমস্যার কারণে আমার জন্মভূমিতেই দীর্ঘ ১৬ বছর অন্তরীণ অবস্থায় থাকায় বিদেশে সফর করা সম্ভব হয়নি। তা না হলে আরো অনেক আগেই হয়তো আমেরিকায় যেতে হতো। ১৯৭৩-এর ২২ বছর পর ১৯৯৫-এর আগস্টে দ্বিতীয় সফরে গেলাম।

১৯৭৩ সালের সফরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মাত্র একজন লোকের সাথে সম্মেলনেই দেখা হলো। তিনি কুষ্টিয়ায় প্রবীণ রুকন জনাব আফসারুদ্দীন আহমদ। ছেলের বাসায় তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই গিয়েছিলেন। তখন আমাদের কোনো সংগঠন আমেরিকায় ছিল না। পরবর্তীকালে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত যারা আমেরিকায় গিয়েছেন, তারাই 'মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা' নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনই আমার এ সফরের ব্যবস্থা করে।

নিউইয়র্কে সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা প্রতি বছরই গ্রীষ্মের ছুটির সময় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে জামায়াতের কোনো নেতাকে তাতে শরীক করানো হয়। ১৯৯৫ সালে আমাকে তারা মেহমান হিসেবে পেয়ে খুব উৎসাহ বোধ করলেন। তখন কানাডাও এ সংগঠনভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে কানাডায় ভিন্ন নামে পৃথক সংগঠন কায়েম হয়।

এ বার্ষিক সম্মেলন মসজিদে নূরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর বার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও মজলিসে শূরার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা ও

কানাডায় সদস্যগণ এ নির্বাচনে ভোটদান করেন। যারা সদস্য নন তারা নির্বাচনে ভোট দেওয়া ছাড়া সম্মেলনের সকল কর্মসূচিতেই অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের মহিলাগণ মসজিদের ঐ এলাকায় অবস্থান করেন, যেখানে পর্দার সাথে নামাযে মহিলাদের শরীক হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

সম্মেলনে সংগঠনের বাইতুল মালসহ সামগ্রিক বার্ষিক রিপোর্ট পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। পর্যালোচনায় আমিও অংশগ্রহণ করি।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে আমি সম্মেলনের ডেলিগেটদেরকে সংগঠনভুক্ত হওয়ায় মুবারকবাদ জানালাম। এ কাজ সকল ফরযের বড় ফরয হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে তৎপর হওয়ার পরামর্শ দিলাম। এ পথে সাফল্যের জন্য যেসব গুণাবলি অর্জন করা জরুরি সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন করার তাকিদ দেই। ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে স্বচ্ছ চিন্তাধারা গড়ে তোলার জন্য যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক, সেসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তাফহীমুল কুরআন নিয়মিত অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বক্তব্যের পর নামায ও দুপুরের খাওয়ার বিরতির পর ডেলিগেটদের লিখিত প্রশ্নাবলির জবাব দিলাম। আবু নাসের সাহেবও অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। সকাল ৯টায় শুরু হয়ে ইশার নামাযের পূর্বে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

মাল্টি ন্যাশনাল রিসিপশন

যেসব মুসলিম দেশের লোক আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বসবাস করেন, তারা ইসলামিক ও সামাজিক তৎপরতার প্রয়োজনেই কোনো না কোনো কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং ক্রমে তা প্রাতিষ্ঠানিক আকার ধারণ করে। এ জাতীয় কয়েকটি আরব ও অনারব প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কোনো মুসলিম দেশের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিউইয়র্কে উপস্থিত হলে তারা এ জাতীয় অনুষ্ঠান করে থাকেন।

একটি স্কুলের বিরাট হলে এ উপলক্ষে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড. আবুল কাসেমও এ পর্যায়ের অন্যতম বক্তা ছিলেন।

সম্মেলনে আমাকে প্রধান বক্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতিথিবক্তা হিসেবে যারা সেখানে ভাষণ দান করেন তারা হলেন– সাদা আমেরিকান নওমুসলিম বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত হামযা ইউসুফ, কালো আমেরিকান নওমুসলিম ইমাম আবদুল লতীফ। আমেরিকান মুসলিমদের আট জন ইমাম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইসনা ও ইকনার প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন।

ISNA (ইসলামি সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সকল মুসলমান সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ফেডারেশন বা আমব্রেলা অর্গানাইজেশন। পূর্বে

MSA (মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন) এ মর্যাদায় ছিল এবং অছাত্ররাও এ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইসনা নামে ফেডারেল মর্যাদার সংগঠন কায়েমের পর MSA শুধু ছাত্রদের সংগঠন হিসেবে ইসনা'র সদস্য।

ICNA (ইসলামি সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা) জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রবাসীদের সংগঠন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসকারী পাকিস্তানিরা এ সংগঠনটি গড়ে তোলেন। নিউইয়র্ক শহরে তাদের একটি মযবুত কেন্দ্র রয়েছে। ইকনা সারা বছরই তৎপরতা চালায় এবং তাদের অনেক শাখা দু দেশেই সক্রিয়। ইসনা'র তৎপরতা বছরে মাত্র একবার বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠান করা।

৩১০.

আমেরিকায় আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তিপনা আমদানি করেছে। বিরোধীদের সাথে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আচরণ না করে পেশিশক্তি প্রয়োগ করাই তাদের ঐতিহ্য। তাদের রাজনীতিতে যারা অভ্যস্ত, তারা বিদেশে গেলেও তাদের খাসলাত বদলায় না। ব্রিটেনের মতো ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক দেশেও তাদের স্বভাব সংশোধন হয় না। আমার লন্ডন সফরে এ কথা প্রমাণিত হওয়ায় আমেরিকা সফরের ব্যাপারেও নিরাপত্তার দিকটা বিবেচনা করতে হয়েছে।

আমার বিরুদ্ধে আওয়ামী মহলের ব্যাপক অপপ্রচারের কারণে যেসব দেশে বাংলাদেশিরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করে, সেখানে ঐ জাতীয় লোক থাকাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভের পূর্বে আমেরিকায় বাংলাদেশিরা খুব কমই গিয়েছে। আরব দেশগুলোতেও স্বাধীন বাংলাদেশ থেকেই কাজের সন্ধানে গিয়েছে; কিন্তু ব্রিটেনে বহু আগে থেকেই সিলেটের মুসলমানগণ বসবাস শুরু করায় আমেরিকার তুলনায় ইংল্যান্ডে বাংলাদেশিদের অবস্থান অনেক বেশি মযবুত।

তাই নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের সমাবেশের ব্যবস্থা করা লন্ডনের মতো এত সহজ ছিল না। বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা লন্ডনে করা হয়েছিল, তেমন ব্যবস্থা এখানে সম্ভব হয়নি। আফ্রো-আমেরিকান মুসলমানদের একটি গ্রুপ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। অতীতকালে আফ্রিকা থেকে যাদেরকে দাস হিসেবে পশুর মতো ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জোর করে আমেরিকায় আনা হয়েছিল, তাদের বংশধরদের বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের পূর্বপুরুষের অনেকেই মুসলিম ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তারা আমেরিকায় 'কালো মুসলিম' হিসেবেই পরিচিত।

আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের নেওয়ার একটা পটভূমি রয়েছে। কয়েক বছর আগে সুদানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ড. হাসান তোরাবী আমেরিকায় যান।

তাঁর রাজনৈতিক বিরোধী কতক সুদানি তাঁর উপর হামলা করে। তখন ঐ 'কালো' মুসলিমরাই তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। ঐ ঘটনার পর থেকে যখনই কোনো দেশের ইসলামী কোনো ব্যক্তিত্ব আমেরিকায় যান, তাঁর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পালন করেন। আমাদের লোকেরা তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা দীনী দায়িত্ব হিসেবেই এগিয়ে আসেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এক মসজিদে আমার প্রোগ্রামে কিছু বাংলাদেশি বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। কয়েক জন কালো মুসলিম আমার নিরাপত্তার জন্য পিস্তল নিয়ে আমার সাথে গেলেন। তাদের বিশাল দেহ, সাহস ও শক্তিকে সাদা চামড়ার আমেরিকানরাও ভয় পায়। তারা আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমাদের দায়িত্বশীলরাও তাদের আন্তরিকতা দেখে নিশ্চিত হন।

ম্যানহাটনে সমাবেশ

নিউইয়র্ক মহানগরীর ম্যানহাটন হলো ঐ বিখ্যাত এলাকার নাম, যা বিশ্বের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে যে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয় সেটা ঐ এলাকায়ই অবস্থিত। ঢাকা মহানগরীতে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার যে মর্যাদা, নিউইয়র্কে ম্যানহাটনের মর্যাদা তেমনি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ঐ টুইন টাওয়ারেই অবস্থিত ছিল।

সেখানকার একটি স্কুলে বাংলাদেশিদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনে কুইন মেরি কলেজে বাংলাদেশিদের যে রকম সমাবেশের আয়োজনের বিবরণ পূর্বে দিয়েছি, নিউইয়র্কেও সে ধরনের সমাবেশেরই আয়োজন করা হয়। 'মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা'-এর উদ্যোগেই ঐ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশস্থলের নিকটে কতক বাংলাদেশি দুর্বৃত্ত পুলিশ বেষ্টনীর ভেতরে থেকে কিছু স্লোগান দিচ্ছিল। আমার সাথে নিরাপত্তা পালনকারীরা মন্তব্য করলেন, 'ওরা কাফির'। যাহোক, সমাবেশে এর কোনো সামান্য প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি।

মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা'র প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধীসমাবেশে আবু নাসের সাহেব আমার পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে উপস্থিত বাংলাদেশিদের সন্তোষজনক সংখ্যা দেখে আমার ধারণা হলো যে, আমাদের বিরোধীদের অপপ্রচারের কারণে নিরপেক্ষ লোকদের মধ্যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়ে থাকবে। তাই আমাদের নতুন সংগঠনের ডাকে এত গণ্যমান্য লোক সমাবেশে আসার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

আমার বক্তব্য

প্রথমে আমি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পটভূমি তুলে ধরি। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে, যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে তারা চলে যাবে।

তখন স্বাধীন ভারতবর্ষে কী ধরনের সরকার কায়েম হবে এ বিষয়ে 'অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস' ও 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দাবি করে যে, ভারতবর্ষের সকল ধর্মের লোক এক ভারতীয় জাতি এবং স্বাধীন ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার দেশ শাসন করবে। তখন ৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ১০ কোটি ছিল মুসলমান।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রস্তাবক্রমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, ১০ কোটি মুসলমান আলাদা এক জাতি। তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী নয়। তাই যে কয়টি প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি সেসবকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। তা না হলে ব্রিটিশরা চলে গেলেও মুসলিম জাতি স্বাধীন হবে না। তারা ৩০ কোটি অমুসলিমের অধীনই থেকে যাবে।

কংগ্রেস অখণ্ড ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায়, যাতে তারা সংখ্যার জোরে ক্ষমতা দখল করে মুসলমানদেরকে তাদের প্রজা বানাতে পারে। আর মুসলিম লীগ ভারত বিভক্ত করে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়, যেখানে শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে। এই ইস্যুতে ১৯৪৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। বাংলার মুসলমানরা শতকরা ৯৭টি ভোটই পাকিস্তানের পক্ষে দেয়।

ঐ নির্বাচনের ফলাফল ইংরেজ ও কংগ্রেসকে ভারত বিভাগের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করে। ১৯৪৭ সালে ভারত যদি বিভক্ত না হতো তাহলে বর্তমান বাংলাদেশ কখনো একটি স্বাধীন দেশ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করত না। তাই বাংলাদেশ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মেনে নিতে পারে না। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই আমরা ভারত থেকে পৃথক হয়েছি। যদি আমরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মেনে নিই তাহলে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতের অধীন হওয়াই উচিত। ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উৎখাত করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

আমার এ বক্তব্যের যুক্তি সমবেত সকলের সমর্থন লাভ করার পর আমি বললাম, স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণই নির্বাচনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে যে, দেশ কারা শাসন করবে এবং কিভাবে দেশকে গড়ে তুলবে। নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকলে ক্রমান্বয়ে দেশ স্থিতিশীল হবে।

আমার বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় শ্রোতাদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দিলাম। সভাশেষে তারা যে উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে আমার সাথে হাত মিলালেন, তাতে আমি অনুভব করলাম যে, তারা সন্তুষ্ট।

ইকনা'র সেন্টারে রিসিপশন

ICNA (ইসলামি সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা) নিউইয়র্কে অবস্থিত তাদের সেন্টারে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা করল। এ সংগঠনের পরিচয় আগেই দিয়েছি। তাদের এ আয়োজনে আবেগও জড়িত ছিল। তারা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত। একসময় আমি এ জামায়াতেরই অন্যতম দায়িত্বশীল ছিলাম। তাই তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে আমাকে তাদের সেন্টারে স্বাগত জানালেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ায় আমাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানালেন।

তাদের অভ্যর্থনার পর আমার বক্তব্যে তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বেচ্ছায় পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়নি। মি. ভুট্টো অবিভক্ত পাকিস্তান পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাননি। তিনি বিভক্ত পাকিস্তানের একনায়ক হওয়ার হীন উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করেছেন।

এরপর বললাম, এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। যে মহান উদ্দেশ্যে পাকিস্তান কায়েম করা হয়েছিল, যদি সে উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ও অবশিষ্ট পাকিস্তানে সফল হয় তাহলে ভারত বিভক্ত করা সার্থক হবে।

আরো বললাম, দুনিয়ার কোনো ভূখণ্ডের নাম পাকিস্তান ছিল না। এটা একান্তই একটি আদর্শিক নাম। যদি সে আদর্শ সেখানে কায়েম না হয় তাহলে অবশিষ্ট পাকিস্তানও এক রাষ্ট্র হিসেবে টিকবে কি না বলা যায় না। ১৯৫৬ সালে সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নাম বাদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান নাম দেওয়া হয়েছিল। ঐ নাম স্থায়ী হয়নি। পুরনো নামগুলো আবার বহাল হয়ে গেছে। যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল তা যদি কায়েম না হয় তাহলে এ নামটি টিকে থাকবে কি না কে জানে? ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও পশ্চিম আদর্শিক কারণে এক রাষ্ট্র হয়েছিল। ঐ আদর্শের সাথে বেঈমানি করার ফলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঐ একই কারণে অবশিষ্ট পাকিস্তানের ঐক্যও বিনষ্ট হতে পারে।

IIIT-তে সম্বর্ধনা

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (IIIT) নামে নিউইয়র্কে একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সকল দেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে যোগাযোগ রাখে। বাংলাদেশেও এর শাখা রয়েছে। সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান এর চেয়ারম্যান। বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের রচিত ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ করে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা এ সংস্থার অন্যতম কর্মসূচি।

১৯৯৫ সালে আমি যখন আমেরিকায় গিয়েছি তখন বাংলাদেশে এর শাখা স্থাপিত হয়নি। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের বেশ কয়েক জনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। বিশেষ করে ড. আহমদ তুতুনজি ও ড. হিশাম আত-তালিবের সাথে দীর্ঘ

দিনের পরিচয়। ঘটনাক্রমে ঐ সময় এরা দু'জনই নিউইয়র্কে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে IIIT অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন। জন্মগতভাবে তাঁরা দু'জনই ইরাকি। ড. তুতুনজি বর্তমানে সৌদি নাগরিক এবং রিয়াদে থাকেন।

ড. হিশাম আত-তালিবের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সভা শুরু হয়। ড. আহমদ তুতুনজি সম্বর্ধনা বক্তব্য রাখলেন। তিনি বাংলাদেশের সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ। বহু বার ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মেলনে ঢাকা এসেছেন। তিনি আমার সম্পর্কে বেশি জানেন বলে তাঁকেই বক্তব্য পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্যের শেষদিকে তিনি আমার বক্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন যে, ওখানকার শ্রোতারা ১৯৭১-এর বিপর্যয়ের পর বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন কখন কিভাবে পুনর্বহাল করা সম্ভব হলো তা জানতে আগ্রহী। আমার নাগরিকত্ব সমস্যা সম্পর্কেও নাকি তারা জানতে চান।

আমার বক্তব্যের শুরুতে তাদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য শুকরিয়া জানিয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় সব কথা জানালাম। এখানে সেসব উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি না।

উক্ত সম্বর্ধনা সভায় IIIT-এর সাথে সম্পর্কিত ও আমেরিকায় বসবাসরত বিভিন্ন মুসলিম দেশের লোক ছিলেন।

ইসনা'র মহাসম্মেলন

ইতঃপূর্বে ISNA (ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা) সম্পর্কে লিখেছি, আমেরিকা ও কানাডায় বিশ্বের যত মুসলমান বসবাস করেন, এটা তাদের সকলের যৌথ সংস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে একসাথে 'নর্থ আমেরিকা' বলা হয়। এ দুটো রাষ্ট্রে মুসলমানদের যত সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আছে, তারা সবাই ISNA-এর সদস্য। ISNA হলো এক বিশাল ফেডারেশন।

ISNA-এর দায়িত্ব হলো, প্রতি বছর এমন এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা, যেখানে উত্তর আমেরিকার সকল মুসলমান একটানা তিন দিন অবস্থান করে তাদের ইসলামী পরিচয় তুলে ধরতে পারে।

১৯৯৫ সালে তাদের এ মহাসম্মেলন বাল্টিমোর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে একজন অতিথিবক্তা হিসেবে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে এ সম্মেলন শিকাগোতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও আমি অতিথিবক্তা ছিলাম। ২০০১ সালে আমার সর্বশেষ আমেরিকা সফরেও বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলাম।

'কনভেনশন হল' নামে বিশাল এলাকাজুড়ে এ মহাসম্মেলনের আয়োজন। সম্মেলনস্থল সংলগ্ন এক বিরাট হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। কর্মসূচি সম্বলিত পুস্তিকায় দেখলাম, প্রতিদিন মেইন হলে সকাল ও সন্ধ্যায় দুটো করে অধিবেশন। প্রতি অধিবেশনে একজন করে প্রধান বক্তা। একদিন সন্ধ্যার অধিবেশনে আমার নাম দেখলাম। অন্য প্রধান বক্তাদের নামের তালিকায় আমার পূর্বপরিচিত দুজনের নামও পেলাম।

প্রধান হল ছাড়া আরো অনেক লেকচার হল রয়েছে, যেখানে বিকালে বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশের মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে সেখানে আমাকে অন্যতম বক্তা হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসব অনুষ্ঠানের চেয়েও বড় আকর্ষণ হলো– অগণিত স্টল, যেখানে মুসলিম ঐতিহ্যের ধারক পোশাক, দেয়াল সাজানোর হাজারো সামগ্রী, ড্রইং রুমে সজ্জা হিসেবে ব্যবহারের পণ্য, মহিলাদের ব্যবহারযোগ্য জিনিস, ইংরেজি ভাষায় ইসলামী বই ও ম্যাগাজিন, অডিও ও ভিডিও-তে বিখ্যাত বক্তাদের বক্তৃতা এবং বিভিন্ন ভাষার ইসলামী গান ইত্যাদি।

আমার মনে হলো, সম্মেলনের চেয়ে এর বড় পরিচয় হলো মহামিলনমেলা। ২৫/৩০ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু তিন দিন পর্যন্ত এখানে উৎসবে মেতে রইল। অথচ এমন কোনো কর্মকাণ্ড দেখা গেল না, যা ইসলামের দৃষ্টিতে সামান্য আপত্তিকর মনে হতে পারে। এটা সত্যিই বিরাট ব্যাপার।

মুসলিম পরিচিতি সংরক্ষণে সম্মেলনের অবদান

২৫/৩০ হাজার মানুষ যেখানে উপস্থিত সেখানে মেইন হল ও লেকচার রুমগুলোতে উপচেপড়া ভিড় হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল, সেখানে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। শিশুদেরকে সেখানে দেখাই যায়নি। অথচ স্টলগুলোতে সবসময় প্রচণ্ড ভিড় ছিল।

হাজার হাজার পরিবার দূর-দূরান্ত থেকে সপরিবারে যাতায়াত খরচ দিয়ে এসে সম্মেলনস্থলের শহরে হোটেল ভাড়া দিয়ে থেকে বাস্তবে কী পেল? কিসের টানে তারা সম্মেলনে এত উৎসাহ নিয়ে আসে?

দুনিয়ার বহু দেশ থেকে বহু ভাষাভাষী মানুষ যারা আমেরিকা ও কানাডায় বসবাস করে তাদের মধ্যে যারা নিজের মুসলিম পরিচিতি বহাল রাখতে চায় এবং আমেরিকার কালচার ও ভোগবাদী জীবনধারায় যারা তাদের সন্তানদেরকে হারিয়ে যেতে দিতে চায় না, তারাই এত অর্থ ও সময় ব্যয় করে এ মিলনমেলায় উপস্থিত হয়।

হাজার হাজার মহিলার মধ্যে সবাই হিজাব না পরলেও একজনকেও অশালীন পোশাকে দেখা যায়নি। সপরিবারে আগত কয়েক জন বললেন, আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েরা স্কুলে ও বাইরে যে পরিবেশে থাকে তাতে স্থানীয় লোকদের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের পোশাক, তাদের কালচার ও চাল-চলনে আকৃষ্ট হয়ে যায়। এ সম্মেলনে এসে তারা এক ভিন্ন জগৎ দেখতে পায়। মুসলিম পোশাক পরিহিতা হাজার হাজার সমবয়সী মেয়েদেরকে সম্মেলনে দেখে তাদের হীনম্মন্যতা দূর হয়ে যায় এবং নিজস্ব কালচারে গৌরব বোধ করতে শেখে। যাদেরকে অনেক চেষ্টা করেও বোরকা পরতে সম্মত করা যায়নি তারা পর্যন্ত এখানে এসে বোরকা কেনার আবদার জানায় এবং স্টল থেকেই কিনে নেয়।

ইসনা'র এ সম্মেলন মুসলমানদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। আমেরিকার পরিবেশেও যারা সন্তানদের মধ্যে ইসলামী জযবা ও মুসলিম চেতনা জাগ্রত দেখতে চায়

তাদের জন্য এ সম্মেলন বিরাট সহায়ক। যাদের রুচি এতটা বিকৃত হয়ে গেছে যে, তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তারা এ সম্মেলনে হয়তো আসেই না।

ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব তাদেরই

সম্মেলনে যোগদান করতে হলে ডেলিগেট ফি দিয়ে কার্ড কিনতে হয় এবং প্রবেশপথে কার্ড দেখিয়ে ঢুকতে হয়। তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার কোনো দায়িত্ব ইসনা কর্তৃপক্ষের পালন করতে হয় না। সম্মেলনস্থলে খাওয়ার বিরাট কয়েকটি স্টল আছে। বিভিন্ন প্রকার খাবার স্টলে মওজুদ থাকে। পছন্দমতো খাবার কিনে নিয়ে সপরিবারে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খেতে পারে। এতে হোটেলের খাবারের তুলনায় বেশ সস্তায় খাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে স্টলে বসেও খেতে পারে।

বিশ্ব মুসলিম মিলনমেলা

হলগুলোর বাইরে ঘুরে ঘুরে দেখে মনে হলো যে, সম্মেলনে আগত সবাই যেন উৎসবে মেতে আছে। যেন ঈদের আনন্দ উপভোগ করছে। মেলার এ আনন্দে একটা পবিত্র ভাব বিরাজ করছে। কোনো রকম অনৈতিক কিছুই দেখা গেল না। ২৫/৩০ হাজার মুসলমান যেন তিন দিন একটি ইসলামী সমাজে বসবাস করতে এসেছে।

পৃথিবীর বহু দেশের মানুষের এ মেলায় সবাই ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। পরস্পর পরিচিত হচ্ছে। সব রঙের মানুষই এখানে ইসলামের রঙে রঞ্জিত। যার সাথেই দেখা হয় সালাম বিনিময় হচ্ছে।

স্টলগুলোতে কেনাকাটা চলছে প্রচুর। নিত্য প্রয়োজনীয় সুন্দর সুন্দর জিনিস সংগ্রহ করছে। বিশেষ করে মহিলাদের ভিড়ই স্টলে বেশি।

বক্তৃতামঞ্চের কথা

প্রধান হলে তিন দিনে ৬টি অধিবেশন হয়েছে। আমি মাত্র দুটো অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছি। একটিতে শ্রোতা হিসেবে এবং অপরটিতে বক্তা হিসেবে। মনে হলো, এসব অধিবেশন সম্মেলন উপলক্ষে আগত ২৫/৩০ হাজার লোকের প্রধান আকর্ষণ নয়। শুষ্ক বক্তৃতা যাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে তারাই শুধু হলে সমবেত হয়। মঞ্চে অতিথিবক্তারা আছেন। শ্রোতাদের অধিকাংশ আসনই খালি। মঞ্চের সামনে ও ডানে পুরুষ এবং বাঁয়ে মহিলাদের আসন। সব মিলে হাজার কয়েকের বেশি মনে হলো না।

৬টি অধিবেশনের বক্তার সংখ্যা কমপক্ষে ১২ জন। মাত্র কয়েক জনের নাম মনে আছে। কারো নামই লিখছি না। হলের কয়েক জায়গায়, এমনকি মঞ্চের নিকটেও বিরাট পর্দায় বক্তাকে বিশাল আকারে বক্তৃতারত অবস্থায় দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। যারা মঞ্চের একটু দূরে তারা পর্দায় বক্তাকে কাছে থেকে দেখতে পায় এবং বক্তব্য শুনতে তৃপ্তিবোধ করে।

বোঝা গেল, যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তারাই ঐসব বক্তৃতা শুনতে আগ্রহী। যারা ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন না হলেও ধর্ম হিসেবে ইসলামকে মেনে চলার চেষ্টা করে এবং মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করে তারা সম্মেলনের

বক্তৃতামালার প্রতি আগ্রহী নয় বটে; কিন্তু এ মহামিলনমেলার গুরুত্ব অনুভব করে। এখানে মঞ্চের অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।

আমার দুটো বক্তৃতা

প্রধান হলে আমার আলোচ্য বিষয় ছিল 'পাশ্চাত্যে মুসলিমদের করণীয়'। আমি মাত্র ২৫ মিনিট বক্তব্য রাখলাম। দুটো করণীয় সম্পর্কেই আমি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছি–

১. মুসলিম হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে সংগঠিত হয়ে ইসলামের চর্চা করতে হবে। এটা করা হলে ইসলামবিরোধী পরিবেশে বসবাস করেও ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে মুসলিম পরিচিতি বহাল রাখা সম্ভব হবে। তা না হলে ইসলামী জীবনধারা ও মুসলিম কালচার বহাল থাকবে না।

২. এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যে, পাশ্চাত্যের যেসব অমুসলিমের সাথে আমরা সহকর্মী, সহপাঠী বা প্রতিবেশী হিসেবে মেলামেশা করি তাদের সাথে আচরণে, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে উন্নত নৈতিক গুণাবলির পরিচয় দিতে হবে, যাতে তারা আমাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাদের মধ্যে যেসব নৈতিক ত্রুটি দেখা যায় তা থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে। মৌলিক মানবীয় গুণাবলি সকল মানুষের নিকটই প্রশংসনীয়। মন্দ চরিত্রের মানুষও সচ্চরিত্র লোকের প্রশংসা করে। এ বিষয়ে যদি আমরা সচেতন থাকি তাহলে পাশ্চাত্যের সকল মন্দ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হব। এমনকি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করাও সম্ভব হবে। বক্তব্যের পর ১০ মিনিট তাদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে বিদায় নিলাম।

লেকচার হলে শ্রোতারা সবাই ভারতীয়, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি ছিল। সেখানে পাকিস্তানি বক্তার নাম ভুলে গেছি। ভারতীয় বক্তা ছিলেন ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য মুসলিম লীগনেতা শাহাবুদ্দীন আহমদ। তাঁর বক্তৃতার পর আমাকে বলতে দেওয়া হয়। আমার পর পাকিস্তানি বক্তা বক্তব্য রাখেন।

এ তিন দেশের সম্পর্ক কিভাবে উন্নত করা যায়, সে বিষয়েই আলোচনা করা হয়। ভারতীয় বক্তা বলেন, কাশ্মিরের যে অংশ যে দেশের দখলে আছে তা উভয়পক্ষ মেনে নিলেই ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কে কোনো সমস্যা অবশিষ্ট থাকবে না। আমি যখন বললাম, ১৯৪৮ সালে কাশ্মির সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতই জাতিসংঘের দুয়ারে ধরনা দেয়। জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে মীমাংসা প্রস্তাব দেয়। ভারত ও পাকিস্তান এ ফায়সালা মেনে নেয়। পরবর্তীকালে ভারত তা মানতে অস্বীকার করার কারণেই সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। ভারত ঐ সমাধান মেনে নিলেই সমস্যা থাকবে না। আমার বক্তব্যকে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিরা সমস্বরে সমর্থন করলে অন্যরা চুপ থাকতে বাধ্য হয়। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ব্যাপারে বললাম, ভারত বাংলাদেশের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে আচরণ করলে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না।

৩১১.

ডেট্রয়েটে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক ও শিকাগোর মাঝামাঝি একটি বড় শহর ডেট্রয়েট। এখানে ইকনা (ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা)-এর মজবুত সংগঠন রয়েছে। ইসনা সম্মেলনের সময়েই তারা দাবি জানালেন যে, আমাকে ডেট্রয়েটে যেতে হবে। নাঈম সুরায়া নামে এক জোশীলা পাকিস্তানির আবেগ আমাদেরকে সেখানে যেতে বাধ্য করল।

স্থানীয় বড় মসজিদটি ইকনা'রই নিয়ন্ত্রণে। সেখানে তারা সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। তাদের মহব্বত ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হলাম। দীনের ভিত্তিতে যে মহব্বত, এর কোনো তুলনা নেই।

সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পটভূমি ও বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান সম্পর্কে তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি তাদেরকে অবহিত করলাম। আমাদের প্রতি মহব্বতের টানে নাঈম সাহেব একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন।

ফ্লোরিডা গমন

ফ্লোরিডা রাজ্যটি ম্যাপে দেখলে মনে হয় যে, বিশাল আমেরিকার পেটের ভেতর থেকে একটি ভূখণ্ড বের হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে ঢুকে পড়েছে। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এখানে বরফ পড়ে না।

ইসনা সম্মেলন উপলক্ষে গোটা আমেরিকা থেকে আগত ইকনা'র মজলিসে শূরার সদস্যগণ নিউইয়র্কে এক অধিবেশনে মিলিত হন। সেখানে আমাকেও যেতে হলো। তাঁদের সাথে মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার ইউনুসের সাথে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে ও আবু নাসেরকে ফ্লোরিডা বেড়াতে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। শহর থেকে একটু দূরে নিরিবিলি পরিবেশে তিনি নিজস্ব বাড়িতেই বসবাস করেন এবং স্থানীয় হাসপাতালেও দায়িত্ব পালন করেন।

ডাক্তার ইউনুস ইকনা'র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি পরবর্তীতে ইকনা'র প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ডাক্তার ইউনুসের সাথে নাসের সাহেব আমার একটা স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে কথা বললেন। তিনি আমার চেক-আপের জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বিমানে তাঁর সাথে আমরা ফ্লোরিডা গেলাম। গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর বিরাট বাড়িতে উঠলাম। প্রশস্ত পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ ও চিকিৎসাসেবাসহ শহরের সকল সুবিধাই সেখানে রয়েছে। অথচ গাছ-গাছড়ায় ভরা এলাকায় চমৎকার আবহাওয়া বাংলাদেশের মতোই মনে হলো।

আমার স্বাস্থ্যগত সমস্যা

আমার বড় কোনো সমস্যা ছিল না; ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে প্রচণ্ড সর্দিজ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। মাথায় এত ব্যথা অনুভূত হয়, যেন ফেটে যাচ্ছে। সারা শরীরে এত পরিমাণে ব্যথা ছিল যে, মনে হচ্ছিল সব হাড়-মাংস চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তখন ইবনে সিনা হাসপাতালে কিছু দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর আল্লাহর রহমতে সুস্থ হই।

সর্দিজ্বর হলে সাধারণত মাথা ভারী মনে হয়। সর্দিজ্বর চলে গেলে তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকুই বলতে পারি; কিন্তু এবার সুস্থ হওয়ার পরও মাথার ভার রয়েই গেল। কোনো ব্যথা-বেদনা নেই, অথচ ভার হয়ে থাকে— এটা বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর কোনো কারণও ডাক্তারগণ তালাশ করে পেলেন না।

ডাক্তার ইউনুসের হাসপাতালে চেক-আপ চলল। এক বয়স্কা নার্স আমার ব্লাড প্রেসার মেপে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, Well! what is your age? (আচ্ছা! আপনার বয়স কত?) বললাম, ৭৩ বছর। নার্স বললেন, মনে হলো ২৫ বছরের যুবকের ব্লাড প্রেসার মাপলাম।

ব্যাপক চেক-আপ চলল। সব রিপোর্ট জমা হলো। পরীক্ষা করে অনেক কিছুই জানা গেল। আল্লাহর রহমতে সবকিছুই নর্মাল পাওয়া গেল। তবুও মাথা কেন ভারী হয়ে থাকছে সে বিষয়ে কিছুই বোঝা গেল না।

নাসের সাহেবেরও চেক-আপ করা হলো। ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দিলেন, সব রিপোর্ট সাথে নিয়ে যাবেন, যাতে সে অনুযায়ী দেশে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

আমরা সেপ্টেম্বর মাসের কয়েকটা দিন ফ্লোরিডায় কাটালাম। এত সুন্দর আবহাওয়া, মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের বসন্তকাল। পাশাপাশি ডাক্তার ইউনুসের মেহমানদারি আমাদেরকে অভিভূত করল। তিনি তাঁর আতিথেয়তায় আমাদেরকে কৃতার্থ করলেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে বিমানে নিউইয়র্ক পৌঁছলাম।

কানাডা সফর

কানাডা যাওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা একই সংগঠনভুক্ত হওয়ায় নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে কানাডার লোকও উপস্থিত ছিলেন। তাই সাংগঠনিক প্রয়োজনে কানাডা যাওয়া জরুরি মনে করা হয়নি। কিন্তু কানাডা শাখা দাবি জানাল যে, দু কারণে আমাকে সেখানে যেতে হবে—

১. আরব, ভারত ও পাকিস্তানি ইসলামী সংগঠনগুলো আমাকে রিসিপশন দিতে চায়।

২. 'মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা' টরেন্টোতে বাংলাদেশিদের সমাবেশের আয়োজন করতে আগ্রহী।

কানাডা যাওয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত থাকলে ঢাকাস্থ কানাডীয় হাইকমিশন থেকেই ভিসা নিতাম। আমেরিকা থেকে ভিসা চাওয়ার পর তারা জানতে চাইল যে, ঢাকা থেকে কেন ভিসা নিলাম না? মাত্র একদিনের জন্য ভিসা চাইলাম। শেষ পর্যন্ত দিল।

আমরা দু জন ১০ সেপ্টেম্বর কানাডার রাজধানী টরেন্টোতে পৌঁছলাম। ঐ দিনই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উদ্যোক্তা হলেন, মিসরীয় ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং ভারত ও পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইয়েরা। আমাকে ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীল হিসেবেই তাঁরা সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের কর্মসূচি সর্বত্র প্রায় এক রকমই হয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখেছি। এখানে বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন মনে করি না। আমি তাঁদের আন্তরিকতা, উৎসাহ ও কর্মসূচিতে মুগ্ধ হয়েছি।

বাংলাদেশিদের সমাবেশের পরই ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। তাই সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্য থেকে বাছাই করা সুধীদেরকে দাওয়াত করা হলো। আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে তাঁদের বেশ কিছু লিখিত প্রশ্নের জবাব দিলাম। ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয় বরং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, এ বিষয়েই বক্তব্য রেখেছি।

পরের দিন ১১ সেপ্টেম্বর আমরা বিমানযোগে নিউইয়র্ক ফিরে এসেছি।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

কানাডা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর আরো ৮ দিন সাংগঠনিক বৈঠক, ওয়াশিংটন সফর ইত্যাদিতে লেগে গেল। ওয়াশিংটন সফরের বিবরণ আগের কিস্তিতেই লেখা হয়ে গেছে, যদিও এ সফর কানাডা থেকে ফিরে আসার পর হয়েছে।

নিউইয়র্ক থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন সকালে লন্ডন পৌঁছলাম এবং সেদিনই রাতে রওয়ানা হয়ে পরের দিন ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকা ফিরে এলাম।

এ সফর ৩ আগস্ট শুরু হয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সমাপ্ত হয়। ইংল্যান্ডে ২৭ দিন ও আমেরিকা-কানাডা মিলে ২১ দিন। মোট ৪৮ দিন একটানা সফরে থাকলাম।

১৯৯৫ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯৯৫ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে পদত্যাগের আন্দোলন। ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে যথেষ্ট লেখা হয়েছে। এ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ১৯৯৬ সালের মার্চে বিএনপি সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার কথা। এর পূর্বেই পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে।

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী যুগপৎভাবে ১৯৯৪-এর এপ্রিল থেকে এ আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বারবার ঘোষণা করা হয় যে, কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। তা না হলে কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

সৌদি আরব সফর

২০০৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরব সফরে যেতে হলো। এ সফর ৭ সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছে। তাই এখন সৌদি আরব সফর সম্পর্কে লিখতে হচ্ছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি (২০০৭) সকালে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে জেদ্দার সময় রাত ১১টায় (ঢাকার সময় তখন রাত ২টা) আমার বড় ছেলে মামূনের বাসায় পৌঁছলাম। মামূনের অফিসে বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি। ঐ দেশে সব অফিসেই এ নিয়ম।

পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হলো যে, ২২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মামূন আমাদেরকে নিয়ে বিকালে ওমরার উদ্দেশ্যে নিজের গাড়িতে মক্কা শরীফ নিয়ে যাবে।

পূর্বে এক কিস্তিতে মামূনের গাড়ি সড়ক দুর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়ার কথা লিখেছি। ২০০৬ সালের ৯ জুন ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটি যথারীতি বীমা করা থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছুই পাওয়া যায়নি। এ দেশে সব ব্যাপারেই ফরমালিটির শেষ নেই। মামূনের পক্ষে এর পেছনে লেগে থাকার মতো এত সময় ও অবসর নেই।

যে ব্যাংকে মামূন চাকরি করে সে ব্যাংক ৯২ হাজার রিয়ালে একটি নতুন গাড়ি কিনে ১২ হাজার রিয়াল মুনাফা নিয়ে তার নিকট বাকিতে বিক্রয় করে। প্রতি মাসে বেতন থেকে দু হাজার রিয়াল করে গাড়ি বাবত কেটে নেয়। এ দেশে গাড়ি বিনা ট্যাক্সে কেনা যায় বলে ঢাকার তুলনায় অর্ধেক দামে পাওয়া যায়।

ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিকাল সাড়ে তিনটায় ইহরাম পরিধান করে রওয়ানা হলাম। ৭৫ কিলোমিটার পথ। এক ঘণ্টায়ই পৌঁছে গেলাম। মাওলানা আবদুল জাব্বার ২৫ বছর ধরে মক্কায় আছেন। তিনি সেখানে আমাদের জন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তিন কামরাবিশিষ্ট একটা স্যুটে আমরা উঠলাম। প্রতিটি কামরায় দুটো করে বিছানা। আমি ও মামূনের আম্মা এক কামরায় এবং মামূন সস্ত্রীক আরেক কামরায়। তৃতীয় কামরাটি তাদের জন্য রাখা হলো, যারা আমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চান।

ওমরা পালন

মাগরিবের আযানের এক ঘণ্টা আগে আমরা মসজিদে হারামে পৌঁছে আসরের নামায আদায় করলাম। সোয়া ঘণ্টা আগেই আসরের জামায়াত হয়ে গেছে। ওমরার প্রথম কাজই হলো কাবা শরীফ তাওয়াফ করা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো সাফা ও মারওয়া

পাহাড়ের মাঝখানে সা'ঈ করা (দৌড়ানো)। কাবা শরীফের চারপাশে ৭ চক্কর ঘুরে মাকামে ইবরাহীমে দু রাকাআত ওয়াজিব নামায আদায় করা হলে এক তাওয়াফ হয়।

ডান পায়ে সায়েটিকার দরুন আমি ডান হাতে ক্র্যাচ ব্যবহার করি। ক্র্যাচ ছাড়া বাড়িতে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে ঘন ঘন পদক্ষেপে হাঁটি। ক্র্যাচ ব্যবহার করলে একটু বড় পদক্ষেপ দিতে পারি। বাড়ির বাইরে একা যাই না। সাথে যে থাকে তার কাঁধে বাঁ হাত রেখে হাঁটি। তাওয়াফের সময় মামূনের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হলো।

তাওয়াফের সময় প্রতি চক্করে পড়ার জন্য বইতে লম্বা লম্বা দোআ পাওয়া যায়। অনেকেই বই হাতে নিয়ে কেউ জোরে কেউ আস্তে ঐসব দোআ পড়তে থাকেন। দোআর কথাগুলো খুবই সুন্দর ও আবেগময়; কিন্তু রাসূল (স) এসব দোআ পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাই আমি তা পড়ি না।

তাওয়াফ হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার সুন্নাত তরীকা। কুরআনে আছে, 'যারা মুমিন, তাদের ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই সবচেয়ে বেশি।' ভালোবাসার ঐ মহান পাত্রকে তো দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়াও যায় না– বাস্তবে নাগাল পাওয়ারও কোনো উপায় নেই। কিন্তু ভালোবাসার দাবি হলো তাঁকে কাছে পাওয়া। এই যে প্রেমের আবেগ তা প্রকাশ করার জন্য রাসূল (স) আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর প্রতি গভীর মহব্বতের তীব্র অনুভূতি নিয়ে পাগলপারা হয়ে তাঁকে নাগাল না পেয়ে তাঁর ঘরের চারপাশে ঘুরতে থাকা। অন্তরে প্রেমানুভূতি নিয়ে মুখে কুরআন ও হাদীসের যেসব দোআ উচ্চারণ করলে আবেগ অনুভূত হয়, তা পড়া যায়।

আমাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হয় বলে তাওয়াফে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমে বেশ পেছনে দু রাকাআত ওয়াজিব নামাযের জায়গা পেলাম। নামায শেষে মাগরিবের নামাযের অপেক্ষায় সেখানেই বসে দোআ করতে থাকলাম এবং এক দৃষ্টিতে কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কালো পাথরের দেয়ালে তৈরি কাবা ঘরের উপর গাঢ় কালো কাপড়ের পর্দা লাগানো। এ ঘরের প্রতি মুমিনদের কী যে অদ্ভুত আকর্ষণ! চেয়ে থাকলে চোখ ক্লান্ত হয় না। একটানা চেয়ে থাকতেই ইচ্ছা হয়। এ ঘর ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত এবং দুনিয়ার সকল জায়গা থেকে এ ঘরের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে হয়। এ ঘরের মর্যাদার কোনো তুলনা নেই।

তাওয়াফের মর্যাদা

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, কাবা ঘরের উপর ১২০টি বরকত নাযিল হয়। এর মধ্যে ৬০টি তাওয়াফকারীদের জন্য বরাদ্দ, ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং ২০টি তাদের জন্য যারা কাবাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ফরয নামাযের পর মসজিদে হারামে সবচেয়ে বড় নেক আমল হলো তাওয়াফ করা। তাই যারা এখানে নামায আদায় করতে আসেন তারা নামাযের পর তাওয়াফ করতে চেষ্টা করেন। জামাআতে নামাযের সময় সবাই জামাআতে শরীক হওয়ার কারণে ঐ সময়টুকুতে তাওয়াফ হয় না। সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই আবার তাওয়াফ চলতে থাকে।

কাবা ঘরের চারপাশে বিশাল খোলা চত্বর। গোটা চত্বর এমন সাদা পাথরে মোড়ানো, যা রোদে গরম হয় না। '৭২ সালের কথা মনে পড়ে যে, দুপুরে গরমের কারণে তাওয়াফ করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। পরবর্তীতে এমন পাথর বসানো হয়েছে, যা প্রচণ্ড রোদেও ঠাণ্ডাই থাকে।

খোলা চত্বরের পরই মসজিদের বিল্ডিং শুরু। হজ্জ ও রমযানের সময় এত লোক একসাথে তাওয়াফ করে যে, বিশাল চত্বরটি পূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি স্থান সংকুলান হয় না বলে মসজিদের দোতলায় ও এর উপরের ছাদে উঠে তাওয়াফ করতে হয়। আমার ধারণা যে, চত্বরে একসাথে এক লাখ লোক তাওয়াফ করতে পারে।

চত্বরের পর মসজিদের যে অংশটি একতলাবিশিষ্ট সে অংশটি তুর্কিদের উসমানী খিলাফতের সময় নির্মিত। এরপর দ্বিতলবিশিষ্ট বিশাল বিল্ডিং। জানা গেল, তাওয়াফের জায়গা আরো বড় করার জন্য তুর্কি আমলে নির্মিত অংশ ভেঙে ফেলা হবে। এতে হয়তো কমপক্ষে আরো ৭০ হাজার লোক তাওয়াফ করতে পারবে।

এ মসজিদের নামাযীদের ৪০টি বরকত লাভ করা ছাড়াও প্রতি রাকাআত নামাযে অন্য মসজিদে এক লাখ রাকাআত নামাযের সওয়াব হাসিল হয় বলে রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন।

সাঈ'র বিবরণ

তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে ৭ বার দৌড়ানোকে সাঈ বলা হয়। সাফা পাহাড়ে উঠে দোআ করার পর দৌড়ানো শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলে একবার দৌড়ানো হয়। সেখান থেকে আবার দৌড়ে সাফা পাহাড়ে উঠলে দ্বিতীয় বার দৌড়ানো হয়। এভাবে ৭ বার দৌড়ালে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে সা'ঈ শেষ হয়।

সা'ঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো। কিন্তু সবটুকু পথ দৌড়াতে হয় না। দু পাহাড়ের মাঝে সাফার কিছুটা কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা চিহ্নিত করা আছে; সেখানে দৌড়াতে হয়। বাকি পথটুকু দ্রুত হেঁটে গেলেই চলে।

সা'ঈর মাধ্যমে যে ইতিহাস মুসলিম উম্মাহর স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা এক করুণ আবেগময় ঘটনা। এর সাথে যমযম কূপের ইতিহাস জড়িত।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর আমার জীবনে প্রথম ওমরাহ্ করার সৌভাগ্য হয়। এ সময়কার কথা আগেই লেখা হয়েছে। 'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ১২১ ও ১২২ নং কিস্তিতে যমযমের ইতিহাস ও সা'ঈর পটভূমি লিখেছি।

হাজরে আসওয়াদ (বেহেশতী কালো পাথর) কাবা ঘরের যে কোণে রয়েছে এর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মাত্র ৫০ হাত দূরেই যমযম কূয়া অবস্থিত। তাওয়াফের চত্বর থেকে ৮-১০ হাত নিচে সিঁড়িতে নেমে কূয়ার কাছে যেতে হতো। ১৯৭১ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর কূয়ার পানি বালতি দিয়ে তোলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৫ সালে গিয়ে দেখা গেল, কূয়ার উপর পর্যন্ত তাওয়াফের চত্বর সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কূয়া আর দেখার কোনো উপায় নেই। সেখান থেকে বেশ দূরে মোটরে পানি তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাফা ও মারওয়ার দূরত্ব ৪০৫ মিটার। ৭ বারে ৪০৫×৭=২৮৩৫ মিটার দৌড়ানো হয়। ১০০০ মিটারে এক কিলোমিটার হয়। পৌনে তিন কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। তা ছাড়া দু দিকে পাহাড়ে উঠতেও পরিশ্রম হয়। তাই সা'ঈতে যথেষ্ট সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করতে হয় বিধায় বেশ ক্লান্তি লাগে।

১৯৯৫, '৯৬ ও '৯৯ সালে ওমরা করতে পরিশ্রম বোধ হলেও হেঁটেই সা'ঈ করেছি। কিন্তু ২০০৩ সালে হজ্জ ও ওমরা করতে হুইল চেয়ারে বসে সা'ঈ করতে বাধ্য হয়েছি। ২০০৩ সালে হজ্জ উপলক্ষে ফরয তাওয়াফ করার সময় প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে হুইল চেয়ারেও নিচে তাওয়াফ করা সম্ভব ছিল না। দোতলায় আমার স্ত্রীকে হুইল চেয়ারে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে এক ঘণ্টারও বেশি সময় আবদুর রহীম সাহেবের ভাতিজা হুইল চেয়ার ঠেলে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। ২০০৪ সাল থেকে তো আমি ক্র্যাচ ব্যবহার করে চলতে বাধ্য হচ্ছি। তাই হুইল চেয়ারেই এবারও সা'ঈ করতে বাধ্য হলাম।

এক মহব্বতের খাদেম

সাফা পাহাড়ের কাছে হারাম শরীফেই প্রচুর হুইল চেয়ার আছে, যা ৫০ রিয়াল ভাড়া দিলে সা'ঈর জন্য পাওয়া যায়। আমার স্ত্রীর জন্য ভাড়া নেওয়া হলো। এক মহব্বতের খাদেম আমাকে ভাড়া নিতে দিলেন না। তিনি বিনা ভাড়ায় কোথা থেকে হুইল চেয়ার নিয়ে এলেন এবং তাতে আমাকে বসিয়ে নিজেই হুইল চেয়ার ঠেলে সাঈ করালেন। তাই তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করছি।

তাঁর নাম আবদুর রহীম। শরীয়তপুর জেলার জাযিরা থানায় বাড়ি। ২৪ বছর ধরে মক্কা শরীফে আছেন। ৭ তলা বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে হজ্জ ও ওমরা করার জন্য আগত লোকদের খিদমত করেন এবং তাদের কাছ থেকে যে ভাড়া পান তা-ই তার আয়ের উৎস। একটি ছোট মাইক্রোবাস নিজেই চালান; সপরিবারেই সেখানে থাকেন।

জামায়াতের যত দায়িত্বশীল ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ আসেন তাঁদের যাতায়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর মাইক্রোবাস নিয়ে সবসময় প্রস্তুত থাকেন। দীনের দাওয়াতী কাজে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত উৎসাহী।

২০০৩ সালে কুরআন মাজীদের ১১ থেকে ২৫ পারা পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে সাড়ে তিন মাস সৌদি আরবে ছিলাম। হজ্জের আগে ও পরে তিন সপ্তাহ মক্কা শরীফ থাকতে হয়েছে। বাকি সময় জেদ্দায় মামূনের বাসায় ছিলাম। জামালপুরের মাওলানা আবদুল জাব্বার বহু বছর ধরে মক্কা শরীফে থাকেন এবং বাংলাদেশিদের মাঝে দীনের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে জানালাম যে আমি হোটেলে থাকতে চাই না। হোটেলে হজ্জের মওসুমে এত ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া পাক করার ঝামেলাও পোহাতে চাই না। আমি ও আমার স্ত্রী এবং মামূনের বড় মেয়ে লুবাবা একসাথে হজ্জ করতে চাই। কোনো দীনী ভাইয়ের বাসায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না? আমার লেখার কাজও জারি রাখতে চাই, যা হোটেলে হাজীদের ভিড়ের মধ্যে সম্ভব নয়। পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চাই।

আবদুল জাব্বার সাহেব যাঁর বাসায় থাকার ব্যবস্থা করলেন তিনিই সেই আবদুর রহীম। তাঁকে আমি আগে চিনতাম না। তাঁর স্ত্রী খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে খিদমত করেছেন, তা ভোলার নয়। আমাদেরকে তাঁরা বাবা-মায়ের মতো মনে করে খিদমত করেছেন। তাঁদের দু মেয়ের পর দু ছেলে। ওদের দাদা-দাদি নেই বলে ওরা আমাদেরকে দাদা-দাদু ডাকতে লাগল। এবার যখন দেখা হলো, তখন ওদের মা আমার স্ত্রীকে বললেন, আপনারা আমার ছেলে-মেয়েদেরকে কেমন জাদু করেছেন যে, এরা দাদা-দাদুর কথা ভুলতেই পারে না। মাঝে মাঝে বলে, দাদা-দাদু আর আসে না কেন?

হজ্জের সময় আবদুর রহীম সাহেব তাঁর মাইক্রোবাসে আমাদের যে খিদমত করেছেন, এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। মক্কা থেকে মিনায় নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে আরাফাতের ময়দানে, সেখান থেকে মুজদালিফায় রাত যাপন করে মিনায় ফিরে আসা ও মিনা থেকে মক্কায় আসা— এ সবই তিনি তাঁর গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করে খিদমত করেছেন।

২০০৩ সালে হজ্জের পর মদীনা শরীফে তাঁর গাড়িতেই গেলাম। মামূন এত লম্বা পথে একটানা ড্রাইভ করতে সাহস পেল না বিধায় তার গাড়িতে যাওয়া হলো না। আবদুর রহীম সাহেব মক্কা থেকে ৭৫ কিলোমিটার ড্রাইভ করে জেদ্দা এলেন, সেখান থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে মদীনা গেলেন। তাঁকে দেখে ক্লান্ত মনে হলো না। মদীনা থেকে জেদ্দায় আমাদেরকে রেখে মক্কায় ফিরে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ খিদমত কবুল করুন ও আখিরাতে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

কাবা শরীফের বিদায়ী যিয়ারত

৩০ মার্চ (২০০৭) রাতে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে জানা গেল, মামূনের ছোট মেয়ে নুসাইবা লন্ডন থেকে ৫ এপ্রিল দিবাগত রাতে দু সপ্তাহের জন্য জেদ্দা আসবে। নাতনির সাথে কমপক্ষে সপ্তাহখানেক থাকার দাবি জানালেন ওর দাদি। আমি দেশে ফিরে আসার জন্য অস্থির ছিলাম। নাতনি আসার পরের দিন ৬ এপ্রিল দিবাগত রাতে ঢাকা রওয়ানা হতে স্ত্রীকে সম্মত করতে সক্ষম হলাম।

দেশে ফিরে আসার আগে কাবা শরীফে বিদায়ী যিয়ারতের জন্য না গেলে অতৃপ্তি থেকে যায়। মামূনের সাপ্তাহিক ছুটি বৃহস্পতি ও শুক্রবার। আমরা শুক্রবার দিবাগত রাত ঢাকা রওয়ানা হচ্ছি। আগের দিন মামূন আমাদেরকে মক্কা শরীফ নিয়ে যেতে পারত; কিন্তু সেদিনই নুসাইবা আসবে বলে তা সম্ভব নয়। ধারণা হলো যে, বিদায়ী যিয়ারত থেকে বঞ্চিতই থাকতে হচ্ছে।

ঐ মহব্বতের দীনী ভাই আবদুর রহীম দাবি জানালেন যে, তিনি বুধবার দিন তাঁর নিজের গাড়িতে আমাদেরকে মক্কা শরীফ নিয়ে যাবেন এবং তাঁর বাড়িতে রাখবেন এবং পরের দিন জেদ্দায় পৌঁছাবেন। ইশার নামাযের পরই আমরা রওয়ানা হলাম এবং সোয়া ঘণ্টা পর তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। পথে তিনি বললেন, 'প্রতি ওয়াক্ত নামাযে মাসজিদুল হারামে অল্প সময়ে পৌঁছার সুবিধার জন্য বাবুল মদীনা বরাবর এমন এক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছি, যার সাথের রাস্তা পার হলেই হারাম শরীফে পৌঁছা যায়। শুধু খাওয়ার জন্য আপনাদেরকে বাড়িতে নিয়ে যাব।' তিনি ১০০ রিয়াল অগ্রিম ভাড়ায় দোতলায় কামরা নিলেন। হোটেলের মালিক কক্সবাজারের লোক; আমার কথা জানতে পেরে ভাড়া ফেরৎ দিতে চাইলেন। আবদুর রহীম সাহেব বললেন, এ ভাড়া তিনি দিচ্ছেন না, আমি দিচ্ছি। বিদায়ী যিয়ারতের পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। প্রাণভরে ভাই আবদুর রহীমের জন্য হারাম শরীফে দোআ করলাম।

৩১২.

আরেক জন মুখলিস খাদেমের কথা

১৯৯৫ সালে মক্কা শরীফে আমি নিজে অনেক দোকান তালাশ করেও আমার পছন্দমতো কোনো জায়নামায পেলাম না। সকল জায়নামাযেই কম-বেশি নানা প্রকার নকশা থাকে। আমি কোনো নকশা নেই এমন জায়নামায চাই, যাতে নামাযের সময় নকশা আমার মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগ না পায়। তা ছাড়া আমি লম্বা হয়ে সিজদা দেই বলে খাটো জায়নামায আমার পছন্দ নয়। এ দুটো বৈশিষ্ট্যের কোনো জায়নামায বহু তালাশ করেও পেলাম না। মক্কার দীনী ভাইদের কারো কাছ থেকে এ কথা জানতে পেরে ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া থানার আবুল হোসাইন সাহেব নকশাবিহীন হালকা

নীল রঙের একটি জায়নামায নিয়ে হাজির হলেন। লম্বায়ও আমার দাবি পূরণ হলো। অত্যন্ত খুশি হয়ে তার সাথে আলিঙ্গন করলাম। জায়নামাযটি পাশে এতটা বড় যে, দু জন একসাথে দাঁড়ানো যায়। আমি সফরে সাথে রাখার জন্য জায়নামায তালাশ করছিলাম। তাকে বললাম যে, সফরের জন্য এটা বেশ বড় হয়ে গেল। তিনি ওটা নিয়ে গেলেন এবং কাটিয়ে আন্দাজমতো ছোট করে চমৎকার সেলাই করিয়ে আনলেন। আমি বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে লক্ষ করে দেখলাম, যে পাশ দিয়ে কাটা হয়েছে সে পাশের সেলাই অপর পাশের মতোই নিখুঁত।

এ জায়নামায আমার অতি প্রিয়। অন্য কোনো জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আমি এতটা স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিবোধ করি না। আমার শোবার ঘরে যখন নামায আদায় করি এ জায়নামাযই ব্যবহার করি। গত বারো বছর ধরে দেশে ও বিদেশের সফরে এমনকি হজ্জের সময় মিনা ও আরাফাতে এ জায়নামাযই আমার সাথি। কয়েক বছর আগে দেখলাম, দু-এক জায়গায় সেলাই ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে তার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে নিজেই কালো বর্ডার লাগিয়ে সেলাই করে দিল। মনে হয় আমার বাকি জীবনে আর কোনো জায়নামাযের দরকার হবে না।

১৯৯৯ সালে যখন আবার মক্কা শরীফে গেলাম তখন আবুল হোসাইন সাহেব ঐ জাতীয় দুটো দু রঙের জায়নামায দিলেন। একটা নাসের সাহেবকে দিলাম। অপরটি মহল্লার মসজিদে দিয়ে দিলাম। কয়েক বছর পর তিনি আরো একটা জায়নামায পাঠালেন। ওটা আলফালাহ মিলনায়তনে দিয়েছি। সেখানে সারা বছরই বিভিন্ন প্রোগ্রাম চলে। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন ঐ হলেই অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইমামের জন্য ঐ জায়নামায নির্দিষ্ট।

গত হজ্জের পর তিনি আরো একটি জায়নামায একজনের মাধ্যমে পাঠালেন। এতে নকশা না থাকলেও সোনালি বর্ডার রয়েছে; কিন্তু এটা লম্বায় কিছুটা কম। এবার মক্কায় যাওয়ার পর তিনি আরো দুটো জায়নামায দিলেন, যা লম্বায় কিছুটা কম। এ দৈর্ঘ্য মামূনের পছন্দ হওয়ায় একটা সে নিল।

এবার তাকে বলে দিলাম যে, লম্বায় ঐ মাপের জায়নামায না পেলে আর একটাও দেবেন না। তিনি জানালেন, তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও ঐ রকম লম্বা পাওয়া গেল না।

আতরের শিশি'র কাহিনী

১৯৯৫ সালে যখন মক্কা শরীফে কিছু দিন ছিলাম তখন এক দীনী ভাই জানালেন, 'আমি আপনাকে এক আতরের দোকানে নিয়ে যেতে চাই। দোকানের মালিকের বাড়ি আসাম। তিনি আপনাকে খুব মহব্বত করেন। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে আপনার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার খবর এখানকার ইংরেজি দৈনিক Arab News-এর প্রথম পৃষ্ঠায় আপনার ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকা ১০০ কপি কিনে তিনি বিলি করেছেন।'

সকাল ১০টায় যখন আমরা দোকানে গেলাম, তখন ক্রেতাদের ভিড় ছিল না। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে কোলাকুলি করে আমার কপালে চুমু খেলেন। সামনাসামনি বসলাম। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথা হলো। একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'দেওবন্দ মাদরাসায় পড়ার সময় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এমন বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে, যার ফলে তাঁর লেখা বই পড়ার রুচিই হয়নি। এরপর আলীগড়ে পড়ার সময় জামায়াতের লোকের পাল্লায় পড়ি। মাওলানা মওদূদীর বই পড়া শুরু করার পর সব বই না পড়ে থামা সম্ভব হলো না। দেওবন্দে যারা মাওলানা সম্পর্কে অপপ্রচার চালাতেন তাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ বোধ করি।'

'আপনাকে ভালোবাসার একমাত্র কারণ, আপনি জামায়াতে ইসলামীর নেতা। তাই আপনি আমারও নেতা। জামায়াতে ইসলামী ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা জনগণের মাঝে পেশ করে, আলেম সমাজ যদি ইসলামের এ পরিপূর্ণ ধারণা রাখতেন তাহলে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হতো।'

তিনি আমাকে মাঝারি-বড় আকারের এক শিশি চমৎকার আতর উপহার দিলেন। আর পকেটে রেখে ব্যবহার করার জন্য খুব হালকা ও ছোট্ট একটা আতরভর্তি শিশি দিয়ে বললেন, 'এটা পকেটে রাখবেন। তাহলে অজুর পর নামাযে যাওয়ার সময় পকেট থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে ভুল হবে না। বাড়িতে আতর থাকলেও ব্যবহার করতে মনে থাকে না। পকেটে থাকলে মনে থাকবে এবং ব্যবহার করার সময় আমার কথা মনে হবে, আমি দোআ পাব।'

শিশিটি এত সুন্দর ও হালকা যে আমার খুবই পছন্দ হলো। শিশির মুখে বল লাগানো কর্ক থাকায় কর্ক না খুলে সহজেই আতর ব্যবহার করা যায়। কর্ক খুলে ব্যবহার করা বড়ই ঝামেলা।

আমি তাঁকে বললাম, এ শিশি কোথায় পাওয়া যায়? আমি আমার দীনী ঘনিষ্ঠ ভাইদেরকে হাদিয়া দিতে চাই। বললেন, কতটি শিশি চান? বললাম, কর্মপরিষদের সদস্যসংখ্যা ৫০। প্রত্যেককে পকেটে রেখে ব্যবহার করার জন্য এক শিশি করে দিতে চাই, যেমন আপনি আমাকে দিলেন। তিনি চার ডজন শিশি দিয়ে দিলেন বিনামূল্যে।

শিশি বিলির কিস্‌সা

কর্মপরিষদের এক বৈঠকে আধা শিশিভর্তি আতরসহ প্রত্যেককে একটি করে শিশি হাদিয়া দিয়ে বললাম, আতর সহজেই জোগাড় করতে পারবেন; কিন্তু এ শিশি পাবেন না। পকেটে রেখে ব্যবহার করবেন। আতর ফুরিয়ে গেলে রিফিল করে নেবেন। তাদের কেউ এ শিশিটি হেফাযত করে ব্যবহার করছেন কি না জানি না।

এর কয়েক বছর পর আমার এককালের সেক্রেটারি জনাব আবুল কাসেম খান মরহুমের ছেলে আবদুর রহীম খান ঐ শিশির এক প্যাকেট এনে আমাকে দিল। আমি

বিস্মিত ও উল্লসিত হয়ে জানতে চাইলাম, তুমি এগুলো কোথায় পেলে? সে বলল, বায়তুল মুকাররমে পাওয়া যায়। তাকে দিয়েই আরো কয়েক ডজন আনালাম।

এ শিশি পেয়ে আবার হাদিয়া দেওয়া শুরু করলাম। বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হককে এক কৌটা আতর পাঠালাম এবং পকেটে রেখে ব্যবহার করার জন্য ছোট শিশিও দিলাম। খতীব সাহেব বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্যের প্রতীক 'জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল' নামক মঞ্চের চেয়ারম্যান ছিলেন। এ মঞ্চের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা হাফেয মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদীকেও ছোট শিশি দিয়েছি। তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের মিরপুরস্থ মাদরাসার মুহাদ্দিস। পীর সাহেবকেও আতরের কৌটাসহ ছোট শিশি দিয়েছিলাম। তিনি ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ইন্তিকাল করেছেন।

আমার পরিচিত বিশিষ্ট সকল আলেমকেই আমি পকেটে রেখে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে আতরভর্তি ছোট শিশি দিয়েছি। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব হারিয়ে ফেলেন বলে কয়েক বার দিতে হয়েছে। হয়তো আবারো দিতে হবে। মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী, তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং আরো অনেক আলেমকে দিয়েছি।

আতরের ছোট শিশি বিতরণ করা আমার হবিতে (শখে) পরিণত হয়েছে। আমার বাড়ির ১৯টি ফ্ল্যাটে যারা ভাড়ায় থাকেন, তাদের মধ্যে মহল্লার মসজিদে যারা নামাযে যান, তাদের সবাইকে দিয়েছি। এমনকি মসজিদে মহল্লার যারা নিয়মিত নামাযী তাদেরকেও দিয়েছি। আতর ফুরিয়ে গেলে তাদের কেউ কেউ আমার নিকট থেকে আতর চেয়ে নেন।

আল্লাহর রহমতে আমার নিকট আতরের অভাব হয় না; অথচ আমাকে কখনো আতর কিনতে হয় না। আমি যাদেরকে দান করি তাদের কিসমতেই আমি পাই। আমার সাথে যাদের মহব্বতের সম্পর্ক, তারা হজ্জে বা ওমরায় গেলে আমার জন্য আতর নিয়ে আসেন।

আতরের শিশি বিতরণ করে আমি আনন্দ পাই। কিন্তু ২০০০ সালের পর ঐ সুন্দর হালকা শিশি ঢাকায় আর পাওয়া গেল না। যে আমাকে শিশি জোগাড় করে দিত ঐ আবদুর রহীম খানকে অন্য শিশি তালাশ করতে বললাম। আতর বিলি তো বন্ধ করা চলে না। নিম্ন মানের শিশিতেই বিলি জারি রইল।

গত হজ্জের আগের হজ্জে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব সরকারি হজ্জ ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে গেলেন। আমার পছন্দের ঐ ছোট একটা শিশি নমুনা হিসেবে তাঁকে দিলাম। তিনি লোক লাগিয়ে তালাশ করালেন। কোথাও পাওয়া গেল না। অন্য রকম ছোট শিশি ৬ ডজন নিয়ে এলেন। তা-ই বিলি করতে থাকলাম।

এবার সৌদি আরব এসে ২২ ফেব্রুয়ারি (২০০৭) মক্কা শরীফ গেলে আমার জায়নামাযদাতা ভাই আবুল হোসাইন সাহেবকে পেলাম। ঐ ছোট শিশির নমুনা দিয়ে তালাশ করতে অনুরোধ করলাম। ১৫ মার্চ যখন দ্বিতীয় বার গেলাম তখন তিনি এক প্যাকেট (ডজন) শিশি দিলেন। আমার প্রিয় শিশি পেয়ে কত যে খুশি হলাম তা বলার নয়। জানতে চাইলাম, কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, জেদ্দায় তালাশ করে পাওয়া গেল, মক্কায় পাওয়া যায়নি। বললাম, আমার ১০০ শিশি প্রয়োজন। আড়াইবাড়ির পীর সাহেব মাওলানা গোলাম হাক্কানীর (আমার আপন মামাত ভগ্নিপতি) চাচাত ভাই জনাব সাদুল হক ফারুক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেল, তিনিও এক আতর ব্যবসায়ীর সাহায্যে শিশির খোঁজ পেয়ে গেছেন। তারা দু জনই কথা দিলেন যে, জেদ্দায় এসে শিশি জোগাড় করে দেবেন।

জনাব সাদুল হক ফারুক আমার লেখা 'জীবনে যা দেখলাম'-এর একজন উৎসাহী পাঠক। তিনি জানালেন, আমার লেখার কয়েকটি সংশোধনী নোট করে ঢাকায় মাওলানা শামাউন আলীর কাছে রেখে এসেছেন। আমি শুকরিয়া জানালাম।

আজ (২৬ মার্চ ২০০৭) মাগরিবের পূর্বে আবুল হোসাইন সাহেবকে ফোনে কাবা শরীফে তাওয়াফরত অবস্থায় পেলাম। তিনি ২৮ তারিখে জেদ্দায় এসে শিশি দিয়ে যাবেন বললেন। তিনি মক্কায় অন্য রকম তিন ডজন শিশি দিলেন। ঐ আদর্শ শিশি ছাড়া এ পর্যন্ত অন্য রকম যত শিশি পেয়েছি এর মধ্যে এ শিশি অবশ্যই সেরা।

মক্কা শরীফে আমার রাত-দিনের অবিরাম সাথি

আমি ডান পায়ে অনেক দিন থেকেই 'সায়েটিকা' রোগে ভুগছি। ২০০৪ সালে রোগ বেড়ে যাওয়ায় ক্রাচ ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম। জেনারেল হেলথ আল্লাহর ফজলে ভালোই আছে; কিন্তু পায়ের সমস্যার কারণে আমি কোথাও একা যাওয়া নিরাপদ মনে করি না। মসজিদে যেতেও ডান হাতে ক্র্যাচ থাকে এবং বাম হাত কারো কাঁধে ধরে চলি। জেদ্দায় মামূন বাসায় থাকলে ওর সাথে মসজিদে যাই। সে অফিসে থাকলে মসজিদে একা যাই না।

এবার সৌদি আরবে পৌঁছে দু মাস থাকা হচ্ছে। এর মধ্যে দু বার মক্কা শরীফে গিয়েছি। প্রথম বার তিন দিন ছিলাম। দু দিন মামূন ছিল। তখন ওর কাঁধে ধরেই চলেছি। তৃতীয় দিন আমার সাথে সব সময় থাকার জন্য সন্দ্বীপের আবদুল করিম সাহেবকে পাওয়া গেল। মাওলানা আবদুল জাব্বারই এ ব্যবস্থা করলেন। দ্বিতীয় বার চার দিন তিনিই একটানা আমার সাথে রইলেন। পেশায় তিনি একাউন্ট্যান্ট। বহু বছর ধরে তিনি মক্কায় আছেন। বর্তমানে তাঁর পরিবার দেশে থাকায় তিনি রাত-দিন অবিরাম আমার সাথে থেকে প্রয়োজনীয় সব রকম খিদমত করেছেন।

দু বারই একই হোটেলে ছিলাম। সেখান থেকে মাসজিদুল হারামের গেট পর্যন্ত যেতে ভিড় থাকলে ১৫ মিনিট, ভিড় না থাকলে ১২ মিনিটের পথ হেঁটে যেতে হতো। সুস্থ

মানুষের ৭/৮ মিনিটের পথ। আবদুল করিম সাহেবের কাঁধে ধরে প্রতি ওয়াক্তে নামাযে যেতে হয়েছে। হোটেলে একই কামরায় তিনি পাশের সিটে ঘুমাতেন। তিনি আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে তৎপর ছিলেন। দোআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

মক্কা নগরীতে থাকা ও খাওয়া

যে হোটেলে ছিলাম এর নাম বুসতান। এ নামে তিনটি হোটেল এক সাথেই আছে। বুসতান নামের সাথে কোনো বিশেষণ লাগিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা যেটাতে ছিলাম এর নাম বুসতান গোল্ডেন হোটেল। হোটেলগুলো ১৭ তলা বিল্ডিং। হারাম শরীফের চারপাশে এর চেয়ে আরো অনেক উঁচু বিল্ডিং রয়েছে। এ সবই হোটেল হিসেবে ব্যবহৃত। রমযান থেকে সফর পর্যন্ত হজ্জ ও ওমরা করার জন্য আগত লোকেরা এসব হোটেলে ভাড়ায় থাকে। এ ৬ মাসই ভিড় থাকে এবং হোটেলের মালিক সারা বছরের আয় এ সময়েই অর্জন করে। বাকি ৬ মাস মোটেই ভিড় থাকে না।

হোটেলের মান অনুযায়ী এবং হারাম শরীফ থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে ভাড়ার হারে অনেক পার্থক্য থাকে। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণির হোটেলে ছিলাম। প্রতিটি কামরায় হাত দেড়েক ফাঁক দিয়ে শোয়ার বিছানা পাতা। বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। হজ্জের মৌসুমে এক-একটি বিছানার ভাড়া ৭/৮ হাজার রিয়াল। আরো দামি হোটেলে বসার ব্যবস্থা আছে এবং ভাড়া আরো বেশি।

উপরিউক্ত তিনটি বুসতান হোটেল মালিক থেকে ভাড়া নিয়ে দু'জন বাংলাদেশি ব্যবসা করছেন। তাদের কর্মচারী সবাই বাংলাদেশি। হজ্জের মৌসুমের পর খুব কম ভাড়ায় থাকা যায়। রোজ মাত্র দু থেকে তিন শ' রিয়ালেই সিট ভাড়া পাওয়া যায়। কামরা ভাড়া নিলে আরো বেশি ভাড়া দিতে হয়।

চট্টগ্রামের জনাব কামাল ও নোয়াখালীর জনাব নূর মুহাম্মদ যৌথভাবে এ হোটেল ব্যবসা চালাচ্ছেন। এখানকার দীনী ভাইয়েরা আমাদের জন্য এ হোটেলে থাকাই পছন্দ করেছেন। আমরাও তাদের নিকট থেকে সুন্দর আচরণ পেয়েছি। আমরা ভাড়া দিতে চেয়েছি; কিন্তু তারা নেননি। বলেছেন, 'আপনারা দিতে চাওয়াটাই যথেষ্ট।' আল্লাহ তাআলা তাদের এ মেহমানদারির পুরস্কার দান করুন।

মক্কা শরীফে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি খাবারের প্রচুর দোকান আছে; কিন্তু আমাদেরকে দোকানে খাবার খেতে হয়নি। বাংলাদেশি দীনী ভাইদের বাসা থেকে আমাদের জন্য হোটেলে খাবার নিয়ে এসে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাওলানা আবদুল জাব্বার থেকে জানা গেল, এত বেশি লোক খাবার দিতে চেয়েছেন যে, সবাইকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। দীনের ভিত্তিতে সম্পর্ক যে আত্মীয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ, সে কথার প্রমাণ বহু বার পেয়েছি।

আজ (৩০ মার্চ ২০০৭) আতরের শিশি পেলাম

২৮ মার্চ (২০০৭) মক্কার আবুল হোসাইন সাহেবের জেদ্দা আসার কথা ছিল আতরের শিশি দেওয়ার জন্য। সে দিন শিশি জোগাড় না হওয়ায় জানালেন যে, ৩০ তারিখে আসবেন। বেলা ১১টায় তিনি পৌঁছলেন। সাথে ছিলেন পূর্বে উল্লিখিত আড়াইবাড়ির জনাব সাদুল হক ফারুক। ফারুক সাহেব জানালেন, '৫ ডজন শিশি নিয়ে এলাম।' বললাম, কোথায় পাওয়া যায় বলুন, যাতে আপনাদেরকে কষ্ট দিতে না হয়। আবুল হোসাইন সাহেব বললেন, আপনি তালাশ করে পাবেন না। জোগাড় করে আমরাই পাঠাব।

এ কিস্তির প্রথম দিকে লিখেছি যে, আসামের এক আতর ব্যবসায়ী আমাকে এ শিশি সর্বপ্রথম দিয়েছেন। আমাকে যিনি তার কাছে নিয়ে গেলেন, তার নাম-পরিচয় মনে ছিল না। তাই এক দীনী ভাই নিয়ে গিয়েছিলেন বলে লিখেছি। আজ জানা গেল, ফারুক সাহেবই ঐ দীনী ভাই। আমি আসামের ঐ ভাইয়ের নামও ভুলে গিয়েছিলাম। আজ জানা গেল, তার নাম মাওলানা হাসান। জানতে চাইলাম, তিনি এখনো এ দেশে আছেন কি না। বললেন, অনেক আগেই তিনি দেশে চলে গেছেন। তার পুরো নাম বলতে পারলেন না। বললেন, আমরা হাসান ভাই ডাকতাম।

মদীনা শরীফে মাত্র ২০ ঘণ্টা

জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফ কাছে হওয়ায় সেখানে যাওয়া যত সহজ মদীনা শরীফ যাওয়া তত সহজ নয়। মামূনের সাপ্তাহিক ছুটি বৃহস্পতি ও জুমাবার। জেদ্দা থেকে মদীনা সড়কপথে যেতে ৫ ঘণ্টা লাগে। শনিবার অফিস করার জন্য আগের রাতেই জেদ্দা ফিরে আসতে হবে।

২৯ মার্চ (২০০৭) বৃহস্পতিবার মামূনের গাড়িতে আমরা বেলা ১১টায় রওয়ানা হলাম। বড় গাড়ি, দু পরিবার মিলে মোট ৯ জন। আমি ও মামূন সস্ত্রীক ৪ জন ও মামূনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মুহাম্মদ হোসাইন, তার স্ত্রী, স্কুলপড়ুয়া মেয়ে ও ৭ বছরের ছেলেসহ তারা ৫ জন। হোসাইন সাহেবের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানায়। এ দেশে ২২ বছর ধরে আছেন। একটা কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি অনেক চেষ্টা করে তার বাসার নিকটে মামূনের বর্তমান বাসা জোগাড় করেছেন। তিনি অনেক দিন থেকেই মামূনের অতি আপনজনের ভূমিকা পালন করছেন। আপনজন আরো অনেক আছেন। তিনি এর মধ্যে বিশিষ্ট।

মামূন একটানা ৫ ঘণ্টা গাড়ি ড্রাইভ করতে সাহস করে না। তাই মুহাম্মদ হোসাইন সাথে যাচ্ছেন। ১১টায় রওয়ানা হয়ে সরাসরি মদীনা গেলে বিকাল ৪টায় পৌঁছার কথা; কিন্তু পথে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে হলো। জেদ্দা থেকে মদীনার পথে ১০০ কিলোমিটার যাওয়ার পর আরো ভেতরে ২৫ কিলোমিটার দূরে আসফান নামক গ্রামে ঐ আত্মীয়ের বাসা। আমার তৃতীয় ছেলে মোমেনের শালা ডা. নূরুল মোমেন সেখানে চিকিৎসক। তার

স্ত্রী বেবী আমার স্ত্রীর নাতনি। বেবীর নানি আমার স্ত্রীর মামাত বোন। ডাবল আত্মীয় হওয়ায় যেতেই হলো। দুপুরে সেখানে খাওয়ার পর সাড়ে তিনটায় রওয়ানা হলাম। জেদ্দা থেকে মামূন গাড়ি চালিয়ে গেল। সেখান থেকে দায়িত্ব নিলেন হোসাইন সাহেব। সন্ধা ৭টায় মসজিদে নববীর নিকট পৌছলাম। মসজিদ চত্বরসংলগ্ন তাইয়েবা হোটেলে আমাদের জন্য তিন কামরাবিশিষ্ট একটা স্যুট ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার মাওলানা সাইফুল্লাহ ১৪ বছর ধরে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। পিএইচডি'র থিসিস সাবমিট করেছেন। তিনিই হোটেলের ব্যবস্থা করেছেন। হোটেল থেকে বের হলেই মসজিদের চত্বর শুরু হয়। বিশাল চত্বর পার হয়ে মসজিদের গেট পর্যন্ত পৌছতে ৪/৫ মিনিট লেগে যায়। মসজিদ এত বিরাট যে, গেট থেকে আসহাবে সুফ্ফার চিহ্নিত স্থানে পৌছতে আরো ৪/৫ মিনিট লাগে।

ক্র্যাচে ভর দিয়ে এবং কারো কাঁধে হাত রেখে আমাকে মসজিদে হেঁটে যেতে হয়নি। আমার জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার যুবক হারুনুর রশীদ আমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে হোটেলের কামরা থেকেই নিয়ে চলল। লিফটে নেমে হুইল চেয়ারে হারাম শরীফে ঢুকলাম। তাই কম সময়েই মসজিদে পৌছলাম। কোনো সময় মামূন, এক সময় মামূনের বন্ধু হোসাইন সাহেব হুইল চেয়ার ঠেলল।

ইশার নামাযের পূর্বেই মসজিদে পৌছে গেলাম। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে জামায়াতের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি হার্টের চেক-আপ করানোর উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এসেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে রিয়াদস্থ ফায়সাল স্পেশালিস্ট হসপিটালে তার ওপেন হার্ট অপারেশন হয়েছে।

রাসূল (স)-এর কবর শরীফ যিয়ারত

মসজিদে নববীতে নামাযের পর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রাসূল (স)-এর কবর শরীফ যিয়ারত। এ কবর এবং মিম্বারের মাঝখানের জায়গাটুকু বেহেশতের বাগানগুলোর একটা বাগান বলে রাসূল (স) বলেছেন। আরবীতে বলা হয় রওযা। অথচ পাক-ভারত-বাংলায় কবর শরীফকে রওযা শরীফ বলা হয়। আরবে এ ভুল কেউ করে না।

রাসূল (স)-এর সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁর এ মসজিদে এক রাকাআত নামায অন্য মসজিদের এক হাজার রাকাআতের সমান। দুর্বল হাদীসে ৫০ হাজার রাকাআতের কথাও রয়েছে।

রাসূল (স)-এর কবর শরীফের পাশে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর কবর রয়েছে। এখানে প্রায়ই প্রচণ্ড ভিড় থাকে। এ সময় এত ভিড় থাকার কথা নয়; কিন্তু দু কারণে ঐ দিন ও পরের দিন খুব ভিড় ছিল। ঐ রাতটি ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত। বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির সময় দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোক এখানে আসে।

মাযারটি ইস্পাতের মোটা জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। জালটি সোনালি রঙে রঞ্জিত। জালের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখলে কবর তিনটি দেখা যায়। ১৯৭১ থেকে '৭৭ সালে প্রতি বছরই আমার সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তখন ছিদ্র দিয়ে দেখেছি। পুলিশ বাধা দেয়। কারণ, কতক লোক জালে চুমু দেয়। ১৯৯৫ সালে গিয়ে দেখলাম, দেড় ফুট চওড়া ও এক ফুট উঁচু পাকা দেয়ালকরা হয়েছে, যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। তাই জালের কাছে আর যাওয়া যায় না। ২০০৩ সালেও ঐ অবস্থাই দেখলাম। কিন্তু এবার দেখলাম, জালের কয়েক ফুট দূরে প্রায় ৪ ফুট উঁচু দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন জালের কাছে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। দেয়ালের ভেতর পুলিশ দাঁড়ানো।

ইশার নামাযের পর হারুনুর রশীদ আমাকে হুইল চেয়ারেই যিয়ারতের জন্য নিয়ে গেল। প্রচণ্ড ভিড়ের দরুন পুলিশ দাঁড়াতে দিল না। চলা অবস্থায়ই তিন জনকে কোনো রকমে সালাম দিলাম। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে মনের তৃপ্তি নিয়ে সালাম পেশ করতে পারলাম না। ওখান থেকে বের হওয়ার গেট কাছেই। গেটের কাছে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে কিছুক্ষণ দোআ করলাম। ঐ গেটের নাম 'বাবুল বাকী'। ওখান থেকে বের হয়ে সোজা মসজিদের বিশাল চত্বর পার হলেই 'জান্নাতুল বাকী' নামে খ্যাত কবরস্থান। বের হয়ে হোটেলে চলে গেলাম।

চরম অতৃপ্তি নিয়ে জেদ্দায় ফিরে গেলাম

মাত্র একটি রাত মদীনা শরীফে থাকা হবে। পর দিন জুমাবার। মদীনার মসজিদ রাত ১০টায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফজরের আযানের এক ঘণ্টা আগে যখন তাহাজ্জুদের আযান হয় তখন দরজা খুলে দেওয়া হয়। রাসূল (স)-এর মাথার বরাবর বাবে জিবরীলের সামনে আযানের আগেই মানুষ জড়ো হয়, যাতে গেট খোলার সাথে সাথেই রওযাতুল জান্নাতে পৌঁছা যায়। রাসূল (স)-এর কবর ও মিম্বারের মাঝখানের জায়গাটুকু বেহেশতের বাগানগুলোর একটি বাগান। ঐখানে বড় বড় সোনালি বর্ণে এ হাদীসটি লেখা আছে। ওখানে প্রায়ই এমন ভিড় হয় যে, নামাযের সময় সামনের কাতারের লোকদের পিঠের উপর সিজদা করতে হয়।

আবার মদীনা শরীফে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় কি না বলা যায় না বিধায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, রাত সাড়ে তিনটায় বাবে জিবরীলের সামনে হাজির হতে হবে। হুইল চেয়ার খাদেম হারুনুর রশীদের সোয়া তিনটায় হোটেলে পৌঁছার কথা। সে যথাসময়ে না আসায় মামূন হুইল চেয়ার ঠেলার দায়িত্ব নিল। সাড়ে তিনটায় বাবে জিবরীলে পৌঁছলে পুলিশ বলল, আজ এ গেটে রয়াল ফ্যামিলির লোক ঢুকবে। আপনারা বাবে বাকীতে অপেক্ষা করুন। সেখানকার পুলিশ বলল, চারটায় গেট খোলা হবে।

আমাদের আসার আগেই বিশাল চত্বরে অনেক লোক এ উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছে। চারটা বাজার ৩ মিনিট আগে আযান শুরু হলো। আযান অর্ধেক হয়ে গেল; কিন্তু গেট খুলল না। পুলিশ বলল, অন্য সব গেট খুলে গেছে। আমাদের সাথে তুরস্ক ও পাকিস্তানের কতক

৮

লোক ছিল। তারা অন্য গেটের দিকে দৌড়াল। আমার হুইল চেয়ার ঢুকলে দেখা গেল, রওযাতুল জান্নাত পূর্ণ হয়ে গেছে। এর চার কাতার পেছনে জায়গা পাওয়া গেল। আধ ঘণ্টা আগে এসেও ভাগ্যে জুটল না বলে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলাম।

আমাদের উপর দিয়ে বহু লোক ভেতরে ঢুকে ঠাসাঠাসি করতে লাগল। আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না বলে চরম অতৃপ্তি নিয়েই ফজরের পর হোটেলে ফিরে গেলাম। জুমুআর নামাযের পর খেয়ে বিকাল সাড়ে তিনটায় জেদ্দা রওয়ানা হলাম। মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব একটানা গাড়ি চালালেন। পাঁচ ঘণ্টা পর জেদ্দায় যখন পৌঁছলাম তখনো গাড়ি চালককে ক্লান্ত মনে হলো না।

মামূনকে বললাম, তুমি তো প্রতি বছরই একবার তোমার বাসায় আসার জন্য আবদার জানাও। আমি সফরের ধকল এড়াতে চাই। কিন্তু এবার যে অতৃপ্তি নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হলাম এর ফলে মন চাচ্ছে, যদি আল্লাহ তাআলা তাওফীক দেন তাহলে আগামী বার আসতে পারলে মদীনা শরীফে একটানা ৭/৮ দিন থাকতে হবে। এক বৃহস্পতিবারে দিয়ে আসবে, পরের বৃহস্পতিবারে গিয়ে জুমুআবারে নিয়ে আসবে। মামূন শুনে খুশি হয়ে ওর মাকে বলল, আব্বা আগামী বছর আসার ওয়াদা করলেন। তখন আমার স্ত্রী খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল।

৩১৩.

রিয়াদ সফর

স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে আমি ইদানীং সফর করতে চাই না। দায়ে ঠেকে প্রতি বছর ইংল্যান্ড যেতে বাধ্য হই। ঐ একই কারণে এবার জেদ্দায় গেলাম। মক্কা-মদীনার কথা তো আলাদাই। দায়ে ঠেকে জেদ্দায় ছেলের বাসায় গেলেও রূহের টানে মক্কা-মদীনায় যেতে সফরের কষ্ট বোধ হয়নি। এটা ঈমানী আবেগের ব্যাপার।

রিয়াদের দীনী ভাইদের অব্যাহত দাবিতে আমি শেষ পর্যন্ত রাজি হতে বাধ্য হলাম। ১ এপ্রিল ২০০৭ বিমানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নাশতার পর রওয়ানা হলাম। নোয়াখালীর মাওলানা আবদুল মালেক সাথে গেলেন। সাত বছর পর দেশে যাওয়ার জন্য তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। ছুটিকালীন সময়ে তিনি আমার সফরসঙ্গী হলেন। রিয়াদ সফরে সর্বক্ষণ তিনি আমার খিদমতে লেগে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর প্রতিদান দিন– এ দোআই করি। জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছতেই সেখানে কর্মরত ছয়-সাত জন বাংলাদেশি আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। তাদের গায়ে পরিচিতিমূলক বিশেষ ফতুয়া আছে। এরা বহু ধরনের কাজ করে। এ জাতীয় কাজের জন্য অন্য দেশি কর্মচারীও আছে; কিন্তু ক্লিনার যারা তারা সবাই বাংলাদেশি। তাদের ইউনিফর্ম ভিন্ন। গা-জামা ও পা-জামা মিলে গেরুয়া রঙের একটা বিশেষ পোশাক তাদের। হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করার দুটো হাতিয়ার– একটা লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ, অপরটি ব্রাশ দিয়ে আবর্জনা তুলে আনার পাত্র।

ফতুয়া পরা একজন আমার জন্য হুইল চেয়ার এনে বসালেন। এয়ারপোর্টের ফর্মালিটি তিনিই সমাধা করালেন এবং আমাকে প্রথম শ্রেণীর লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন। আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিটই ছিল। আমার সাথীর টিকিট ইকনমি ক্লাসের। হুইল চেয়ার বহনকারীর পরিচয় নিলাম। নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় বাড়ি। নাম মুহাম্মদ রফীউদ্দীন। মুখে খুব ছোট আকারের দাড়ি। তার আবেগ ও আন্তরিকতা থেকেই ধারণা হলো যে, দীনী ভাই-ই হবে। পরিচয় নিয়ে নিশ্চিত জানলাম।

বিকাল দুটোয় রিয়াদ বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। জেদ্দা থেকে রিয়াদের দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটার। সোয়া ঘণ্টা উড়ে বিমান পৌঁছল। এক দীনী ভাই (নামটা নোট করা উচিত ছিল) নিজের গাড়িতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে গেলেন। জেদ্দার মতো রিয়াদ বিমানবন্দরেও প্রচুর বাংলাদেশি কর্মরত। সেখানেও এক ফতুয়া পরা বাংলাদেশি আমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

আমাকে কোনো হোটেলে রাখা হয়নি। কোনো পরিবারেও থাকার ব্যবস্থা করা হয়নি। যেখানে ছিলাম তা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এক কামরাবিশিষ্ট একটা ফ্ল্যাট। শোয়ার জন্য একটা সিঙ্গল সিট। আট-দশ জন বসার মতো সোফা। লেখা-পড়া করার জন্য টেবিল। বাথরুম ও ছোট্ট কিচেন। কাপড় রাখার ওয়ার্ডরোব ইত্যাদি সবই আছে। এয়ার কন্ডিশন তো অবশ্যই আছে।

জানতে চাইলাম, এমন একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে কেউ কি সস্ত্রীক থাকতে পারে? জানা গেল, ঐ বিল্ডিং-এ তিন শ'য়েরও বেশি ফ্ল্যাট রয়েছে। কেউ পরিবার নিয়ে থাকে না। সবই ব্যাচেলার্সদের জন্য। আশপাশের ফ্ল্যাটে দীনী ভাইয়েরা থাকেন। তাদের মেহমানদের জন্য এ ফ্ল্যাটটি রেখেছেন। দীনী মেহমান গেলে এখানেই থাকেন। আমি যাওয়ার আগে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কয়েক দিন ছিলেন। বাংলাদেশিদের জন্য ওয়ায-মাহফিলের ব্যবস্থা করায় তাঁকে রিয়াদ যেতে হয়। সরকারি দাওয়াহ বিভাগ থেকেও মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। মাওলানার ওয়াযে হাজার হাজার মানুষকে এত উৎসাহ ও আবেগের সাথে হাজির হতে দেখে তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে মাহফিলের ব্যবস্থা করেন। বেসরকারি উদ্যোগে এত বড় মাহফিল সে দেশে হয় না।

প্রতি বেলার খাবার ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি কী কী খাবার পছন্দ করি তা তারা জেনে নিলেন। সাদা ভাত (পোলাও নয়), শাক-সবজি, ছোট মাছ, ডাল, ফল ইত্যাদি আমার পছন্দ; কিন্তু এতে মেজবানদের তৃপ্তি হয় না। তারা বড় মাছ, মুরগি, গরু, খাসি ইত্যাদিও নিয়ে আসেন। আমার পছন্দমতো খাবার খাওয়ার পর উপস্থিত অন্য ভাইদেরকে নিয়ে মেজবানরা খান। মেজবানের সন্তুষ্টির জন্য গোশত থেকে সামান্য হলেও নিতে বাধ্য হই।

বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল দেখার ব্যবস্থা করায় দেশের খবরাখবরও জানার সুযোগ পেলাম।

দীনের চর্চা

আমার নিকট থেকে দীনের কথা শোনার উদ্দেশ্যেই দীনী ভাইয়েরা আমাকে যেতে বাধ্য করেন। আমার পরামর্শ মোতাবেক বাছাই করা ৫০/৬০ জনের সাথে দু দিন বৈঠক হয়। প্রতি দিন ইশার নামাযের পর রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত স্টাডি সার্কেল পদ্ধতিতে দীনের কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাদেরকে আমি সাপ্তাহিক ছুটির দিন দিতে পারিনি বলেই রাতে প্রোগ্রাম করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

তাঁরা একটা কমিউনিটি সেন্টারের হল ভাড়া করে নিয়েছিলেন, যেখানে শ' খানিক লোক বসতে পারে। দ্বিতীয় দিন তাঁরা দাবি জানালেন যে, আরেকটা দিন যেন থাকি আমি। তাঁরা হাজারখানেক লোকের সমাবেশ করতে চান। হলের বাইরে দেয়ালঘেরা খোলা ময়দানেই সমাবেশ করা যাবে বলে জানালেন।

আমার সাথে কথা ছিল ১ এপ্রিল (২০০৭) রিয়াদ পৌঁছব এবং ৩ তারিখে জেদ্দা ফিরে যাব। ৬ তারিখে ৫ তারিখে মক্কা শরীফ যেতে হবে। ৬ তারিখে ঢাকা রওয়ানা হতে হবে। কিন্তু তাঁদের আবদারে আরো এক দিন থাকতে হলো। ৪ তারিখ খুব সকালের বিমানে ফিরলাম।

আলোচ্য বিষয়

বাছাই করা ভাইদের মধ্যে দু দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ে আমার লেখা বই রয়েছে। বইগুলোর নাম থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

১. 'মযবুত ঈমান'– ঈমানের বাস্তবধর্মী সংজ্ঞা, ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের ধরন, ঈমানের দুর্বলতার কারণ, মযবুত ঈমানের শর্তাবলি।

২. 'সহীহ্ ইলম ও নেক আমল'– জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস, সহীহ্ ইলমের মূল ওহী, কতটুকু ইলম হাসিল করা ফরয, নফল ইলম হাসিলের মর্যাদা, পার্থিব সকল জ্ঞানের শরয়ী মর্যাদা ইত্যাদি।

   নেক আমল মানে কী, কর্মের ময়দানে মানুষকে কতটুকু ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, কর্মসম্পাদনের ইখতিয়ার দেওয়া হয়নি, এটা আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে মানে এটাই তাকদীর। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কাজের চেষ্টা করলেই কর্মটি সমাধা না হলেও আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। সহীহ নিয়ত ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না এবং মৃত্যুর পরও আমল জারি থাকে।

৩. 'আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি'– পৃথিবীতে মানুষকে খলীফা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। খলীফার দায়িত্বটা কী? দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েমের পদ্ধতি কী?

৪. 'কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের চার দফা কর্মসূচি'– এ বিষয়ে সূরা হাজ্জ-এর ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫. 'রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা'– কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, তিনিই সকল রাজত্বের মালিক। তিনি যাকে খুশি ক্ষমতায় বসান, যাকে চান ক্ষমতাচ্যুত করেন। আল্লাহর এ ভূমিকার ব্যাখ্যা কী? যে নীতি অনুযায়ী ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়ে থাকে, তা আল্লাহর খিলাফত কায়েমের বেলায় প্রযোজ্য নয়। যারা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে চায়, তাদের বেলায় পৃথক পাঁচ দফা নীতি রয়েছে। যারা আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায় তাদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৬. 'রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন?'– এ বিষয়ে সূরা তাওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা ফাত্হ-এর ২৮, সূরা সাফ-এর ৯, সূরা শুআরার ১৩ ও সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতের আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলগণকে শুধু ধর্মনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিয়েই রাসূলগণ এসেছেন। অন্য কোনো জীবনবিধানের অধীনে আল্লাহর দীন চালু থাকতে পারে না। শুধু ধর্ম হিসেবে ইসলাম অনৈসলামী সমাজেও টিকে থাকতে পারে বটে; কিন্তু দীন হিসেবে পারে না।

তৃতীয় দিনের বিষয়

খোলা ময়দানে প্রায় ৯০০ পুরুষ ও পাশের বিল্ডিং-এ প্রায় শ' খানেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাদের জন্য উপযোগী মনে করে কয়েকটি কথা বললাম :

১. যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর দিকে ডাকার তাওফীক দিয়েছেন, তারাই সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান। আল্লাহর দিকে ও আল্লাহর দীনের পথে মানুষকে আহ্বান করার কাজ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। সূরা হা-মীম সাজদাহ্-এর ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা বেশি ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল যে 'নিশ্চয়ই আমি মুসলিম।'

   আসমানের নিচে ও জমিনের উপরে আল্লাহ তাআলার নিকট এ কাজের মর্যাদা সর্বোচ্চ। তিনি এ কাজের জন্যই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যারা এ কাজ করেন, তারা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ।

   যখন কেউ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো লোকের নিকট হাজির হন, তখন তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তিনি কিছু চাইতে যাননি, তিনি অমূল্য জিনিস দান করতে গিয়েছেন। যার কাছে গেলেন, তিনি দুনিয়ার দৃষ্টিতে অনেক বড় হতে পারেন; কিন্তু দা'ঈ হিসেবে যিনি তার কাছে গেলেন, তিনি দুনিয়ার দৃষ্টিতে যত নিম্ন মানেরই হন, তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখবেন। কারণ, তিনি কোনো পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য যাননি। দাওয়াত কবুল করা বা না করা তার নিজের ইখতিয়ার। কবুল না করলেও দাঈকে সম্মানের পাত্রই মনে করা হয়।

এ দাওয়াত এমন সাদাকায়ে জারিয়া, যার ফসল কিয়ামত পর্যন্ত জমা হতে থাকে। কেউ দাওয়াত কবুল করলে তিনি সারা জীবনে যত নেকী কামাই করবেন, তা দা'ঈর আমলনামায়ও শামিল হবে। এমন লাভজনক ব্যবসায়ের ব্যাপারে কোনো বুদ্ধিমানই সামান্য অবহেলা করতে পারে না।

২. আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে আখিরাতের সাফল্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য হয়। দুনিয়ার উন্নতি যেন আখিরাতের সাফল্যের উপর প্রাধান্য না পায়। দুনিয়ার উন্নতি অবশ্যই কাম্য; কিন্তু সে উন্নতি যেন আখিরাতকে অবহেলা করতে বাধ্য না করে। 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানা'র অর্থ বুঝতে হবে। আখিরাতের হাসানা লাভ করার লক্ষ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করার পর এ লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে যা যা করা প্রয়োজন, তা-ই দুনিয়ার হাসানা। এ লক্ষ্য ভুলে গিয়ে দুনিয়ার কোনো উন্নতিই মুমিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে মানুষের ভালোবাসার জন্য দুটো তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথম তালিকায় আটটি ও দ্বিতীয় তালিকায় তিনটি রয়েছে। প্রথম তালিকায় পিতামাতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ, আয়ের উৎস ও বসতবাড়ি। দ্বিতীয় তালিকায় আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ (ইসলামী আন্দোলন)। আখিরাতে কামিয়াবি হাসিল করতে হলে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ঐ আটটির ভালোবাসা পরের তিনটির চেয়ে বেশি হয়ে না যায়। মুমিনের জন্য এটাই আত্মসমালোচনার প্রধান বিষয়। এ বিষয়ে হিসাব করা খুবই সহজ। ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার পথে ঐ আটটি জিনিসের ভালোবাসায়ই আসল বাধা। তবে ঐসবকে ভালোবাসাও কর্তব্য; কিন্তু পরের তিনটির ভালোবাসার চেয়ে যেন পরিমাণে বেশি হয়ে না যায়।

পানির অপর নাম জীবন। এ কথাটি প্রবাদ বাক্য। কিন্তু পানিতে ডুবে মানুষ মরে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পানিই জীবন, পানিই মরণ। পরিমাণের উপরই তা নির্ভর করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি অবশ্যই জীবন। এর বেশি হলে পানিই আবার মরণ।

ঈমানের জীবন ও মরণ ঐ আটটি জিনিসের ভালোবাসার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আটটির ভালোবাসা তিনটির চেয়ে বেশি হলে ঈমানের মরণ। তিনটির ভালোবাসা আটটির চেয়ে বেশি হলে ঈমানের জীবন।

৩. আল্লাহ তাআলার সাথে মুমিনের সম্পর্কের চেতনা সদা জাগ্রত রাখতে হবে। সূরা নাস-এ আল্লাহ স্বয়ং তিনটি সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি যদি মুমিন হই তাহলে আল্লাহ আমার রব, বাদশাহ ও ইলাহ।

ক. 'রব' মানে লালন-পালনকারী। মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে আজকের এ মুহূর্ত পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহই আমাকে লালন-পালন করছেন। আমার হৃৎপিণ্ড তিনিই চালু রেখেছেন, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস তিনিই জারি রেখেছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি আমার রব। গীতিকার তোফাজ্জল হোসাইনের কথাটি কত চমৎকার! 'আল্লাহ আমার রব, এ রবই আমার সব, দমে দমে তনুমনে তাঁরই অনুভব।' এ চেতনা ও অনুভবেরই অভাব। আল্লাহ তো সবারই রব। নাস্তিকেরও তিনি রব; কিন্তু তার সে চেতনা নেই। মুমিনের চেতনায় সব সময় এ অনুভব জাগরূক থাকা উচিত।

কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে আল্লাহ 'ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকা' বলে রব হিসেবেই পরিচয় দিলেন। প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণ সূরায় 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলেও সেই একই পরিচয় দিলেন। নামাযে রুকূ' ও সিজদায় 'আমার রব' বলে আবেগ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে এ সম্পর্কের চেতনা এক মুহূর্তও হারিয়ে না যায়। তিনি রাব্বুল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও নামাযে 'আমার রব' বলতে শিখিয়েছেন। কারো মাঝে এ চেতনা জাগরূক থাকলে তার পক্ষে অকৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক নয়।

খ. তিনি আমার বাদশাহ। তাঁর রাজত্বের বাইরে যাওয়ার কারো সাধ্য নেই। আমি যদি শান্তি চাই তাহলে আমার বাদশাহকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তিনিই শান্তি দেওয়ার মালিক। তিনি শান্তির যে পথ দেখিয়েছেন ঐ পথ ছাড়া শান্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তিনি আমার দয়াবান বাদশাহ, আর আমি তাঁর অনুগত প্রজা। এ চেতনা সদা জাগ্রত থাকা অত্যাবশ্যক।

গ. তিনি আমার ইলাহ। ইলাহ অর্থ উপাস্য বলেই মনে করা হয়। উপাস্য মানে উপাসনার পাত্র বা পূজ্য। আল্লাহর সাথে কি শুধু উপাসনার সম্পর্ক? উপাসনার বাইরে কি কোনো সম্পর্ক নেই। আমি পূজক, আর তিনি পূজার দেবতা মাত্র?

'ইলাহ' শব্দকে এক শব্দে বাংলায় সঠিক অর্থে প্রকাশ করা যায় না। ইলাহ অর্থ মাবুদ। 'আবদ' মানে দাস, মাবুদ মানে যার দাসত্ব করা হয় অর্থাৎ মনিব। মনিব হুকুম করে, আর দাস হুকুমের গোলাম। এ হিসেবে ইলাহ মানে হুকুমকর্তা। শুধু হুকুমকর্তা শব্দটি যথেষ্ট নয়। কারণ, মানুষকেও হুকুমকর্তার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই ইলাহ মানে হুকুমকর্তা প্রভু। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো হুকুমকর্তা প্রভু নয়। 'ইলাহ' শব্দের সঠিক অর্থ পেতে হলে হুকুমকর্তার পূর্বে আরো একটি শব্দ যোগ করতে হবে– 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'। একমাত্রই বলতে হবে। কারণ, তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুমই মানা চলে না। অন্য সকল হুকুমকর্তার হুকুম ইলাহর হুকুমমতোই

মানতে হয়। তাই প্রকৃত হুকুমকর্তা একজনই। তাই ইলাহ মানে একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু।

এভাবে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে আল্লাহর সাথে মুমিনের যে সম্পর্ক, এর চেতনা যত বেশি জাগ্রত থাকবে ততই মনে পরম তৃপ্তিবোধ হবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার স্বাদ অনুভূত হবে। তখন দুনিয়ার কোনো আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের কারণে মনে পেরেশানি ও অস্থিরতা দেখা দেবে না। কারণ, মুমিন জানে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো মুসিবতই আসে না।

আল্লাহ তাআলার সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ও উপলব্ধির প্রধান মাধ্যম হলো নামায। এ নামাযকে জীবন্ত নামাযে উন্নীত করতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, 'তোমরা যখন সিজদায় থাক তখন আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যাও। তখন বেশি বেশি দোআ করো।' পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে দীর্ঘ সিজদা করার সময় কোথায়? এর জন্য তাহাজ্জুদেই মহাসুযোগ।

'আল্লাহর দরবারে ধরনা' নামক বইটিতে কুরআন ও হাদীস থেকে আমি অনেক দোআ সংকলিত করেছি। বইটিতে তাহাজ্জুদ সম্পর্কে কয়েকটি চমৎকার হাদীস উদ্ধৃত করেছি, যার একটির অনুবাদ হলো, 'রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য, আগের গুনাহের কাফ্ফারা এবং গুনাহ করা থেকে বিরত রাখার উপায়।'

৪. মুমিনের অন্তরে একটি ভাবনা সদা সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। তা হলো, আমি আল্লাহর সৈনিক। তিনি আমার শাহ-রগের চেয়েও নিকটে আছেন। আমি তাঁর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট সবকিছু করার তাওফীক চাই। আমি অন্য কোনো শক্তির পরওয়া করি না। তাঁর নিকট ফিরে যাওয়ার পথই মৃত্যু, যা নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। তাই মৃত্যুকে ভয় করা বোকামি ও অর্থহীন। শাহাদাতের মৃত্যুই আমার কাম্য, যাতে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যায়। যার অন্তরে এ ভাবনা জাগ্রত, আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোনো ভয়ই তার থাকতে পারে না। এ অনুভূতি যার আছে, সে-ই সবচেয়ে সাহসী মানুষ।

৫. আল্লাহর ব্যাংকে আমার যে একাউন্ট আছে, তাতে বেশি বেশি জমা রাখার জযবা মুমিনের জন্য সেরা সম্পদ। সেখানে যা জমা করা হয় তা-ই আমার নিজের সম্পদ। যা দুনিয়ায় রেখে যাব তা ওয়ারিশদের সম্পদ। রাসূল (স) বলেন, "আদমসন্তান কেবল 'আমার' 'আমার' দাবি করে। তোমার ততটুকুই, যা খেয়েছ ও হজম করেছ, যে জামা পরেছ ও যা ছিঁড়ে গেছে এবং যা আল্লাহর পথে খরচ করেছ।" এ পয়েন্টটি আমি প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু রিয়াদের ঐ সমাবেশে এ কথাটি বলতে মনে নেই। পত্রিকা থেকে তাঁরা তা পেয়ে যাবেন।

সৌদি আরবে ঢেঁকির দায়িত্ব

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' প্রবাদটি উল্লেখ করে ইতঃপূর্বে লিখেছি, ২০০৬ সালে লন্ডনে আমাকে ঢেঁকির দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ঢেঁকির একই কাজ। ঢেঁকি যার হাতেই পড়ে সে তার কাছ থেকে ঐ কাজই নেয়। আমি ১৯৭৮ সাল থেকে স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করে আসছি। পুরুষ, মহিলা, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক পৃথক স্টাডি সার্কেলে ইসলামের ব্যাপক ও গভীর চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এ চর্চাই আমাকে আলোচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে চটি চটি বই লেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করা ও বই লেখাই আমার নেশায় পরিণত হয়েছে। তাই বিদেশে গেলেও দীনী ভাইয়েরা আমাকে এ কাজে লাগান।

এবার সৌদি আরবে সাত সপ্তাহ থাকাকালে বেশি সময়ই জেদ্দায় ছিলাম। ওখানে পুরুষ, মহিলা ও ছাত্রীদের সাথে বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম হয়েছে। একটা বড় সমাবেশও হয়েছে। রিয়াদে বাছাই করা লোকদের বৈঠকের মতো এখানেও করা হয়েছে। বড় সমাবেশে ঐসব কথাই বলেছি, যা রিয়াদে বলে এসেছি।

মদীনায় পুরোপুরি একদিনও থাকিনি বলে বাছাই করা পুরুষদের একটা মাত্র বৈঠক হয়েছে। মক্কায় কয়েক বার গিয়েছি। বড় সমাবেশ হয়নি। বাছাই করা পুরুষদের দুটো ও মহিলাদের একটি বৈঠক হয়েছে। সকল বৈঠকেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। মক্কার মহিলা বৈঠকে এক বোন প্রশ্ন করলেন, 'জীবনে যা দেখলাম' পড়ে আপনার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলাম; কিন্তু আফিফা আযম ইসলামী আন্দোলনে জড়িত কি না তা লিখেননি কেন? জাবাবে বললাম, প্রশ্নটা নিয়ে যাচ্ছি, পরবর্তীতে লিখব, ইনশাআল্লাহ। ঐ প্রশ্নেরই জবাব এখন লিখছি :

পাকিস্তান আমলে মহিলা মহলে কাজ শুরুই হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মহিলাদের মধ্যে কাজের সূচনা হয়। আমি তখন বিদেশে আটকা পড়লাম। বেচারি সন্তানাদির পিতামাতার উভয় দায়িত্ব একাই পালনে ব্যস্ত। ১৯৭৬ সালে কোনো রকমে লন্ডন পৌঁছল। সাড়ে চার বছর পর আমার সাথে দেখা হলো। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে ঢাকা ফিরে এলাম। তখন মহিলা মহলে সংগঠন দানা বেঁধে উঠেছে মাত্র।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই আমার উপর আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব আসল। জামায়াত তখনো প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করেনি। সর্বপ্রথম জামায়াতের মহিলা শাখা ও ছাত্রীসংস্থার কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলাদেরকে নিয়ে স্টাডি সার্কেল শুরু করি। এক বছর পর উভয় সংগঠনের সম্প্রসারণের ফলে মহিলা ও ছাত্রীদের পৃথক স্টাডি সার্কেল চালু করতে হয়।

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে কাজ শুরু করলেও আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে আমীর হিসেবে প্রকাশ্যে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি।

মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে যাবতীয় প্রকাশ্য তৎপরতার দায়িত্ব পালন করতেন। আমি জামায়াতের মহিলা, পুরুষ, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক পৃথক স্টাডি সার্কেল পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করি।

বাড়ি-ঘর মোটামুটি সামলে নিয়ে আমার স্ত্রী সংগঠনে সক্রিয় হয়ে আশির দশকের প্রথম দিকেই রুকন হয়ে গেলেন। অসুস্থতা ও বার্ধক্যের কারণে কয়েক বছর আগে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আমার চেয়ে কম বয়স হলেও ১৯৯০ সালে তাঁর গলব্লাডার অপসারণের পর থেকে খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বাছাবাছি করতে বাধ্য হওয়ায় তিনি আমার চেয়ে বেশি বুড়িয়ে গেছেন। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন তৎপরতায় অংশ নিতে সক্ষম না হলেও সংগঠনের তহবিল সংগ্রহে সর্বদাই অত্যন্ত উৎসাহী।

৩১৪.

৩১৩ নং কিস্তি পর্যন্ত সৌদি আরব সফরের কথা সমাপ্ত হলো। ধারণা ছিল যে, ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করব; কিন্তু প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের বর্তমান মে ২০০৭ পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখা অপরিহার্য বলে মনে করছি।

বর্তমানে বাংলাদেশে চরম রাজনৈতিক সংকট চলছে। অনেকেই এটাকে রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল মনে করছেন। ক্রান্তিকাল মানে অবস্থার পরিবর্তনের সময়। কী ধরনের পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না বলে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিতই বলা যায়।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পরিচালিত কেয়ারটেকার সরকারের আয়োজিত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের চাপে এবং সেনাপ্রধানের উদ্যোগে নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের ১১ দিন পূর্বে জানুয়ারির ১১ তারিখ প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পদত্যাগ করেন এবং নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।

১২ জানুয়ারি (২০০৭) ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা ও এরপর নতুন ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী সরকারের পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মার্চের শেষদিকে সামরিক শাসন কায়েমের আশঙ্কা দেখা দেয়। ১২ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে ঐ আশঙ্কা দূর হয়। পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর ১ মে থেকে লেখা শুরু করলাম। সৌদি আরব সফর সম্পর্কে সর্বশেষ লেখাটি ১১ মে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। ১৮ মে থেকে দেশের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে আমার লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করতে হলে বর্তমান সংকটের পটভূমি আলোচনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই জন্মলাভ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়; পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব কায়েম করাই জনগণের আসল টার্গেট ছিল। দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জনগণ রাষ্ট্র থেকে পৃথক হতে চায় না। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রাধান্য লাভ করতে চায়।

জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিল। তাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণাও দিলেন। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হতে আগ্রহী ছিলেন বলেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইয়াহইয়া খানের সাথে ২৪ তারিখ পর্যন্ত সংলাপ চালিয়ে যান। ঐ সংলাপের বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডে ১০৭ নং কিস্তিতে লেখা হয়েছে।

শেখ মুজিব স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিলে পাকিস্তান সরকারের হাতে ধরা দিতেন না; ভারতে পালিয়ে যেতেন। যুদ্ধ ঘোষণা করে কোনো সেনাপতি দুশমনের হাতে স্বেচ্ছায় বন্দী হতে পারে না। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হাতে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সকল দাবি পূরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার কোনো পরিকল্পনা করেছিলেন বলে প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই।

মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে

বাংলাদেশের জনগণের উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য এক নম্বর অপরাধী মিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো। দু নম্বর আসামি জেনারেল ইয়াহইয়া খান। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কায়েম হলে নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী মি. ভুট্টো পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতার দায়িত্ব পেতেন। এক দেশে Two Majority Party নামে আজব তত্ত্ব পেশ করে তিনি ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার দাবি জানান। ঢাকায় ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপের সময় ভুট্টোকেও হাজির করা হয়। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে সংলাপে সিদ্ধান্ত নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া ব্যর্থ হন। ভুট্টোর অন্যায় দাবির পক্ষে তিনি ষড়যন্ত্র করে ব্যালটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বুলেট ব্যবহার করার ফায়সালা করে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধ করতে বাধ্য করেন এবং ভারতকে হস্তক্ষেপ করার মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দেন। ২০০৩ সালে আমি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলাম। আমি সেখানে স্পষ্টভাবে বলেছি, মি. ভুট্টো পাকিস্তানের বাদশাহ হওয়ার উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহইয়া খানের সাথে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে আমার বক্তব্য সমর্থন করেছে।

ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব

১৯৭০ থেকে '৭২ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিব এ দেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান করে নিয়েছিলেন। আর কোনো নেতা এ দেশে এ পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হননি। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম অযোগ্যতা ও তাঁর দলের লোকদের সীমাহীন দুর্নীতি ও অসততার ফলে তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিম্নগামী হতে হতে ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। সম্ভাব্য গণরোষ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গণতন্ত্র হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শেখ মুজিব আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করলেন। আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক দল বলে দাবি করে। অথচ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবের নির্দেশে জাতীয় সংসদে সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে 'বাকশাল' নামে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করে তিনি এক নায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, পার্লামেন্টে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের দলীয় এমপি। জেনারেল এজি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে এমপি হিসেবে পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ২৯০ জন এমপি-ই গণতন্ত্র হত্যার মহোৎসবে শরীক ছিলেন। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুখে যত দাবিই করুক বাস্তবে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হলেও ক্ষমতায় গিয়ে তারা গণতন্ত্র হত্যা করতে সামান্য দ্বিধাও করেন না। চরিত্রগতভাবে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট পার্টি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদলের উপর সন্ত্রাসী হামলা করা তাদের আদি ঐতিহ্য।

আগস্ট বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বাকশাল শাসনব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার উদ্দেশ্যে ৬১ জন গভর্নরের অভিষেক হওয়ার কথা ছিল। এর পূর্বের শেষ রাতে সেনাবাহিনীর ট্যাংক রেজিমেন্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে নিহত করে। হত্যাকারীরা কেউ রাজাকার ছিল না। যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

সেনাবাহিনী দেশরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত। সেনাবাহিনীর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শেখ মুজিবের গদি রক্ষায় নিযুক্ত রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তোলায় সেনাবাহিনী অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। বাকশাল ব্যবস্থায় সরকারি ক্ষমতা শেখ মুজিবের কুক্ষিগত হয়ে গেলে সরকার পরিবর্তনের অন্য কোনো উপায় থাকবে না। এসব বিবেচনা করেই সেনাবাহিনীর কতক জুনিয়র অফিসার এত বড় দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ব্যাপারটা বড়ই অলৌকিক মনে হয়। গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত রক্ষীবাহিনী, সেনাপ্রধান লে. জেনারেল সফিউল্লাহ এবং অন্যান্য জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারগণ, সরকারি গোয়েন্দা

বিভাগ, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি ইত্যাদি কেউ এত বড় ঘটনা ঠেকানো দূরের কথা, ঘটনার পূর্বে টেরও পেল না।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ক্ষমতাসীন বাকশালের নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, ২৯০ জন এমপি, দলের হাজার হাজার ক্যাডার, শেখ মুজিবের অগণিত ভক্তের কেউ দেশের কোথাও সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানোর হিম্মতও করতে পারল না। এটা বড়ই অস্বাভাবিক যে, যারা শেখ মুজিবের পক্ষে 'এক নেতা এক দেশ, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ' শ্লোগান দিয়েছে, যারা তাঁকে দেবতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র মনে করত, যারা তাঁর জন্য জান দিতে পারে বলে ধারণা ছিল, তারা কেমন করে এমন নিস্তব্ধ ও নীরব হয়ে গেল?

বিশ্লেষণ করলে এর কারণ একটিই বলে মনে হয়। মুজিব হত্যার সমর্থনে জনগণের মাঝে ব্যাপক, সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সর্বত্র জনগণ উল্লাস করেছে। কেউ ইন্নালিল্লাহ উচ্চারণ করেছে বলে জানা যায়নি। আমি তখন লন্ডনে। পরের দিন সেখানকার পত্রিকায় পড়লাম, 'ঢাকায় কারফিউ ছিল। দিনটি ছিল শুক্রবার। নামাযের জন্য দু ঘণ্টা কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। জনগণ দলে দলে রাজপথে বের হয়ে আসে। তাদের চেহারা ও ভাব-সাব দেখে মনে হলো, তারা কোনো জাতীয় উৎসব পালন করতে যাচ্ছে।' জনগণের এমন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কারো প্রতিবাদের সাধ্য ছিল না।

আমি ১৯৭৮ সালে লন্ডন থেকে ঢাকায় আসি। জনগণের উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি। প্রমাণিত হলো যে, জনগণ শোকের বদলে পরম স্বস্তি বোধ করেছে এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা সম্পূর্ণ খতম হয়ে গিয়েছিল।

খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসন

শেখ মুজিব হত্যার পর তাঁরই মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য খন্দকার মুশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হলেন। তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ মুশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। আওয়ামী লীগ এমপিগণের কেউ এ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেনি। জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের এমপিগণই মন্ত্রী হয়েছেন। মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে ৩ নভেম্বর (১৯৭৫) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ মুশতাক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করলেন এবং সেনাপ্রধান লে. জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে নিজে নিজেকে প্রমোশন দিয়ে সেনাপ্রধান হলেন; জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে সামরিক শাসন জারি করলেন।

খালেদ মুশাররফের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং মাত্র চার দিন পরই ৭ নভেম্বর তাঁকে হত্যা করা হলো। সৈনিকরা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে তাঁকে নিয়ে মিছিল করল এবং ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে

আসল। ঢাকার রাজপথে সিপাহি-জনতার ঐতিহাসিক সংহতি প্রকাশ পায়। এ ইতিহাস অবিস্মরণীয়। সিপাহি-জনতার বিপ্লবের ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলেন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় পতিত হয়।

বহুদলীয় রাজনীতির সূচনা

খালেদ মুশাররফের কায়েম করা সামরিক শাসনের উত্তরাধিকারী হলেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন পায়। তখন সংসদে বা রাজপথে তারা শেখ মুজিব হত্যার দাবি তোলেননি। শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে আওয়ামী লীগকে তাতে বিলীন করে দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের কোন্দল চরমে পৌঁছলে ১৯৮১ সালে ড. কামাল হোসেনের প্রস্তাবে সবাই একমত হয়ে মুজিবকন্যা শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির আশ্রয় থেকে নিয়ে এসে ১৭ মে দলের নেতৃত্বে বসিয়ে দেওয়া হয়। কোন্দলরত নেতৃবৃন্দ হয়তো ধারণা করেছিলেন, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ শেখ হাসিনা তাদের নিয়ন্ত্রণেই চলবেন। শেখ হাসিনা যাদেরকে চাচা ডাকতেন সে বয়সের নেতারাও ধারণা করতে পারেননি যে, শেখ হাসিনা তার পিতার মতোই দলে স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করবেন। শেখ হাসিনার দাপটে ড. কামাল হোসেন পর্যন্ত দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। ফলে অন্য কোনো নেতা মাথা তুলতে সাহস করেননি।

জিয়া হত্যা ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার মাত্র তেরো দিনের ব্যবধানে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহীরা প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করল। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহি জনতার 'হিরো' জিয়াউর রহমানের জানাযায় সিপাহিজনতার ঢল প্রমাণ করেছে যে, তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। জিয়া হত্যা ও মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়ায় কী বিশাল পার্থক্য! ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট জিয়ার জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে ১ কোটি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিজয়ী হলেন। জিয়ার বিরাট জনপ্রিয়তার কারণে স্বয়ং শেখ হাসিনা প্রার্থী হলেও পরাজিত হতেন। নির্বাচনী পোস্টারে একপক্ষে শেখ মুজিবের ফটো ও অপরপক্ষে জিয়ার ফটো বড় করে দেওয়া হয়। প্রার্থীদের ফটো ছোট– যেন দুই নিহত নেতার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। নির্বাচনে আবার প্রমাণিত হলো যে, জনগণের নিকট শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যাত।

সেনাপ্রধানের ক্ষমতা দখল

শাসনতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার শপথ নিয়ে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শাসনতন্ত্রকে মুলতবি করে সামরিক শাসন জারি করলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া বিশ্বস্ত মনে করে এরশাদকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। মাত্র ৪ মাস আগে বিপুল ভোটাধিক্যে জনগণ প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করেছিল। ধুরন্ধর সেনাপ্রধান অস্ত্রের মুখে দুর্বলমনা প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করে এরশাদের নিকট স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য করলেন।

জেনারেল আইয়ুব খানের মতোই জেনারেল এরশাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতালিপ্সু সুবিধাবাদীদেরকে নিয়ে নিজস্ব দল গঠন করে প্রায় ৯ বছর স্বৈরশাসন জারি রাখতে সক্ষম হলেন।

১৯৯০ সালের অক্টোবরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে ডিসেম্বরের শুরুতে সকল ছাত্রসংগঠন আন্দোলনে শরীক হলো। এমন এক প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে যে, সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসকের পক্ষ অবলম্বন করতে সম্মত হয়নি। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রমাণিত হলো যে, রাজনৈতিক দলসমূহ গণতন্ত্রের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হলে সর্বস্তরের জনগণ বিপুলভাবে সাড়া দেয়।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন

এরশাদের পদত্যাগের পর কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা অনুযায়ী কর্মরত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সরকার গঠন করলেন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এ নির্দলীয় সরকার বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অবাধ, সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হয়েছেন, যা দেশের সকল মহলে এমনকি বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে।

৭৫টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য চারটি দল হলো বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করার স্বপ্ন দেখেছিল।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, বিএনপি ১৪০, আওয়ামী লীগ ৮৮, জাতীয় পার্টি ৩৫ ও জামায়াত ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। বিএনপি জামায়াতের নিঃস্বার্থ সমর্থনে সরকার গঠন করল। শেখ হাসিনা তাঁর পরাজয়ের জন্য সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ করলেন। প্রমাণিত হলো, নির্বাচনে পরাজিত হলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ফলাফল বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় না।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আবার আন্দোলন

১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণেই বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়েছে। এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হলে কি বিএনপি ক্ষমতা পেত? অথচ বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত না হওয়ায় ১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিতে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে একটানা আন্দোলন চলেছে। আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি প্রায় তিন বছর একসাথে যুগপৎ আন্দোলন করেছে। শেখ হাসিনাই এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭ম সংসদ নির্বাচন

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসনে বিজয়ী হয়ে এরশাদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হলো। নির্বাচনী অভিযানে শেখ হাসিনা তার দলের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্য কেঁদে কেঁদে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে জনগণের নিকট ভোট ভিক্ষা চেয়েছেন; ওমরা করে মাথায় ইহরামের পট্টি বাঁধা অবস্থায় হাতে তসবিহ নিয়ে একটি বার ক্ষমতায় বসিয়ে পরীক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন। শেখ মুজিবের কুশাসন যারা দেখেনি এবং ১৯৭৫ সালের ২০ বছর পর যারা ভোটার হয়েছে, তারা হয়তো সরল বিশ্বাসে তাকে ভোট দিয়েছে।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর

১৯৯৬ সালের জুন থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত ৫ বছর তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। 'শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর' শিরোনামে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে আমার লেখা বইটি 'গরম পিঠা'র মতো দ্রুত বিক্রি হতে থাকে। তাই ২০০৫ সালের জানুয়ারি ও এপ্রিলে আবার মুদ্রিত হয়েছে। তাতে আমি প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে প্রমাণ করেছি যে, শেখ মুজিবের কুশাসনের চেয়েও তিনি উন্নত মানের(!) দুঃশাসন চালিয়েছেন।

নির্বাচনী অভিযানে তিনি জনগণের নিকট তার পিতা হত্যার বিচার এবং তার পিতাকে জাতির পিতার মর্যাদা দেওয়ার দাবি তোলেননি। অথচ ক্ষমতায় গিয়ে তিনি এ দুটো বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন। মুজিব হত্যাদিবসে জনগণ উল্লাস করা সত্ত্বেও তিনি সরকারিভাবে ঐ দিন শোক দিবস পালন করলেন। মুজিব হত্যাকারীদেরকে জনগণ স্বৈরশাসন থেকে নাজাতদাতা মনে করা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ আদালতে বিচারের প্রহসন করলেন।

তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে মান্য করার জন্য আইন করে মাদরাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ মুজিবের ফটো স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। শক্তি প্রয়োগ করে শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না। যেসব স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমলে কায়েম

হয়নি, সেসবের নামের সাথে তার পিতার নাম যুক্ত করে নির্লজ্জতার পরিচয় দিলেন। তার শাসনামলে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তার পিতার নাম যুক্ত করলে কেউ হয়তো আপত্তি করত না।

ক্ষমতাসীন থাকাকালে তার আচরণ থেকে মনে হয়েছে যে, তিনি বাংলাদেশকে তার পৈতৃক সম্পত্তি মনে করতেন। তা না হলে গণভবনের মতো সরকারি স্থাপনাকে তার ব্যক্তিগত মালিকানায় গ্রহণ করার মতো ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। যতদিন রাজনীতি করবেন, গণভবনেই থাকবেন বলে ঘোষণা দিতে লজ্জাবোধ না করা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উৎখাত করা হয়েছে। এ সংবিধান সমুন্নত রাখার শপথ নিয়ে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছু দিন পরই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই তার আদর্শ বলে ঘোষণা করলেন। এ কুফরী আদর্শ জোর করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষাকে সংকুচিত করলেন এবং আলেম সমাজের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি অভিযান চালালেন।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের শীর্ষ নেতাগণ ঐক্যবদ্ধ হলেন এবং একসাথে আন্দোলন, একসাথে নির্বাচন ও একসাথে সরকার গঠনের ঘোষণা দিলেন।

শেখ হাসিনার দুঃশাসন থেকে রক্ষা পাওয়ার উদেশ্যে জনগণ ঐ চার দলীয় ঐক্যজোটকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছে এবং ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২১৭টি আসনে বিজয়ী করেছে।

৩১৫.

শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিলেন না

৮ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাত্র ৬২টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। অথচ ৭ম সংসদ নির্বাচনে তারা ১৪৬টি আসন পেয়েছিল। নির্বাচনে এ বিরাট পরাজয়ের আসল কারণ কী, তা উপলব্ধি করতে শেখ হাসিনা ব্যর্থ হলেন। তার ৫ বছরের দুঃশাসনের কারণেই যে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কথা যদি বুঝতে পারতেন তাহলে তিনি এমন কর্মসূচি নিয়ে জনগণের দুয়ারে ধরনা দিতেন, যাতে আবার জনগণের আস্থা অর্জন করে পরবর্তী নির্বাচনে সুফল পেতে পারেন।

তিনি নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন; নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপি' করা হয়েছে বলে দাবি করলেন। এ দাবির পক্ষে তিনি কোনো যুক্তি দেখাতে পারেননি। নির্বাচনের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি প্রচারমাধ্যমের নিকট নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করলেন; অথচ ফলাফল প্রকাশের পর কারচুপির অভিযোগ করলেন।

নির্বাচনকালে তারই দলের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদ, সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধানকে তারই পরামর্শে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সংবিধান অনুযায়ী সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন। সচিবালয় থেকে জেলা প্রশাসক পর্যন্ত প্রশাসনকে শেখ হাসিনা যেভাবে সাজিয়ে রেখে গেলেন, সঙ্গত কারণেই কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রশাসনে রদবদল করেছে। এটা সাংবিধানিক ইখতিয়ার।

ভোটকেন্দ্রে কোনো অনিয়ম হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টরা কোনো অভিযোগ করলেন না। স্বয়ং শেখ হাসিনা নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে নির্বাচনের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাহলে স্থূল কারচুপি কিভাবে হলো? নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের নিকট দাবি জানালে প্রেসিডেন্ট সম্মত হননি।

দেশি ও বিদেশি সকল নির্বাচনপর্যবেক্ষক উক্ত নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। একমাত্র শেখ হাসিনা ভিন্নমত প্রকাশ করলেন। প্রেসিডেন্ট, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, সেনা ও পুলিশপ্রধানকে তিনি তার স্বভাবসুলভ অশালীন ভাষায় নির্বাচনে তাকে পরাজিত করার জন্য দায়ী করলেন।

প্রমাণিত সত্য যে, অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে উপরিউক্ত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের কারচুপি করার কোনো সুযোগ নেই। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে কারচুপি হয় বলে সবাই জানে। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিতে ভোটাররাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়। তাই শেখ হাসিনার নিযুক্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচন পরিচালনা করা সত্ত্বেও চারদলীয় জোট বিশাল বিজয় লাভ করে।

শেখ হাসিনা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না বলে ঘোষণা করেছিলন। তার দলীয় এমপিগণকে শপথ নিতে বিলম্বিত করতে সক্ষম হলেও ঠেকাতে না পেরে তিনিও তাদের সাথে শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। শপথ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্ব পালন না করে তার দলকে সংসদে অনুপস্থিত রেখেছেন। সংসদের কার্যদিবসের ৯০ দিন একটানা অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ শূন্য হয়ে যায়। তাই সদস্যপদ রক্ষার জন্য বছরখানেক পর তারা সংসদে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন। তারা সংসদে অনুপস্থিত থাকাকালেও বেতন-ভাতা নিয়েছেন।

উপরিউক্ত আচরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। সংসদের ভেতরেও তারা গণতান্ত্রিক আচরণ করেন না। স্পিকারের আসনের সামনে গিয়ে হৈচৈ করা ও ফাইল ছুড়ে মারা তাদের গণতন্ত্র।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদেশে শেখ হাসিনার অপপ্রচার

শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য এত প্রবল আগ্রহী ছিলেন যে, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর জন্য তিনি যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত করা এবং তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নিতে জনগণকে বাধ্য করার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে এমন 'আজব রাজনীতি' শুরু করলেন, যা কোনো দেশপ্রেমিক করতে পারেন না।

তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত সফরে গিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অপপ্রচার চালালেন, যা সুস্পষ্ট রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা হিসেবে গণ্য। যেমন–

১. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চরম নির্যাতন চলছে, যার ফলে হাজার হাজার হিন্দু ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের পত্রিকা এ কথা ফলাও করে প্রচার করল। ভারতে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহলকে এর দ্বারা উসকিয়ে দেওয়া হলো, যাতে তারা ভারতে মুসলিম হত্যার অজুহাত পেয়ে যায়। ঐ সময়ে গুজরাট রাষ্ট্রের আহমদাবাদের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাইকারিভাবে মুসলিম গণহত্যা চালাল। শেখ হাসিনা কখনো এর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেননি।

২. বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটে ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামী শরীক থাকায় শেখ হাসিনা এ সরকারকেও সাম্প্রদায়িক সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করে আমেরিকাকে উসকিয়ে দিতে চাইলেন, যাতে আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে আমেরিকা শেখ হাসিনাকে হামিদ কারজাইয়ের মতো ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়।

৩. বাংলাদেশ একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র। এ জাতীয় অপপ্রচারের এ ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে, জাতিসংঘ যেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যথার্থরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিদেশি বাহিনী নিয়োগ করে।

   পৃথিবীতে এ ধরনের নজির নেই যে, কোনো গণতান্ত্রিক দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য দুশমনি করেছেন। একমাত্র তারই কারণে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' নামে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন দেশে ও বিদেশে মুসলিম জাতি ও ইসলাম সম্পর্কে চরম ধৃষ্টতামূলক বক্তব্য দিতে দুঃসাহস পায়।

'২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি' নামে আমার লেখা একটা পুস্তিকা ২০০৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছে এবং এপ্রিলেই পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন পড়েছে।

শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে গিয়ে চরম বিদ্বেষবশত এতটা অন্ধ হয়ে পড়েন যে, দেশের মর্যাদা বিনষ্ট হচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল করার অবকাশও পান না।

বাংলাদেশের পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেতার মুখে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের স্বীকৃতি পেয়ে ভারত সরকারের নিকট এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। তাই ২০০৪ সালের জুলাই মাসে তিনি ব্যক্তিগত সফরে আজমীর শরীফ যাওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস দলীয় প্রধান ও বিরোধীদলীয় নেতা তাকে গুরুত্বের সাথে সাক্ষাৎ দান করেছেন। তারা বাংলাদেশের চারপাশে ভারতীয় রাজ্যসমূহের বিদ্রোহীদেরকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ করলে তিনি বিব্রত ও লজ্জাবোধ করলেন; প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেননি। অর্থাৎ তিনি স্বীকৃতি দিয়ে এলেন যে, তাদের অভিযোগ সত্য।

নবম সংসদ নির্বাচন কেন বানচাল করা হলো?

বাংলাদেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলই ২০০১ সালে শতকরা ৮০টি ভোট পেয়েছে। এ দুটো দলই দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটা দল যদি নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাহলে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলে প্রমাণিত হলো। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে আমার লেখা '২০০৭ সালের নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি' শিরোনামের পুস্তিকাটি দু'বার মুদ্রিত হয়।

২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করেই হয়তো শেখ হাসিনা পরবর্তী সংসদ নির্বাচন বানচাল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকবেন। নির্বাচনী ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মোট ভোটারদের শতকরা ৮০টি ভোট বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পেয়েছে। এর মধ্যে বিএনপি সামান্য বেশি পেয়েছে মাত্র। উভয় দল প্রায় সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছে। এ অবস্থায় বিএনপি ১৯৩ আসন, আর আওয়ামী লীগ মাত্র ৬২ আসন পাওয়ার কারণ কী? বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বহু আসনে আওয়ামী লীগ দশ হাজারেরও কম ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে।

শেখ হাসিনা তার শাসনকালে ইসলাম, মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যাকিছু করেছেন, এর ফলে ইসলামপন্থিদের ভোট একচেটিয়া বিএনপি-ই পেয়েছে। এ হিসাব অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচনেও শেখ হাসিনা বিজয়ী হতে সক্ষম হবেন না বলে নিশ্চিত হয়েই ২০০১ সাল থেকেই পরবর্তী নির্বাচন বানচাল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যাতে চারদলীয় জোট আবার বিজয়ী না হয়।

প্রথম প্রচেষ্টা

পরিকল্পনা অনুযায়ী তার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশে অপপ্রচার চালিয়ে বিদেশি শক্তি দ্বারা জোট সরকারকে খতম করা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব দেশে তিনি অপপ্রচার চালিয়েছেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত সেসব দেশের রাষ্ট্রদূতগণ থেকে ঐসব দেশের সরকার বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা জানার কারণে শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে।

হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ভারতের হিন্দুবাদী পত্রিকা ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাল যে, বাংলাদেশে সেনাবাহিনী পাঠানো হোক। ভারত সরকার এ বোকামি করেনি।

২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারত '৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেছিল। বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। তাই ঐ চেতনাকে রক্ষার জন্য ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।" ঐ সভার পূর্ণ বিবরণ আমার লেখা 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' নামক বইটিতে রয়েছে। বইটিতে তথ্য দিয়ে আমি প্রমাণ করেছি যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য কায়েম করতে চায়।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

বিদেশি শক্তির দ্বারা জোট সরকারকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর শেখ হাসিনা গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জোট সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি পালন করছেন। হরতাল, রোডমার্চ, বিক্ষোভ মিছিল, মহাসমাবেশ ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। ২০০৪ সালের মার্চে দলীয় সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে, আগামী ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। সবাই চমকিত। দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে কিভাবে এমন ঘোষণা দেওয়া হলো?

উৎসুক দেশবাসী দেখল যে, ৩০ এপ্রিল কিছুই ঘটেনি। শুধু দলীয় ক্যাডাররা মিছিল-সমাবেশ করেছে। পরে জানা গেল, বিদেশি এনজিওদের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্কিত জনগণকে বিপুল সংখ্যায় রাজধানীতে হাজির করে প্রশাসনকে অচল করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার পরিকল্পনা ছিল। নির্দিষ্ট তারিখের কয়েক দিন পূর্বে জনাব আবদুল জলিল হুমকি দিলেন যে, তার নিকট ট্রামকার্ড আছে। তাই পদত্যাগ করতেই হবে।

গণ-অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ

শেখ হাসিনা ২০০২ সালটা বিদেশিদের দরবারে ধরনা দিয়ে কাটালেন। ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত একটানা তিন বছর জোট সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান

ঘটানোর উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি দলীয় ক্যাডারের বাইরে সাধারণ জনগণের সামান্য সাড়াও পাননি। যারা চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করার জন্য ভোট দিল, তাদের তো শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে তারাও কোনো সাড়া দেয়নি। তারা ময়দানে লক্ষ করেছে যে, অধিকাংশ ভোটার জোটকে ভোট দিয়েছে। যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার অধিকার আছে বলে তারা মনে করেছে। তাই তারা শেখ হাসিনার অযৌক্তিক ডাকে সাড়া দেয়নি। শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নিলেও তার ভোটাররা মেনে নিয়েছে। তাই গণ-অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শেখ হাসিনার জোট গঠন

চার বছর বিভিন্ন কৌশলে চারদলীয় জোট সরকারের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হওয়ার পর শেখ হাসিনা ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের মোকাবিলা করার জন্য জোট গঠনের গুরুত্ব অনুভব করলেন। এককভাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস পেল না। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হতে সম্মত হয়নি। রাজনৈতিক এতিম হিসেবে খ্যাত জনবিচ্ছিন্ন ও নামসর্বস্ব ১৩টি দলকে নিয়ে ১৪ দলীয় জোট গঠন করা হলো। ২০০১ সালের নির্বাচনে ঐ ১৩টি দলের প্রাপ্ত ভোটের যোগফল শতকরা ১ ভাগেরও অনেক কম। এ জোটে গণফোরামের নেতা ড. কামাল হোসেন ও কমিউনিস্ট পার্টি শামিল হয়নি।

এ জোট দিয়ে যে চারদলীয় জোটের মোকাবিলায় নির্বাচনে জয়ী হওয়া যাবে না তা উপলব্ধি করে শেখ হাসিনা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জনগণের ময়দানে কোনো তৎপরতা শুরু করেননি। ১৪ দলীয় জোটকে নির্বাচনে বিজয়ের জন্য যথেষ্ট মনে করলে তিনি জোট সরকারের ব্যর্থতার ফিরিস্তি নিয়ে জনগণের দরবারে হাজির হতেন।

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলন

জোট সরকারের পদত্যাগ দাবিতে তিন বছর আন্দোলন করে ব্যর্থ হওয়ার পর শেখ হাসিনা ১৪ দলীয় জোটকে নিয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি ৩২ দফা সংস্কার দাবিতে আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ফটোসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ডের দাবিও তাতে শামিল করলেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এ দাবি পূরণ করতে হলে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে সংসদ নির্বাচন সম্ভব হবে না। নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্য না থাকলে এমন অবাস্তব দাবি কেমন করে তিনি উত্থাপন করলেন? এ কাজ বর্তমান নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালের আগস্টে শুরু করে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত করে।

সংস্কার আন্দোলনের প্রধান প্রধান দাবি

৩২ দফা সংস্কার দাবির মধ্যে ভোটার তালিকার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। দাবির বিরাট বহরের মধ্যে অন্যান্য প্রধান দাবিগুলো নিম্নরূপ :

১. বিচারপতি কে এম হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান নিয়োগ করা চলবে না।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের পূর্বে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় যদি ২০০৭ সালের জানুয়ারি হয় তাহলে ২০০৫ সালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের অবসর গ্রহণ করলে তিনিই প্রধান উপদেষ্টা হতেন। কিন্তু জোট সরকার বিচারপতিদের চাকরির মেয়াদ দু বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে অবসরপ্রাপ্ত সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি কে এম হাসান।

বিচারপতি কে এম হাসান ২০ বছর পূর্বে আইনজীবী থাকাকালে বিএনপি'র দলীয় পদাধিকারী ছিলেন বলে আওয়ামী লীগ তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা করার বিরোধিতা করল। তারা স্বাভাবিক কারণেই ধারণা করেছেন যে, তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা করার উদ্দেশ্যেই বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটাই আওয়ামী লীগের আন্দোলনের প্রধান ইস্যুতে পরিণত হলো।

২. বিচারপতি এম এ আজিজসহ নির্বাচন কমিশনের সকল কমিশনারকে পদত্যাগ করিয়ে নতুন কমিশন গঠন করতে হবে। উক্ত কমিশনের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে আওয়ামী লীগ জোর দাবি জানাল। এটা তাদের দ্বিতীয় প্রধান ইস্যু।

এভাবে সংস্কার আন্দোলনের প্রধান তিনটি ইস্যু ছিল ভোটার তালিকা, প্রধান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন। এ কয়টি বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট আপসহীন। জোট সরকারও তাদের দাবির প্রতি নমনীয় হতে অসম্মত।

সংলাপের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে ১৪ দলীয় জোটের সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে চারদলীয় জোটের সাথে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে উভয় পক্ষ থেকে কমিটি পর্যায়ে আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। আওয়ামী লীগের ৫ জন নেতার কমিটি গঠন করে বিএনপি মহাসচিবের নিকট পাঠানো হলো। বাকি ১৩ দলের কারো নাম কমিটিতে দেওয়া হয়নি। চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলো, তাতে বিএনপি থেকে ২ জন এবং বাকি তিন দল থেকে একজন করে নাম দেওয়া হয়।

কমিটিতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের কেউ থাকলে সংলাপে বসতে আওয়ামী লীগ অস্বীকার করল। চারদলীয় জোটের কমিটি কাদেরকে নিয়ে গঠিত হবে, সে ফায়সালায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার জোটের বাইরের কারো থাকতে পারে না। তাই আওয়ামী লীগের অযৌক্তিক দাবির কারণে সংলাপ শুরু করা গেল না।

অতঃপর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও বিএনপি'র মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যে সংলাপ চলে। প্রথমদিকে উভয় নেতাই আলোচনার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ঐকমত্য না হওয়ায় প্রায় দু সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেল।

২০০১ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে, শেখ হাসিনার মনোনীত প্রেসিডেন্ট, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ গোটা কমিশন, সেনাপ্রধান ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও চারদলীয় জোট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। এসব পদাধিকারীদের কারচুপি করার সুযোগ নেই। জনগণের হাতেই আসল ক্ষমতা। তাই শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচাল করতে না চাইলে ঐসব অজুহাত তোলার প্রয়োজন মনে করতেন না। নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনেই তিনি তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছেন।

চারদলীয় জোটের মেয়াদ শেষ

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১৪ দলীয় জোট তাদের সংস্কারের দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে বহু হরতাল পালন করেছে; কিন্তু কোনো দাবিই আদায় করতে সক্ষম হয়নি। হরতালে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং জনগণের যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে; কিন্তু সরকারকে অচল করে ফেলা বা জনজীবন স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ, তখন একটি শক্তিশালী সরকার কায়েম ছিল।

২৮ অক্টোবর সাংবিধানিক সকল ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে চলে যায়। সেদিনই কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানের শপথ নেওয়ার কথা। রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদ পূর্বে নিরীহ প্রফেসর ছিলেন। সরকারি সকল ক্ষমতা তাঁরই নিকট কেন্দ্রীভূত হলো। বাংলাদেশে ঐ সময়ের মতো এত দুর্বল সরকার কোনো কালে ছিল না। সরকারের ঐ দুর্বলতার সুযোগে শেখ হাসিনা তার ১৪ দলীয় ক্যাডারদেরকে লাঠি-বৈঠা-লগি নিয়ে ঢাকায় চরম অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য লেলিয়ে দিলেন।

৩১৬.

শেখ হাসিনার লগি-বৈঠা সন্ত্রাস

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ২৮ তারিখে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজুদ্দিন আহম্মেদের হাতে সংবিধানে ধার্য করা প্রধানমন্ত্রীর যাবতীয় ক্ষমতা এসে যায়। ২৮ তারিখ সন্ধ্যায়ই বঙ্গভবনে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (সরকারপ্রধান) হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানের শপথ গ্রহণের কথা ছিল। তা না হওয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের ক্ষমতা ড. ইয়াজুদ্দিনের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

দেশ শাসনের কোনো অভিজ্ঞতা ড. ইয়াজুদ্দিনের ছিল না। তদুপরি তিনি হার্টের রোগী। তখন দেশে কোনো সরকার ছিল বলে মনে হয়নি। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শেখ হাসিনা তার ক্যাডার বাহিনীকে লগি-বৈঠা নিয়ে তার নির্দেশমতো সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দিলেন।

বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতের পূর্বঘোষিত সমাবেশের আয়োজন চলছিল। সমাবেশ বিকাল তিনটা থেকে শুরু হওয়ার কথা। দুপুরের আগেই লগি-বৈঠাধারীরা সমাবেশের আয়োজক ও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর হামলা চালায়। সমাবেশে আসার পথে পথে যোগদানকারীদেরকে লগি-বৈঠা দিয়ে পেটাতে থাকে। জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকেরা দুপুর থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত সন্ত্রাসীদেরকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে জামায়াত-শিবিরের ৬ জন নেতা-কর্মী শহীদ হলেন এবং কয়েক শ' আহত হলেন। হত্যার পর ঘাতকেরা লাশের উপর নেচে উল্লাস প্রকাশ করেছে। দেশে-বিদেশে লাখ লাখ মানুষ টেলিভিশনে এ পাশবিক দৃশ্য দেখেছে। এখনো টিভিতে মাঝে মাঝে ঐ দৃশ্য দেখানো হয়।

দেশে কোনো সরকার থাকলে পুলিশ বাহিনী চরম নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করে ঐ হত্যাকাণ্ড নীরবে দেখতে থাকতে পারত না। সন্ত্রাসীরা এত বড় নৃশংস তাণ্ডব চালাতে পুলিশের পক্ষ থেকে সামান্য বাধাও পেল না।

এ পৈশাচিক দৃশ্য টিভিতে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। মাতৃস্নেহ না থাকুক, সামান্য মানবতাবোধ থাকলেও তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানাতেন। এতে অন্তত এতটুকু প্রমাণিত হতো যে, লগি-বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যার নির্দেশ তিনি দেননি। লগি-বৈঠার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে কি না, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সেবক মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা 'আমার ফাঁসি চাই' বইতে শেখ হাসিনার পৈশাচিক লাশপ্রীতির যেসব ঘটনার বিবরণ রয়েছে তাতে মনে হয় যে, তার সৈনিকদের দ্বারা মানুষ হত্যার দৃশ্য দেখে তিনি পুলকিত ও উল্লসিত হয়ে থাকতে পারেন।

বিচারপতি কে এম হাসানের অক্ষমতা প্রকাশ

বিচারপতি কে এম হাসান টিভিতে শেখ হাসিনার লগি-বৈঠার তাণ্ডব দেখে এবং চৌদ্দ দলীয় নেতাদের হুমকি-ধমকি শুনে প্রধান উপদেষ্টার শপথ নেওয়ার সাহস পেলেন না। ঐ দিন রাতে তাঁর বাসায় একজন সাংবাদিক গেলেন। তাঁর হাতে তিনি একটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন, যার মধ্যে লেখা ছিল তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগ। আরো কয়েক দিন আগে অপারগতা প্রকাশ করলে সংলাপের মাধ্যমে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তালাশ করার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত। হঠাৎ শপথ নেওয়ার দিন এ সিদ্ধান্ত জানানোর ফলে রাষ্ট্রপতি মহাবিপদে পড়ে গেলেন।

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব অর্পণের যোগ্য একজন ব্যক্তি তালাশ করার মতো দুরূহ কর্মতৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে রাষ্ট্রপতি বিএনপি'র আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আওয়ামী লীগের আবদুল জলিলকে নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করলেন। সংবিধানে যেসব বিকল্প বিধি রয়েছে সেসবের কোনোটিতেই ঐ দু নেতা একমত হতে পারেননি। তাদের মধ্যে ইতঃপূর্বে দু সপ্তাহ সংলাপ করেও ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা কেমন করে সম্ভব হবে?

অগত্যা রাষ্ট্রপতিকেই দায়িত্ব নিতে হলো

সংবিধান অনুযায়ী যাঁর প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা, লগি-বৈঠা দিয়ে তা ঠেকিয়ে দেওয়ার ফলেই এ সংকট সৃষ্টি হলো। বিচারপতি কে এম হাসানকে ঠেকানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। নির্বাচন বানচালের অজুহাত হিসেবেই এটা করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নির্বাচিত ও নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিচালনায় ২০০১ সালে নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিতে কারচুপি হওয়ার সুযোগ নেই। ভোটাররাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী।

চৌদ্দদলীয় নেতাদের দাবি ছিল যে, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতির মাধ্যমে নিযুক্ত করা হোক। এটা যে কত বড় অযৌক্তিক ও অবাস্তব তা প্রমাণিত হয়ে গেল। সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতি তো অনেক দূরের কথা, প্রধান দু দলের মধ্যে পর্যন্ত ঐকমত্য সম্ভব হলো না।

ঐকমত্যের অভাবে সংবিধানের চারটি বিকল্প প্রয়োগ করা গেল না বলে অগত্যা শেষ বিকল্প অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো। ৩১ অক্টোবর (২০০৬) ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করলেন।

উপদেষ্টাদের ভূমিকা

সংবিধান অনুযায়ী উপদেষ্টাদের প্রধান দায়িত্ব হলো নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করা। তাছাড়া নির্বাচিত সরকারের

অনুপস্থিতিতে তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্য পরিচালনা করা। কোন্ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বা করবে না, সে বিষয়ে উপদেষ্টাদের কোনো মাথাব্যথা থাকার কথা নয়; কিন্তু কয়েক জন উপদেষ্টা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত করার জন্য ওঠেপড়ে লেগে গেলেন। যারা লগি-বৈঠা প্রয়োগ করে দাবি আদায় করতে সক্ষম তাদেরকে তোয়াজ করার পরিণাম যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। তাদের কোনো দাবি পূরণ করা হলে আরো নতুন দাবি তুলে উপদেষ্টাদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাহায্য ও সহায়তার বদলে আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সংস্কারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কয়েক জন উপদেষ্টা কমিশনের কার্যক্রমে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

বেচারা রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে মহাবিপদে পড়ে গেলেন। উপদেষ্টাগণের কয়েক জন তাঁকে শক্তি জোগানোর পরিবর্তে সমস্যা বৃদ্ধি করে চললেন। ৪ জন উপদেষ্টার এ ভূমিকার ফলে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে শেখ হাসিনা আরো কঠোর কর্মসূচি দিতে লাগলেন।

এরপর হরতাল ও বিক্ষোভকে যথেষ্ট মনে না করে একটানা দু দিন ও তিন দিন করে অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে গোটা দেশকে অচল করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে প্রমাণ করা হলো। অবরোধ চলাকালে শুধু সরকারই অচল হয়নি, জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল। সকল যানবাহন বন্ধ। ছুটিতে যারা বাড়িতে গেল তারা ঢাকায় ফিরে আসতে পারল না। লঞ্চে যারা যারা সদরঘাট পৌঁছল তারা কুলির মতো মাথায় বোঝা নিয়ে, মহিলারা শিশুদেরকে কোলে করে হেঁটে বাসায় যেতে বাধ্য হলো। অবরোধকালের বীভৎস অভিজ্ঞতা দুঃস্বপ্নের মতো জনগণ এখনো স্মরণ করে। কতক উপদেষ্টার ভূমিকায় একদিকে অবরোধকারীদের দাপট অপ্রতিরোধ্য হয়ে গেল, অপরদিকে সরকার তাদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলো।

তোয়াজকারী উপদেষ্টাদের বক্তব্য ছিল যে, প্রধান বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত করা না গেলে বিশ্বে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। তাঁদের এ সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা মেনে নেওয়া যেত, যদি তাঁরা আওয়ামী লীগকে অবরোধ কর্মসূচি থেকে বিরত রাখতে পারতেন। তাঁদের দাবি দু-একটা মেনে নেওয়ার পরও অবরোধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। উপদেষ্টাগণ তাদেরকে বলতে পারতেন যে, আমাদেরকে সময় দিন, দাবি মানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, অবরোধ কর্মসূচি মুলতবি রাখুন। দেখা গেল, একটা করে দাবি পূরণ হচ্ছে আর অবরোধকারীরা বিজয়ের আনন্দে আরো কঠোরভাবে চাপ প্রয়োগ করেই যাচ্ছেন।

চৌদ্দদলীয় জোট বঙ্গভবন অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করলে রাষ্ট্রপতি বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনী তলব করলেন। উক্ত চার জন উপদেষ্টা এর প্রতিবাদে পদত্যাগ

করলেন। এতে তাঁদের সদিচ্ছার কোনো প্রমাণ কি মিলে? দেশ অচল হয়ে গেল, জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল, অর্থনীতি ধ্বংসের পথে চলল, আর চৌদ্দ দলের সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকল। সেনাবাহিনী ডাকা রাষ্ট্রপতির ইখতিয়ার। এতে আপত্তি করার কোনো অধিকার উপদেষ্টাদের ছিল না।

পদত্যাগ করে তাঁরা সংকট বৃদ্ধি করলেন। তাঁরা বোধ করি ধারণা করেছিলেন যে, ড. ইয়াজুদ্দীন বাধ্য হয়ে চৌদ্দ দলের সব দাবি মেনে নিয়ে তাঁদেরকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করবেন। একজন তো মিডিয়ায় প্রকাশ করলেন যে, রাষ্ট্রপতি চাইলে তিনি প্রত্যাহার করবেন। পদত্যাগের পরের দিনই নতুন চার জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করায় পদত্যাগীদের সৃষ্ট সংকট কেটে গেল। পদত্যাগকারীগণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের জন্য শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করেছেন, সহযোগিতামূলক কিছুই করেননি।

দল ও জোটে নির্বাচনী ভাঙা-গড়া

জোট সরকারের শেষ দিন ২৭ অক্টোবর (২০০৬) বিএনপি'র দুই বিদ্রোহী নেতা এলডিপি (লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) নামে নতুন দল গঠন করলেন। পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বে গঠিত এ দলে বিএনপি'র ১৩ জন এমপি ও প্রতিমন্ত্রী যোগদান করেছেন।

চারদলীয় জোটের মোকাবিলা করার জন্য চৌদ্দদলীয় জোট যে মোটেই যথেষ্ট নয় তা অনুভব করে আওয়ামী লীগ এলডিপিকে সাথে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

এরশাদ চারদলীয় জোট গঠনের সময় চার দলের অন্যতম দলের নেতা হিসেবে শরীক ছিলেন। আবার তিনি জোটে ফিরে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তার ভাই জিএম কাদের বিদ্রোহ করলে তিনি থমকে গেলেন। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ তাকে নিয়ে টানাটানি করতে থাকে। এর মধ্যে ১৪ ডিসেম্বর (২০০৬) জাপানি বোট কেনার মামলায় কোর্ট এরশাদকে ২ বছরের কারাদণ্ড দিলেন। এরশাদ হঠাৎ আত্মগোপন করলেন। মিডিয়া তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও তাকে খুঁজে পেল না।

চৌদ্দদলীয় জোট পল্টন ময়দানে ১৮ ডিসেম্বর (২০০৬) মহাসমাবেশের আয়োজন করল। ঐ সমাবেশে এরশাদ হঠাৎ শরীক হয়ে আবেগময় বক্তৃতা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিলেন। এলডিপি নেতা ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও কর্নেল অলি আহমদ পল্টন ময়দানে হাজির হলেন। শেখ হাসিনা তখনই মহাজোট গঠিত হলো বলে উৎসাহের সাথে ঘোষণা করলেন।

চারদলীয় জোটের অন্যতম শরীক ইসলামী ঐক্যজোট ৫ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। মুফতী ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা ইসহাকের দুই গ্রুপ চারদলীয় জোটেই থেকে গেল। শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক গ্রুপসহ ঐক্যজোটের তিন গ্রুপ

শেখ হাসিনার মহাজোটে শামিল হয়ে গেল। শায়খুল হাদীস আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আওয়ামী ব্যাখ্যা কবুল করে নিলেন। অথচ এর আগে তিনি বহু বার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কুফরী মতবাদ বলে ঘোষণা করেছেন। এ চুক্তির বিরুদ্ধে চৌদ্দদলীয় শরীকরা তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

চারদলীয় জোটকে নির্বাচনে মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী ঐক্যজোটের অর্ধেকসহ যে মহাজোট শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত হলো, এতে নির্বাচনে তার বিজয় নিশ্চিত মনে করারই কথা।

নির্বাচনী শিডিউল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করল। ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতেই হবে। তাই এ তারিখ আর পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া, বাছাই করা ও প্রত্যাহার করার তারিখে ৫ বার পরিবর্তন করতে হয়েছে, যাতে মহাজোট নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। সর্বশেষে ২৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, ২৭ তারিখ বাছাই ও ৩ জানুয়ারি প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ঘোষণা করা হলো।

শেখ হাসিনা মহাজোটের শরীক দলসমূহের জন্য আসনসংখ্যা বরাদ্দ করে দিলে প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরশাদ ৫টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ২৭ ডিসেম্বর রিটার্নিং অফিসারগণ মনোনয়নপত্র বাছাই করে এরশাদের দু বছর জেল হওয়ার কারণে তার সকল আসনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করলেন।

মহাজোটে তোলপাড়

এরশাদের জাতীয় পার্টি বিক্ষোভ মিছিল করে স্লোগান দিল, 'নো এরশাদ নো ইলেকশন'। অর্থাৎ জাতীয় পার্টি এরশাদকে ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেবে না। এরশাদ সুধাসদনে গিয়ে হাসিনার দুয়ারে ধরনা দিলেন, যাতে মহাজোট তার পাশে দাঁড়ায়। এরশাদ নির্বাচন কমিশনে আপিল করলেন, যাতে তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল।

২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি হোটেল শেরাটনে সাংবাদিক সম্মেলনে মহাজোটের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেন।

মহাজোট মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় সকল মহলই স্বস্তিবোধ করেছিল যে, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে; কিন্তু মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণার ফলে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হলো।

নির্বাচন মুলতবি করার আন্দোলন

মহাজোটভুক্ত দলসমূহ স্বাভাবিক কারণেই ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন মুলতবি করার জন্য রাষ্ট্রপতি, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিকট তীব্র দাবি জানান। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস, ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতগণ সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচন মুলতবি করার দাবি জানাতে থাকেন। সকল বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে তা বিশ্বে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না বলে তাঁরা বারবার ঘোষণা করতে থাকেন।

সশস্ত্র বাহিনী ড. ইয়াজুদ্দিনের কেয়ারটেকার সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে থাকায় নির্বাচন কমিশন যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তৎপরতা জারি রাখে। মহাজোট নির্বাচন বর্জনের ফলে সংসদের ১৭টি আসনে চারদলীয় জোটপ্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা

২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের নিকট এক বাণীতে এ নির্বাচনে সরকারকে সহযোগিতা না করার জন্য অনুরোধ জানালেন। এ অনুরোধ উপেক্ষা করলে জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী নিয়োগ বন্ধ হওয়ার হুমকিও দিলেন।

সেনাপ্রধানের পক্ষে এত বড় হুমকিতে অবজ্ঞা করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের মতো একটি নতুন রাষ্ট্র জাতিসংঘ মিশনের মাধ্যমে বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছে, অন্য কোনো দিক দিয়ে এমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। তদুপরি জাতিসংঘ মিশনে সেনাবাহিনীর যেসব অফিসার ও সৈনিক অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তারা এমন আর্থিক সুবিধা পায়, যা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা মোটেই সমীচীন নয়।

এ পরিস্থিতিতে ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ড. ইয়াজুদ্দিন সরকারকে সাহায্য করতে অক্ষমতা প্রকাশ করা ছাড়া সেনাপ্রধানের কোনো উপায়ই ছিল না।

ফলে রাষ্ট্রপতি ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন মুলতবি করতে বাধ্য হলেন। প্রধান উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন কেয়ারটেকার সরকার কায়েম করলেন। ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। ১০ জন উপদেষ্টার মধ্যে পাঁচ জন ১৩ তারিখে, তিন জন ১৬ তারিখে ও দুই জন ১৮ তারিখে শপথ নিলেন।

নির্বাচন বানচাল করতে পেরে মহাজোটের উল্লাস

চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে চৌদ্দদলীয় জোট নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই ২০০৫ সালের জুলাই মাসে শেখ হাসিনা তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

তার অবরোধ কর্মসূচি ঠেকাতে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এর মাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকেন। নির্বাচন বানচাল করাই আসল লক্ষ্য। ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও নির্বাচন মুলতবি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মহাজোট নেতৃবৃন্দ মহাবিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়লেন।

১২ জানুয়ারি বঙ্গভবনে নতুন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের শপথ অনুষ্ঠানে মহাজোট নেতৃবৃন্দের পুলকিত চেহারা টিভিতে দেখে দর্শকদের এ ধারণাই হয়েছে যে, নতুন কেয়ারটেকার সরকার তাদেরই সরকার। শেখ হাসিনা এ সরকারকে তারই 'আন্দোলনের ফসল' বলে গৌরব প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

১৪ মার্চ (২০০৭) আমেরিকা যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে তিনি দাপটের সাথে ঘোষণা করলেন যে, এ সরকার যাকিছু করবে তা সবই তার সরকার রেটিফাই করবে। নির্বাচন বানচালের আন্দোলনে সফল হয়ে তিনি এ সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিতব্য আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই ঐ ঘোষণা দিতে পারলেন।

মহাজোটের সমর্থক পত্রিকাগুলোও অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে দাবি করতে লাগল যে, তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায়ই জরুরি অবস্থা কায়েম হয়েছে এবং নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে।

শেখ হাসিনা, তার মহাজোট ও তাদের সমর্থক পত্রিকাগুলো গৌরবের সাথে স্বীকার করে নিলেন যে, তারা দেশে জরুরি অবস্থা কায়েমের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

নির্বাচন দু বছর বিলম্বিত হওয়ার জন্য কে দায়ী?

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য। বিগত কেয়ারটেকার সরকার সে বাধ্যবাধকতার কারণেই ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। শেখ হাসিনা ঐ নির্বাচন বানচাল করতে সক্ষম হওয়ার ফসলই হলো ড. ফখরুদ্দীনের সরকার। এ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবেই পরিচিত। কারণ, সংবিধানে অন্য কোনো পরিচয়ের ব্যবস্থা নেই। প্রকৃতপক্ষে এ সরকার নির্বাচিত সরকার কায়েম হওয়ার পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুই বছর ক্ষমতা আঁকড়ে রেখেছিল; সংবিধানে যার কোনো বিধি নেই।

শেখ হাসিনা আমেরিকায় থাকা অবস্থায়ই দাবি জানিয়েছেন যে, ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে। বিলম্ব করা ঠিক নয়। দেশে ফিরে এসে বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে ধরনের জঙ্গি কর্মসূচি পালনে অভ্যস্ত, সে ধরনের তৎপরতা বন্ধ থাকায় তার অস্থির হওয়াই স্বাভাবিক।

তারই সংস্কার আন্দোলনের ফলে সংবিধান অচল হয়ে পড়েছিল। কেয়ারটেকার সরকার ৯০ দিনের বদলে দু বছর স্থায়ী হলো। তিনিই তো দাবি করেছেন যে, ছবিসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড করে নির্বাচন করতে হবে; দুর্নীতিবাজদেরকে শাস্তি দিতে হবে; প্রশাসনকে নির্দলীয় করতে হবে; নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠিত করতে হবে। ড. ফখরুদ্দীনের সরকার তারই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এসব শর্ত পূরণ করতে যত সময় সরকার প্রয়োজন মনে করেছে তা না দিয়ে উপায় কী ছিল? শেখ হাসিনার অস্থির হওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। নির্বাচন দুই বছর বিলম্বিত হওয়ার জন্য তিনিই প্রধান দায়ী।

৩১৭.

ইতিহাসের সারকথা

বাংলাদেশের গত ৩৬ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস অতি সংক্ষেপে গত তিন কিস্তিতে আলোচনা করেছি। এ ইতিহাস থেকে নিম্নরূপ মহাসত্য প্রকাশিত হয়েছে :

১. শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ চরিত্রগতভাবে ফ্যাসিস্ট, যদিও মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান। ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে তারা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী, আর ক্ষমতায় গেলে স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী।

২. একদলীয় স্বৈরশাসন থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মুজিব হত্যার কোনো বিকল্প ছিল না। সর্বস্তরের জনগণ এর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছে। হত্যাকারীদেরকে জনগণ শাস্তিযোগ্য অপরাধী মনে না করে নাজাতদাতা মনে করেছে।

৩. ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার ঐতিহাসিক সংহতি বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সিপাহি-জনতা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ৭ নভেম্বর ঐ সংহতি দৃঢ়তর হয়েছে।

৪. সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেননি। সিপাহিরা তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে সেনা ছাউনি থেকে বের হয়ে এসেছে এবং রাজধানীর জনগণের সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে ক্ষমতাসীন করেছে। দেশবাসী তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে।

৫. শেখ মুজিব জনপ্রিয় নেতা হয়েও গণতন্ত্র হত্যা করলেন। আর জেনারেল জিয়া গণতন্ত্র বহাল করার ব্যবস্থা করলেন।

৬. নির্বাচন যতই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হোক, পরাজিত হলে তারা নির্বাচনী ফলাফল কিছুতেই মেনে নেন না।

৭. তাদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতিকে যথেষ্ট মনে করেন না। সন্ত্রাসী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে তারা একটুও দ্বিধা বোধ করেন না।

৮. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মোকাবিলা করার চেয়ে তারা ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া জরুরি মনে করেন।

৯. নির্বাচনে তাদের বিজয় নিশ্চিত মনে না করলে তারা সে নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে লগি-বৈঠা ব্যবহার করে এবং হরতাল ও অবরোধের অস্ত্র প্রয়োগ করে দেশকে অচল করা ও জনগণকে জিম্মি করে রাখা দূষণীয় মনে করেন না।

১০. ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লবের পর ২১ বছর পর্যন্ত জনগণ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। '৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হওয়ায় জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় বসায়। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে আইনে পরিণত করতে বিএনপি সম্মত না হওয়ায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল বিরোধী দল কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করে বিএনপিকে তা মেনে নিতে বাধ্য করে। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির কারণেই ১৯৯১ সালে জনগণ অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচনের কারণেই ঐ পদ্ধতি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে। এমন একটি জনপ্রিয় ইস্যুতে শেখ হাসিনাকে আন্দোলন করার সুযোগ না দিলে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে কিছুতেই বিজয়ী হতো না। ক্ষমতায় বসার সুযোগ না পেলে আওয়ামী লীগ আবার বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতো না। বিএনপি'র ঐ মহাভুলই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বর্তমান মহাসংকট সৃষ্টি করেছে। জিয়াউর রহমান বাকশালের পুনরুত্থান ঠেকানোর উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে এমন এক অবস্থানে রেখে গেলেন, যা ঐ ভুলের কারণে নস্যাৎ হয়ে গেল।

১১. জনগণের নিকট শেখ মুজিবের ভাব-মর্যাদা খতম হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পেয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের ব্যবস্থা করেছেন।

ক. সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংবিধানের শপথ ভঙ্গ করে জনগণের উপর এ কুফরি মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

খ. ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে জনগণের সাথে প্রহসন করেছেন। কারণ, জনগণ ঐ দিনটিকে নাজাত দিবস মনে করে।

গ. জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি তার পিতাকে জাতির পিতা মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তার পিতার ফটো মাদরাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঝুলানোর জন্য আইন করে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘ. মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

ইতিহাসের শিক্ষা

৩৬ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাগুলো থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তা নিম্নরূপ :

১. সংগ্রামযুগে বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও বিজয়যুগে বিচক্ষণতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা না থাকলে সুশাসন কায়েম করা সম্ভব হয় না। ফলে জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

২. আন্দোলন ও সংগ্রামযুগে কর্মীদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে গড়ে তুললে বিজয়যুগে অবশ্যই তারা দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হয়। সৎ ও চরিত্রবান কর্মীবাহিনী গড়তে ব্যর্থ হলে সুশাসন কায়েম করতে সক্ষম হওয়া অসম্ভব।

৩. মুখে গণতন্ত্রের বুলি যত উচ্চকণ্ঠেই উচ্চারণ করা হোক, আচরণে গণতন্ত্রের অনুশীলন করা না হলে কর্মীরা ফ্যাসিস্ট হিসেবেই গড়ে ওঠে।

৪. নেতা হিসেবে জনগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা জোর করে হাসিল করা যায় না; আইন করেও অর্জন করা সম্ভব নয়।

৫. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের আন্দোলন না করে লাগাতার হরতাল, অবরোধ, লগি-বৈঠা-লাঠি ব্যবহার করলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার কারণ ঐসব অগণতান্ত্রিক আচরণ। দু বছর গণতন্ত্র মুলতবি হয়ে গেল এবং অনির্বাচিত সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা চলে গেল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যদি উপরিউক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে রাজনীতি করেন, তাহলে দেশে সুস্থ রাজনীতি ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্র চালু হবে এবং বিশ্বে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করবে। জনগণের এটাই প্রত্যাশা যে, রাজনীতিকগণ দেশকে আবার অরাজকতার দিকে ঠেলে দেবেন না এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা থেকে বিরত থাকবেন।

সামরিক শাসনের আশঙ্কা

চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালের অক্টোবরের শেষদিকে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হওয়ার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অবরোধের পর অবরোধ দিয়ে বেসামরিক সরকারকে যখন সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হলো এবং গোটা দেশবাসী যখন অবরোধকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ল, তখন সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করলে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা সমর্থন করত। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই সামরিক শাসন কায়েম করা সহজ হয়।

সামরিক শাসন সমস্যার স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান নয়; বরং সমস্যা জটিল ও বৃদ্ধি করে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান ও ইয়াহইয়া খান এবং বাংলাদেশ আমলে

এরশাদের সামরিক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বর্তমান সেনাপ্রধান যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করায় জরুরি অবস্থা কায়েম হলেও সামরিক শাসন জারি হয়নি।

১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে মি. ভুট্টোর বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দলের আন্দোলনে বেসামরিক সরকার অচল হয়ে পড়লে তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক গণতন্ত্র বহাল করার কথা বলে এক যুগ সামরিক শাসন জারি রাখেন। আমাদের দেশে অনুরূপ অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ অতি সহজেই ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করতে পারতেন।

গত ২০০৭ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে সেনাপ্রধান এমন কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করেছেন, যার ফলে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ ঘটে যে, হয়তো তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিতে চান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সম্মেলনে সেনাপ্রধান প্রবন্ধ পাঠ করায় এ ধারণা আরো প্রবল হয়। রাজনীতিবিদদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক অধ্যাপক পর্যন্ত নাকি সামরিক শাসনের জন্য সেনাপ্রধানকে পরামর্শ দিয়েছেন; কতক আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীও নাকি এ কুপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

গত ২৩ মে (২০০৭) সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট সেনাপ্রধান সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, সেনাবাহিনী বেসামরিক সরকারকে সহযোগিতা দিচ্ছে; ক্ষমতা দখলের মোটেই আকাঙ্ক্ষী নয়। সামরিক শাসনের কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। তাঁর সময়োপযোগী এ ঘোষণা দেশপ্রেমিক সকল মহলকে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করেছে।

সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। অপরাজনীতি দেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেই বিতর্কিত করে ছেড়েছে। একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীই এখনো ঐক্যের প্রতীক হয়ে বিরাজ করছে। তাদের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা বহাল রয়েছে। রাজনৈতিক ময়দানে আসলে তাদের এ মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান দায়িত্ব ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা করা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চৌদ্দদলীয় জোটের সংস্কার আন্দোলনের কারণে ড. ইয়াজুদ্দিন আহম্মেদের কেয়ারটেকার সরকার নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং আরেকটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করেন। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার শেখ হাসিনার দাবিকৃত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন না করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করলে আবার লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর জন্য ড. ফখরুদ্দীন সরকার দু বছর ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবিধান এ সরকারকে মাত্র ৯০

দিন সময় দিয়েছে। সে হিসেবে এ সরকারকে সাংবিধানিক সরকার বলা যায় না। তবে এ সরকার সংবিধানবিরোধীও নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এ সরকারকে Extra-Constitutional বলা যায়। আগামী জাতীয় সংসদ এ সরকারের কার্যাবলিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিলে এ সরকার সংবিধানসম্মত বলে গণ্য হবে।

সংবিধান অনুযায়ী এ সরকার বৈধ না হলেও মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমর্থন ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের পৃষ্ঠপোষকতাই এ সরকারের পেছনে একমাত্র Sanction বা অনুমোদন। এ সরকার যত সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছে, এর কোনোটাই সংবিধানসম্মত নয়। তাই তাদের কার্যাবলির বৈধতা নির্বাচিত সংসদে পেতে হবে। সংবিধান কেয়ারটেকার সরকারকে এসব কাজের দায়িত্ব দেয়নি।

বর্তমান সরকারের মর্যাদা

কোনো রাষ্ট্র সরকারবিহীন থাকতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মর্যাদার অধিকারী না হলেও অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি তাদেরকে নিয়োগ দান করেছেন। রাজনৈতিক মহল থেকেও কোনো আপত্তি করা হয়নি। প্রথমেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করায় জনসমর্থনও পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে যে চরম সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বস্তরের জনগণ পরম স্বস্তি বোধ করেছে। নির্বাচন না হওয়ায় জনগণ অসন্তুষ্ট হলেও অশান্তি বন্ধ হওয়ায় সান্ত্বনা বোধ করেছে।

এ সরকারের সংস্কারমূলক কার্যাবলি

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ করেছে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে। শুধু সংস্কার নয়, পূর্ণ বিপ্লব। নৈচা-কল্কি পর্যন্ত বদল করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দু জন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগ দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সরকারপ্রধানের পরামর্শক্রমেই নিয়োগ করা হয়। খুশির বিষয় যে, এ নিয়োগ সম্পর্কে কোনো মহল থেকেই বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়নি।

দ্বিতীয় সংস্কারমূলক কাজ হলো, দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন। এর চেয়ারম্যান যাঁকে করা হয়েছে, তিনি পূর্ববর্তী কেয়ারটেকার সরকারের পদত্যাগকারী ৪ জন উপদেষ্টার একজন। সে হিসেবে বিতর্কিত ব্যক্তিই বলা যায়। তবে সাবেক সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর সততার সুনাম থাকায় কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যদি সত্যিই সৎ হন তাহলে চেয়ারম্যান দুর্নীতি দমনে কিছুটা হলেও সফল হতে পারেন।

এ দুটো কমিশনের কার্যক্রম কতটা সন্তোষজনক তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধিমালা সংস্কারের প্রচেষ্টায় কয়েক মাস

ব্যয় করেছে; অথচ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত সংগ্রহ করতে না পারায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভোটার তালিকা প্রণয়ন। চার মাস পর এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। প্রথম থেকেই এ কাজ শুরু করলে এখন থেকে আরো ১৮ মাস প্রয়োজন হতো না। এ ব্যাপারেও কমিশনের মতামতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। ঘরোয়া রাজনীতি শুরু না হওয়ায় কমিশন রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না পাওয়ার কারণে প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে এবং নির্বাচন অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিলম্বিত হয়েছে।

ঘরোয়া রাজনীতি বহাল করার দাবি সকল রাজনৈতিক নেতাই মাসখানেক ধরে করেছেন। নির্বাচন কমিশনও সরকারের নিকট অনুরোধ করে বিলম্বের দরুন অস্থিরতা প্রকাশ করেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধানত বিএনপি'র নেতাদেরকেই টার্গেট করেছে। আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতাও গ্রেফতার হয়েছেন। জামায়াতেরও দু-একজন আটক হয়েছেন। ত্বরিত বিচারকার্য সমাধা করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। এ মানের নেতাদেরকে তদন্ত শুরু করার অনেক আগেই গ্রেফতার করা কি প্রয়োজন ছিল? তারা যাতে বিদেশে গিয়ে আত্মগোপন করতে না পারেন, সে ব্যবস্থা করাই কি যথেষ্ট ছিল না? তাদেরকে জামিনে মুক্তি দিলে কি তদন্ত করা অসম্ভব হতো?

মন্ত্রী ও এমপিদের মধ্যে যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের পক্ষে সরকারের সচিব ও কর্মকর্তাদের উদ্যোগ ও সহযোগিতা ছাড়া কি তা করা সম্ভব হতো? তাদের কাউকে ধরা হয়েছে বলে জানা যায় না। বিনা তদন্তে কারাগারে আটক নেতাদের যারা তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন, তাদেরকে কী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? তারা যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করলেন এর জন্য কে দায়ী হবে?

দুর্নীতি প্রমাণিত হলে আদালতের প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করতে তারা বাধ্য। এতে সকল নাগরিকই সরকারের এ সাফল্যে মোবারকবাদ জানাবে; কিন্তু নিরপরাধ কোনো নাগরিক যদি বিনা বিচারে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট তা যুলুম বলেই গণ্য হবে। তাই বিচারাধীন সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। এ মানের নেতাদের দেশের ভেতরে পালিয়ে থাকার মাধ্যমে নিজেদেরকে হেয় করা স্বাভাবিক নয়। বিদেশে যাওয়ার পথ রোধ করাই যথেষ্ট।

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

কেয়ারটেকার সরকারের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান প্রশংসনীয়। কিন্তু বস্তি উচ্ছেদ, অবৈধ বাজার উচ্ছেদ ও ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদ ইত্যাদির ফলে রাজধানীর হাজার হাজার দোকান বন্ধ হওয়ায় বিরাট সংখ্যক গরিব লোক বেকার

হয়ে গেল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কিনতে পারত। এসব দোকান উঠিয়ে দেওয়ায় যেসব কল্যাণ হয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না বটে; কিন্তু এ সুবিধাভোগীদের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এ ধারণা অমূলক নয় যে, ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে বঞ্চিত হয়ে এ বেকারদের মধ্য থেকেই কিছু লোক রাজধানীতে ব্যাপক আকারে ছিনতাই করতে বাধ্য হয়েছে। এ বিশাল সংখ্যক বেকার দোকানদার ও তাদের ক্রেতাগণের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ নেই। এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ায় এরা সবাই স্বস্তি বোধ করেছিল বলে সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে জনপ্রিয়তা থেকে সরকার বঞ্চিত হলো এবং সরকারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও বিপন্ন হলো।

দেশ শাসন সহজ নয়

উপদেষ্টামণ্ডলীর বেশির ভাগই আমলা হিসেবে অভিজ্ঞ। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার কথা। সাবেক পুলিশপ্রধান, সাবেক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক সামরিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা এ পরিষদে আছেন। একজন অমুসলিম শিল্পপতিও রয়েছেন। একজন মাত্র এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি সিনিয়র আইনবিদ এবং রাজনীতিবিদ। অবশ্য তিনি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন না। একজন মহিলা বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী আছেন। অভিজ্ঞ কূটনীতিকও আছেন। প্রধান উপদেষ্টা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

দেশ শাসনের দায়িত্ব যারা পালন করেছেন, তাদের অধীনে এসব সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। উপদেষ্টা পরিষদে শামিল হয়ে তাঁরা দু বছর দেশ শাসন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশ শাসন অত্যন্ত জটিল দায়িত্ব। একটি রাজনৈতিক দলের মতো সমন্বিত টিম হওয়া তাঁদের জন্য স্বাভাবিক নয়। তাই তাঁদের পক্ষে দেশ শাসন মোটেই সহজ নয়।

এ সরকারের শাসনামলের শুরুতেই ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় গোটা অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থবির, নতুন বিনিয়োগ বন্ধ, এলসি খুলতে সাহস না পাওয়া ইত্যাদির কারণ উপদেষ্টাগণ চিহ্নিত করতে পেরেছেন কি না এবং এর প্রতিকার করতে সক্ষম হচ্ছেন কি না, তা আমাদের পক্ষে জানা কঠিন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় থাকায় গোটা দেশবাসী পেরেশান। অর্থ উপদেষ্টার এ মন্তব্য 'পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় এ বৃদ্ধি বেশি নয়' জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারবে কি?

উপদেষ্টাগণের আচরণ

প্রধান উপদেষ্টা অত্যন্ত সতর্ক ও শালীনভাবে কথা বলেন বলে তাঁর বক্তব্য কোনো মহলকে আহত করে না। সকল উপদেষ্টা এ মান রক্ষা করতে সক্ষম হলে খুব ভালো

হতো। কোনো কোনো উপদেষ্টা রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেন, যা মোটেই সমীচীন নয়। সমালোচনা অবশ্যই করা যায়। আপত্তিকর মন্তব্য এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিদের জন্য মানানসই নয়। এক ব্যক্তি বারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া নাকি লজ্জাজনক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার তিন কিস্তিতে একটানা ১২ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মালয়েশিয়ার ডা. মাহাথির মুহাম্মদ ২০ বছর একটানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি কি মনে করেন যে, ঐ দু দেশে কেউ এ জন্য লজ্জা বোধ করেছেন? এক ব্যক্তি দীর্ঘ দিন একটানা দলীয় প্রধান থাকাটাও গণতন্ত্রবিরোধী নয়; অথচ এটাকেও আপত্তিকর মনে করা হয়।

তাঁকে আমি খাঁটি গণতন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র মনে করি। শেখ মুজিবের আমলে তিনি এমপি ছিলেন। বাকশালী একদলীয় শাসন কায়েমের প্রতিবাদে তিনি সংসদ থেকে পদত্যাগ করে ইতিহাসে সম্মানের আসন অর্জন করেছেন; কিন্তু তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্য গণতন্ত্রসম্মত নয়।

এ সরকারের ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় কীর্তি

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বার্থে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন হওয়া অত্যাবশ্যক। সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে এর পক্ষে জোরালো বক্তব্য থাকে। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়ে এ পর্যন্ত কোনো দলীয় সরকার এ ওয়াদা পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়নি।

১৯৯১ সালের কেয়ারটেকার সরকারের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক হোসেন বিচার বিভাগকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমি তখন বিদেশে ছিলাম। দেশে ফিরে তাঁকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলাম, কাজটা সম্পন্ন হলো না কেন? জবাবে বললেন, অমুক নেত্রী অনুরোধ করেছেন, যেন বাকি কাজটুকু সামাধা করার জন্য তাকে সুযোগ দেওয়া হয়।

এরপর তিনটি দলীয় সরকার ১৫ বছরেও তা সমাধা করেনি। সুপ্রিম কোর্ট বহু বার সময় দিয়ে বিরক্ত হয়ে 'আর সময় দেওয়া হবে না' বলা সত্ত্বেও কাজটি সমাধা হয়নি। সর্বজনস্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ এ সরকার সমাধা করতে সক্ষম হওয়ায় গোটা জাতি কৃতজ্ঞ। আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন উদ্যোগ নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত কাজটি সম্পন্ন করায় বিচার বিভাগের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। এ মহান কাজের জন্য তিনি বার এসোসিয়েশনের সকলের শ্রদ্ধাভাজন হবেন। দেশের সকল বিচারক ও বিচারপতির দোআ পাবেন।

৩১৮.

রাজনৈতিক সংস্কার

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকার যত সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও জটিল বিষয় হলো রাজনৈতিক সংস্কার। এ সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা। এর কয়েকটি দিক রয়েছে :

১. রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো, দলীয় কার্যক্রম ও আচরণে গণতান্ত্রিক নীতিমালার প্রচলন এবং দলীয় আয়-ব্যয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

২. রাজনৈতিক কার্যক্রম ও তৎপরতায় রাজনৈতিক দলসমূহের গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলার ব্যবস্থা করা।

৩. অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদেরকে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা।

এ সংস্কারসমূহের প্রয়োজনীয়তা

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি বা দলই উক্ত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে পারে না। দীর্ঘ নয় বছর সকল রাজনৈতিক দল যুগপৎ আন্দোলন করে ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরশাসককে পদত্যাগে বাধ্য করতে সক্ষম হয় এবং সর্বসম্মতভাবে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত সংস্কারের অভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালু রাখা সম্ভবপর হয়নি এবং ২০০৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানই করা যায়নি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ জনগণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে তারা অত্যন্ত উৎসাহী। তাই দেশপ্রেমিক সকল মহলই আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, আগামী নির্বাচনের পূর্বেই উপরিউক্ত সংস্কারসমূহ সম্পন্ন হোক, যাতে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও বিকাশে কোনো সংকট দেখা না দেয়।

এসব সংস্কার কারা করবে?

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার নির্বাচিত না হলেও নিরপেক্ষ, নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক। সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার না হলেও অন্তর্বর্তীকালীন

সরকার হিসেবে জনগণ মেনে নিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এ সরকার স্থিতিশীল। সরকারপ্রধান হিসেবে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বিগত ১২ এপ্রিল (২০০৭) জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে এ সরকারের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করে দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। সেনাপ্রধান দেশে সামরিক শাসন হচ্ছে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এ সরকারের মেয়াদকাল ২০০৮ সালেই শেষ হয়ে যাবে। সশস্ত্র বাহিনী সরকারকে এ মেয়াদের মধ্যে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করবে।

এ সরকারের বিকল্প কোনো সংস্থা নেই, যারা সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেবে। রাজনৈতিক দলসমূহ যদি সংস্কারকার্য নিজেরাই সমাধা করতে সক্ষম হতো, তাহলে দেশ বর্তমান সংকটের সম্মুখীন হতো না। বিদেশ থেকে কেউ এসে আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান করে দেবে না। তাই এ সরকারের আমলেই নির্বাচন কমিশন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই সহযোগিতা করবে। সুশীল সমাজ নামে যারা খ্যাত হয়েছেন, তাদের সাথে নির্বাচন কমিশন সংস্কার সম্পর্কে মতবিনিময় করেছে।

এ সংস্কারপ্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচন কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। রাজনৈতিক দলসমূহ সংস্কারে সম্মত না হলে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে সফল হতে পারবে না। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে রাজনৈতিক দলসমূহের উপর কোনো সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন উদ্যোগ নিয়েছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করলে সফলতা অনিবার্য।

এ সরকারকে ব্যর্থ হতে দিলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ সরকার ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন অপরিহার্য হতে বাধ্য। তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই আমাদের সবার স্বার্থেই বর্তমান সরকারকে সফল হতে সাহায্য করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। সাধারণত এ কথা দ্বারা বোঝানো হয় যে, সরকার যেন নির্বাচন কমিশনের উপর কোনো চাপ প্রয়োগ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোনো মহল থেকেই কমিশনের উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উপর কোনো মহলই অনাস্থা প্রকাশ করেনি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য দু জন কমিশনারের নিরপেক্ষতার প্রতি সকলেরই আস্থা রয়েছে। সরকার নির্বাচনের জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চৌদ্দদলীয় জোট ২০০৬ সালে তদানীন্তন নির্বাচন কমিশনকে মেনে নিতেই রাজি হয়নি। বর্তমান কমিশনকে মেনে নিলেও আওয়ামী লীগ বারবার চাপ প্রয়োগ করছে যে, নির্বাচন ত্বরান্বিত করতে হবে। তারাই ফটোসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ডের দাবি জানিয়েছিলেন। এর জন্য নির্বাচন কমিশন যে সময় প্রয়োজন বলে মনে করছে তা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত নন। এভাবে চাপ প্রয়োগ করলে এ কমিশনও বিতর্কিত হয়ে পড়বে।

ভোটার তালিকা তৈরি করার পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক তোলা হয়েছে। কমিশন ১২০০ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে এ কাজ সমাধা করতে চায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা করার কথা আইনে আছে বলে দাবি তোলা হয়েছে। কমিশন একটা আপস প্রস্তাব দিয়েছে যে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফরম দিয়ে আসা হবে; কিন্তু ভোটার হওয়ার জন্য ক্যাম্পে আসতে হবে। কারণ, ফটো তোলার যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য ক্যাম্পেই সুবিধা হবে। বিশেষ করে আইডি কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রস্তুত করতে হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করা অসম্ভব। আইডি কার্ড সবার জন্য অত্যাবশ্যক। এ কার্ড ছাড়া কোনো নাগরিকসুবিধাই কেউ ভোগ করতে পারবে না। এ কথা জনগণকে বোঝানো কঠিন নয় যে, ক্যাম্পে গিয়ে আইডি কার্ড না আনলে তাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে। তাই সবাই ক্যাম্পে গিয়ে ভোটার হওয়াও জরুরি মনে করবে। ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হতে হবে। এ সময়সীমা ঠিক রেখে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া উচিত।

দুর্নীতিপরায়ণ ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন চাইলে–

এ বিষয়ে কোনো মহলেরই দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দুর্নীতিপরায়ণ কোনো লোক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় এবং কালো টাকার মালিকেরা টাকার জোরে রাজনৈতিক দলের নমিনেশন খরিদ করতে না পারে।

সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদেরকে আইনের আওতায় এনে আদালতের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যদি দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকেরা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য বিবেচিত হয়ে যাবে।

এ প্রক্রিয়া ছাড়া দুর্নীতিপরায়ণ ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন আশা করা চলে না। এ কাজটি সমাধা করার জন্যও সময় দরকার। ২০০৮ সালের শেষদিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আশা করা যায় যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ সমাধা করতে সক্ষম হবে। তাই যারা দুর্নীতিবাজদের প্রভাবমুক্ত নির্বাচন চান, তাদেরকে নির্বাচন ত্বরান্বিত করার দাবি ত্যাগ করতে হবে।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার

গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমেই কোনো এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হয়ে থাকে। তাই রাজনৈতিক দলই গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান চালু রাখার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরেই যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু না থাকে, তাহলে গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ারই প্রবল আশঙ্কা থাকে।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের বিশ্বজনীন নীতিমালা নিম্নরূপ :

১. দলের এমন একটি গঠনতন্ত্র থাকতে হবে, যেখানে সর্বস্তরে দলের নেতৃত্ব, দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্থা (কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি, স্টান্ডিং কমিটি ইত্যাদি) নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার বিধান থাকতে হবে।

২. দলের সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট সংস্থার অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে। সংস্থার সকল সদস্যের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার সুযোগ থাকতে হবে।

৩. দলের সর্বস্তরে দলীয় রশিদ কেটে দলের তহবিলে অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আয় ও ব্যয়ের হিসাব অডিটযোগ্য হতে হবে। সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্থায় বছরে কমপক্ষে একবার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করতে হবে, যাতে দলীয় তহবিলের ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আসেন।

রাজনৈতিক দলের সংস্কারপদ্ধতি

সরকার ও নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের সংস্কার সম্পর্কে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিলে রাজনৈতিক দলসমূহ দলের নির্দিষ্ট ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাজনৈতিক দলের উপর সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। তবে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতিমালা গ্রহণ করতে কোনো দল সম্মত না হলে নির্বাচন কমিশন সে দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারবে।

ইতোমধ্যেই প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল ঘোষণা করেছে যে, ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলেই তারা দলীয় ফোরামে সংস্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গণতন্ত্রের সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন বিধি-বিধান মেনে নিতে কোনো দলেরই আপত্তি করার কথা নয়। বাস্তবে সকল নীতিমালা পালনে সকল দল সমান মানে সফল না ও হতে পারে। কিন্তু নীতিমালা অস্বীকার করা কোনো দলের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিনিময় হওয়া অত্যন্ত জরুরি। ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলেই এ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

জামায়াতে ইসলামীতে সংস্কারের প্রয়োজন নেই

২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহের মধ্যে আসনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম দল হলো বিএনপি, দ্বিতীয় দল আওয়ামী লীগ, তৃতীয় দল জামায়াতে ইসলামী ও চতুর্থ দল জাতীয় পার্টি। এ চারটি দলকেই প্রধান দল হিসেবে গণ্য করা হয়।

যেসব দিক দিয়ে রাজনৈতিক দলে সংস্কার প্রয়োজন বলে আলোচনা হচ্ছে, প্রধান দুটো দল তা করবে বলে ঘোষণা করেছে। একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনেই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এমন কোনো ত্রুটি নেই, যার সংস্কার প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল কয়েকটি টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার প্রদান করে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। সংস্কারমূলক যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো জন্মলগ্ন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে চালু রয়েছে বলে নতুন করে কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক মহলের অবগতির উদ্দেশ্যে জামায়াতের গোটা সাংগঠনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরিবেশন করছি :

জামায়াতের সাংগঠনিক পদ্ধতি

জামায়াতের উদ্দেশ্য হলো 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন' কায়েম করা। এটাই জামায়াতের স্লোগান। তাই জামায়াতে তারাই সংগঠনভুক্ত হন, যারা সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা করেন বা সৎ হওয়ার জন্য আগ্রহী। জনসভা, সমাবেশ, সুধী বৈঠক ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে জামায়াতের ঐ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সকলকে সংগঠনভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যারা সাড়া দেন তারা সহযোগী সদস্য হিসেবে সংগঠনে যোগদান করেন।

সহযোগী সদস্যদেরকে সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়

রাসূল (স) ১৩ বছর লোক তৈরি করার পর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে বর্বর আরব সমাজে আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র কায়েম করেছেন। সৎ লোক আপনা-আপনিই তৈরি হয় না, রেডিমেড পাওয়া যায় না। সৎ হওয়ার আগ্রহীদেরকে গড়ে তুলতে হয়। লোক তৈরির চার দফা কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনের ৪টি আয়াতে উল্লেখ করেছেন। জামায়াত ঐ কর্মসূচি অনুযায়ীই নিম্নরূপ পদ্ধতিতে লোক তৈরি করছে :

১. সহযোগী সদস্যদেরকে কর্মী হিসেবে সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থিত হতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যারা কর্মী হিসেবে সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির হয় তারা সেখানে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করেন, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন ও বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করেন।

২. তারা প্রতি মাসে নিয়মিত সাধ্যপরিমাণ টাকা জামায়াতের তহবিলে দান করেন।

৩. যারা নির্দিষ্ট মানে পৌছেন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ (রুকন) প্রদান করা হয় এবং তারা তাদের জান ও মাল আল্লাহর পথে কুরবানি করার শপথ গ্রহণ করেন।

৪. সদস্য বা রুকন হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়–

ক. পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা অর্জন;

খ. জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফরয ও ওয়াজিব পালন এবং হারাম বর্জন;

গ. বিশেষ করে আয়-রোজগার হালাল ও স্বচ্ছ হওয়া।

সংগঠনের বিভিন্ন স্তর

স্থানীয় জামায়াত, ইউনিয়ন জামায়াত, উপজেলা বা থানা জামায়াত, জেলা জামায়াত ও কেন্দ্রীয় জামায়াত।

কেন্দ্রীয় জামায়াতের আমীর ও মজলিসে শূরা (কাউন্সিল), কর্মপরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) ও নির্বাহী পরিষদ তিন বছর পরপর নির্বাচিত হয়। জেলা আমীর, জেলা মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ দু বছর পরপর নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট ৩টি স্তরে প্রতি বছরেই নির্বাচন হয়।

নির্বাচনপদ্ধতি

সর্বস্তরেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশন নির্দিষ্ট দিনে রুকনগণকে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমবেত করে। কমিশনার গঠনতন্ত্র থেকে ঐ ধারাটি পড়ে শোনান, যেখানে আমীর পদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি তাদের মধ্যে ব্যালট পেপার বিতরণ করে গোপনে একজনের নাম লিখে ব্যালট বাক্সে তখনই জমা দিতে বলেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ তখনই ভোট গণনা করে যিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়েছেন তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। ঐ সমাবেশেই নির্বাচিত ব্যক্তি আমীর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

আমীর পদের জন্য কেউ পদপ্রার্থী হন না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেউ তার আচরণে পদের আকাঙ্ক্ষী বলে প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদই বাতিল হয়ে যায়। রাসূল (স)-এর হাদীসই এ বিষয়ে এত কড়াকড়ির কারণ। তিনি বলেছেন, 'যে পদ চায় তাকে আমি দেই না।'

চাকরির জন্য প্রার্থী হওয়া দূষণীয় নয়, নেতৃত্বের পদের জন্য অবশ্যই দূষণীয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য ছাড়া নেতৃত্বের পদের জন্য লোভ করা স্বাভাবিক নয়।

জামায়াতে ইসলামীতে কখনো নেতৃত্বের কোন্দল হয় না; নেতৃত্বের লোভের কারণে দলে ভাঙনের আশঙ্কা থাকে না; নেতা নির্বাচনে প্রার্থিতা নেই বলে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে জনশক্তি বিভক্ত হয় না। তাই দলীয় ঐক্য স্থায়ী থাকে।

সর্বস্তরেই মজলিসে শূরার সদস্যগণ রুকনদের গোপন ভোটে নির্বাচিত হন। সেখানেও প্রার্থিতা নেই।

কেন্দ্রীয় আমীর ও মজলিসে শূরার নির্বাচনপদ্ধতি

কেন্দ্রীয় নির্বাচনে এত বিরাট সংখ্যক রুকনকে সমবেত করা বাস্তবসম্মত নয় বিধায় তা করা হয় না। এর পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক জেলা আমীরকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। তিনি জেলার রুকনগণকে সমবেত করে গোপন ব্যালটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ফলাফল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে পাঠান।

২. প্রার্থিতা না থাকায় সারা দেশের রুকনদের মধ্য থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি চিহ্নিত করা অনেকের পক্ষে দুরূহ হতে পারে। তাই আমীর পদের উপযুক্ত তিন জনের একটা প্যানেল কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা গোপন ভোটের মাধ্যমে বাছাই করে দেয়। ভোটাররা যেকোনো একজনকে ভোট দিতে পারেন। প্যানেলের বাইরেও অন্য যেকোনো রুকনকে ভোট দেওয়ার অধিকার গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত।

সিদ্ধান্ত গ্রহণপদ্ধতি

গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী সকল স্তরে আমীরগণ মজলিসে শূরার পরামর্শ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য। মজলিসে শূরায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই জামায়াতের ঐতিহ্য। কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হলে অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভিন্নমতের সবাই এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

দায়িত্বশীলদের সমালোচনার সুযোগদান

বছরে কমপক্ষে একবার সর্বস্তরে মজলিসে শূরার বৈঠকে আমীরসহ সকল দায়িত্বশীলকে জবাবদিহি করতে হয়। সর্বপ্রথম আমীর নিজেকে সমালোচনার উদ্দেশ্যে পেশ করেন। দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংগঠনিক জীবনে আপত্তিকর কোনো কিছু লক্ষ করে থাকলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শালীন ভাষায় মজলিসে শূরার সদস্যগণ আপত্তি প্রকাশ করেন। দায়িত্বশীল কৈফিয়ত দেন এবং ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে অকপটে স্বীকার করেন ও সংশোধনের ওয়াদা করেন। আপত্তি প্রকাশকারী যদি ভুল বুঝে আপত্তি করে থাকেন তাহলে দায়িত্বশীল তাঁর কাজের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেন।

এ পদ্ধতি চালু থাকার কারণে কারো কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে যথার্থ ফোরাম ছাড়া আলোচনা করা হয় না। সমালোচনা ও সংশোধনের এ সুযোগ না থাকলে নিন্দাচর্চার অবকাশ থাকে এবং সংগঠনে উপদল সৃষ্টির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। নেতাদের দোষ ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের এ গঠনতান্ত্রিক ঐতিহ্য জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বচ্ছ রেখেছে। তাই কোনো নেতার একনায়কত্ব, দাপট ও স্বেচ্ছাচার এখানে চলে না।

জামায়াতের তহবিল

জামায়াতের তহবিলকে ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী 'বাইতুল মাল' বলা হয়। এর আয়ের উৎস নিম্নরূপ :

ক. জামায়াতের রুকনগণ তাদের আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ প্রতি মাসে নিয়মিত দান করেন।

খ. প্রত্যেক কর্মী সাধ্যমতো প্রতি মাসে আয়ের একাংশ দান করেন। এ ছাড়া নিয়মিত কর্মী হিসেবে কেউ গণ্য হতে পারে না।

গ. সহযোগী সদস্য ও সমর্থকগণও মাসিক কিছু দান করেন।

ঘ. জামায়াতে তালিকাভুক্ত রুকন, কর্মী ও সহযোগী সদস্যগণের মধ্যে যারা বিদেশে থাকেন তারাও নিয়মিত মাসিক দান করেন।

বাজেট পদ্ধতি

প্রতি বছরের নিয়মিত ব্যয়ের জন্য কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন শাখায় বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটের অংক জেলা শাখাসমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়। জেলার বাজেট উপজেলা পূরণ করে। উপজেলার বাজেট ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা হয়।

অডিট পদ্ধতি

সংগঠনের সর্বস্তরে আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করার উপযোগী পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। কেন্দ্রীয় অডিটর কেন্দ্র ও জেলার বাইতুল মাল অডিট করেন এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে এর রিপোর্ট পেশ করেন। জেলার অডিটর উপজেলার বাইতুল মাল অডিট করেন এবং উপজেলার অডিটর ইউনিয়নের বাইতুল মাল অডিট করেন।

বিশেষ অভিযান

কেন্দ্রীয় ত্রি-বার্ষিক রুকন সম্মেলন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষ অভিযান চলে। যেমন ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য রুকনগণকে এক মাসের আয় দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কর্মী ও সমর্থকগণও এ জাতীয় অভিযানে সাড়া দেন।

আদর্শিক রাজনীতি বনাম ক্ষমতার রাজনীতি

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলসমূহের বিশ্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলা অপরিহার্য। সকলের জন্যই তা প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহকে চুক্তিবদ্ধ হওয়া

জরুরি। নিম্নলিখিত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক :

আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতি চাই, শুধু ক্ষমতার রাজনীতি নয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব ঘোষিত আদর্শ থাকতে হবে। দেশকে কোন্ আদর্শে দলটি গড়ে তুলতে চায় তা সুস্পষ্ট হতে হবে। ঐ আদর্শের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তোলার উপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। জনগণকে ঐ আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত করে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করবে।

ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics) আদর্শের ধার ধারে না। ছলে-বলে-কৌশলে কোনো রকমে ক্ষমতা দখল করার রাজনীতি মোটেই গঠনমূলক হতে পারে না। রাজনীতি করার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষমতা দখল হওয়া উচিত নয়। দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োজন। ক্ষমতা মাধ্যম মাত্র, চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; আদর্শ প্রতিষ্ঠাই চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আদর্শিক রাজনীতি ও গদিলাভের রাজনীতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ক্ষমতার রাজনীতি যাদের আসল লক্ষ্য তারা নীতির ধার ধারে না। তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। জাল ভোট দেওয়া, ব্যালট বাক্স লুট করা, ভোটকেন্দ্র জোর করে দখল করা, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে ভোটকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ব্যালট পেপার চুরি করা ইত্যাদি তাদের নির্বাচনী পদ্ধতি। তারা নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে এমন লোকদেরকেই প্রাধান্য দেয়, যারা অর্থবল ও জনবল প্রয়োগ করে বিজয়ী হওয়ার যোগ্য। এ জাতীয় দল ক্ষমতাসীন হলে দেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নির্যাতন ইত্যাদি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

যারা আদর্শিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তারা তাদের আদর্শে বিশ্বাসী লোকদেরকেই দলে সংগঠিত করেন এবং নির্বাচনে এ জাতীয় লোকদেরকেই নমিনেশন দেন। তারা অর্থের বিনিময়ে নমিনেশন বিক্রয় করেন না এবং অবৈধ উপায়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার অপচেষ্টা চালান না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

রাজনৈতিক দলসমূহ একই দেশের জন্য কাজ করছে। তাদের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্য ও বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বৈরী মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। অনেক সময় কোনো কোনো ইস্যুতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে থাকে। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগ এক প্লাটফরমে মিলিত হয়েও আন্দোলন করেছে। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত

যুগপৎ আন্দোলন করেছে। জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে একসাথে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। রাজনৈতিক ময়দানে স্থায়ী শত্রুতা ও মিত্রতা থাকে না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোনো অনুষ্ঠানে বা উৎসবে মিলিত হলে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করেন, যদিও রাজনৈতিক ময়দানে যথেষ্ট বিরোধ থাকে।

নির্বাচনে পারস্পরিক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের মধ্যে যখনই দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন তারা বন্ধুসুলভ হাত মিলান ও হাসিমুখে সৌজন্য প্রকাশ করেন। নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকেই। বিজিত দলের নেতা বিজয়ী দলের নেতাকে সৌজন্যমূলকভাবে মুবারকবাদ জানান– এটাই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। আমাদের দেশে এ ঐতিহ্য এখনো গড়ে ওঠেনি।

খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী দু দলের মধ্যে বিজয়ের উদ্দেশ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। কেউ জেতে, কেউ হারে। খেলা শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়রা কি মারামারি করে? এ মনোভাব রাজনৈতিক অঙ্গনেও পোষণ করা উচিত। সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে থাকে তাহলে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে হানাহানি হবে না। রাজনৈতিক ময়দানে গুণ্ডামি, সন্ত্রাস ও ইতরামি চালু থাকার কারণেই ভদ্রলোকেরা এ ময়দানে আসতে ভয় পায়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভদ্র, অশালীন ও ইতর ভাষা ব্যবহার করা হলে জনগণ তাদেরকে কেমন করে শ্রদ্ধা করবে? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার যোগ্য হতে হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত। জনগণের নিকট ও দেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় কর্মসূচি পেশ করার প্রতিযোগিতা হলে দেশবাসীর নিকট নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন। উত্তম আদর্শ, উন্নত কর্মসূচি ও মানসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা সর্বক্ষেত্রে দেশকে অগ্রসর করবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এ জাতীয় প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে যুক্তি ও বুদ্ধির হাতিয়ারই প্রাধান্য পাবে। রাজনীতিতে সহিংসতা ও বল প্রয়োগের অবসান ঘটবে। আমরা যদি এ ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি, তাহলে জনগণ আর রাজনীতিকে ভয় পাবে না। রাজনীতি তো জনগণের কল্যাণের জন্যই। জনগণ যে রাজনীতিকে ভয় পায় তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

৩১৯.

ইংল্যান্ড সফর

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন যে, প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালে আমি সস্ত্রীক ইংল্যান্ড যাই। এবার ১ জুন (২০০৭) ঢাকা থেকে রওনা হয়ে এসেছি। ঢাকার সময় সকাল পৌনে নয়টায় কাতার এয়ারলাইন্সের বিমানটি রওনা হয়। ৫ ঘণ্টা পর কাতারের রাজধানী দোহায় অবতরণ করে; ঢাকার সময় বিকাল সাড়ে ৩টায় দোহা থেকে রওনা হয়ে সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর ঢাকা সময় রাত এগারোটায় ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তখন স্থানীয় সময় বিকাল ৬টা। আমরা ঢাকা থেকে পশ্চিম দিকে এসেছি। বিমানের সাথে পাল্লা দিয়ে সূর্যও পশ্চিম দিকে দৌড়ানোর কারণে আমাদের দিন লম্বা হতে থাকে। সাড়ে ৯টায় সূর্য ডুবল। ঢাকায় সূর্য উঠল সোয়া পাঁচটায়, আর এখানে সূর্য ডুবল ঢাকার সময় রাত আড়াইটায়। আমাদের দিন দীর্ঘ হয়ে সোয়া ২২ ঘণ্টা লম্বা হলো। এখানকার সময় রাত এগারোটায় ইশার নামাযের সময় হলো। রাত ১১টায় যখন ঘুমাতে গেলাম তখন ঢাকার সময় সকাল ৫টা। ৬ ঘণ্টা আগেই আমাদের ঘুমের সময় হয়ে গেছে। ঘুমের সময়ের এ গরমিল দূর হতে ২/৩ দিন লেগে গেল। একদিন অসময়ে ঘুমিয়ে বকেয়া আদায় করা হলো।

১ সেপ্টেম্বর ঢাকা ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে। পূর্ণ তিন মাস এদেশে থাকা হচ্ছে। ম্যানচেস্টারে ৫ সপ্তাহ থেকে লন্ডনে দেড় মাস, আবার শেষ সপ্তাহ ম্যানচেস্টারে থেকে এখান থেকেই ৩১ আগস্ট রাতে রওনা হয়ে পরের দিন বিকালে ঢাকা পৌঁছার আশা রাখি।

যাতায়াত খরচ তো বাড়তেই থাকে। এবার দু জনের বিমান ভাড়াই লেগে যাচ্ছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। আমাদের ৪ ছেলে ও ১৭ জন নাতি-নাতনী এদেশে থাকে। এরা এত টাকা খরচ করে প্রতি বছর ঢাকা যেতে পারছে না বিধায় আমরা দু বুড়া-বুড়িকেই আসতে হচ্ছে। যতদিন স্বাস্থ্যে কুলায় প্রতি বছরই আসতে হবে।

রাজনৈতিক তৎপরতার পদ্ধতিগত সংস্কার

সকলেই স্বীকার করেন যে, রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো দেশসেবা ও জনকল্যাণ। তাই রাজনৈতিক তৎপরতার পদ্ধতি এমন হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, যার ফলে জনগণের দুর্ভোগ হয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয় ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট ও অবরোধের মতো কর্মসূচি দ্বারা সরকারকে অচল করা হলে সরকারের কোনো ক্ষতি হয় না; ক্ষতি হয় দেশের অর্থনীতির। উৎপাদন ব্যাহত হয়, দিনমজুরদেরকে বেকার থাকতে হয়, যানবাহন বন্ধ থাকায় জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে। লগি-বৈঠা-লাঠি ব্যবহার করে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ করা রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এটা জঘন্যতম হিংস্রতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। ২৮ অক্টোবর

(২০০৬) পল্টন মোড়ে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় শেখ হাসিনার লগি-বৈঠাধারীরা হিংস্র হামলা চালিয়ে যেভাবে রাজপথে পৈশাচিক নরহত্যা ও লাশের উপর নৃত্যোৎসব করেছে, তা আর যা-ই হোক রাজনীতি বলে গণ্য হতে পারে না।

তাই রাজনৈতিক দলসমূহকে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যে হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট, অবরোধের মতো কোনো কর্মসূচি রাজনৈতিক তৎপরতায় প্রয়োগ করা হবে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালে হরতালের কুফল দেখে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি বিরোধী দলে থাকলেও আর হরতাল করবেন না। এ ওয়াদা করে বিরোধী দলকে হরতাল থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি এ ওয়াদা পালন করেননি। জোট সরকারের আমলে তিনি আগের চেয়েও অধিক সংখ্যক হরতাল পালন করেছেন।

রাজনৈতিক দলসমূহ এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হলে নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে এসব নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা যেতে পারে। একদিনের হরতালে কোটি কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। একদিন বন্দর বন্ধ থাকলে কোটি কোটি টাকার রফতানি বন্ধ থাকে। আর অবরোধ হলে তো দেশই অচল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেমের তাগিদে আশা করি, এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে সম্মত হবেন।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদেরকে জড়িত না করা

কোনো স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যাপারে বিদেশের হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। রাজনৈতিক দলসমূহ ও এর নেতৃবৃন্দই সকল রাজনৈতিক ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। জনগণ যে দলকে নির্বাচিত করে, তাদের প্রস্তাবিত সমাধানই দেশবাসী গ্রহণ করেছে বলে মনে করা হয়। অন্য কোনো দেশ রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করলে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দেশ রীতিমতো অপমান বোধ করে এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

উন্নয়নশীল দেশ যেহেতু বিদেশি সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, সেহেতু বিদেশি সাহায্যকারীরা সাহায্য দেওয়ার সময় এমন সব শর্ত আরোপ করে এবং এত উপদেশ খয়রাত করে, যা স্বাধীন দেশের জন্য সম্মানজনক না হলেও উন্নয়নের প্রয়োজনে তা সহ্য করতে বাধ্য হয়। এ সুযোগে তারা রাজনৈতিক ব্যাপারেও মুরব্বিয়ানা করার অপচেষ্টা চালাতে পারে। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে অপচেষ্টা প্রতিরোধ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ, বেদনা ও চরম লজ্জার বিষয় যে, ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর শেখ হাসিনা আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতে গিয়ে ধরনা দিতে

লজ্জাবোধ করেননি। নির্বাচনে কারচুপি করে তাকে পরাজিত করা হয়েছে বলে তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নেতা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিদেশে গিয়ে এ জাতীয় অভিযোগ করেননি। জাতীয় সংসদে দু-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী জোট সরকারকে তিনি সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও তালেবান মার্কা সরকার বলে আখ্যায়িত করে এ সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য উসকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন।

তিনি যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন যে, জনগণ তাকেই ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশ্যে ভোট দিয়েছে কিন্তু নির্বাচন কমিশন, কেয়ারটেকার সরকার ও তার দল কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ষড়যন্ত্র করে তাকে পরাজিত করেছেন, তাহলে জনগণের ময়দানে এ অভিযোগ তুলে গণ-আন্দোলন করা তার কর্তব্য ছিল। জনগণ যদি সত্যি তাকেই ক্ষমতাসীন দেখতে চাইত তাহলে তার ডাকে সাড়া দিয়ে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জোট সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করত।

জোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তার ডাকে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত সাড়া না দেওয়ায় তিনি ২০০৪ সাল থেকে দীর্ঘ তিন বছর জোট সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের অপচেষ্টা চালিয়েছেন। তার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, জনগণ তার ডাকে মোটেই সাড়া দেয়নি।

তার দলের নেতৃবৃন্দই বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রদূতদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন; এমনকি রাষ্ট্রদূতদের একটি সমিতি পর্যন্ত গড়ে ওঠে। প্রতি মঙ্গলবারে তারা কোথাও সমবেত হয়ে আওয়ামী নেতাদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতেন। টিউসডে ক্লাব বা গ্রুপ নামে তাদের পরিচয় হয়। জোট সরকারের তীব্র প্রতিবাদের ফলে এ ক্লাবের তৎপরতা বন্ধ হয়।

২০০৬ সালের অক্টোবরে ২০০৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের পর আমেরিকা ও ইউরোপের কূটনীতিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে অতি উৎসাহের সাথে তৎপরতা চালান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়ে তাদেরকেই অধিক তৎপর মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে সমঝোতামূলক বৈঠকের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের প্রস্তাবক্রমে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিস তার বাসায় আপ্যায়নের আয়োজন করেন। এক পক্ষ যথাসময়ে সেখানে হাজিরও হয়; কিন্তু বিএনপি সেখানে যেতে অসম্মত হওয়ায় ঐ বৈঠক পণ্ড হয়ে যায়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিদেশিদেরকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে নাক গলানোর সুযোগ দেওয়ার ফলে বাংলাদেশ এখন বিদেশিদের রাজনৈতিক চারণভূমি।

১১ জানুয়ারি (২০০৭) জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সরকার নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করেছে। কোনো রাজনৈতিক দল এ কমিশন সম্পর্কে আপত্তি জানায়নি। শেখ হাসিনা চুপ থাকার পাত্রী নন। তিনিই যখন কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেননি তখন নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, এ কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এ সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। এ সরকার ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যেসব শর্ত দিয়েছিলেন, তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। ফটোসহ ভোটার তালিকা, আইডি কার্ড, দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকদেরকে নির্বাচনে শরিক না করা ইত্যাদি তো তারই দাবি।

শেখ হাসিনা যদি ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বর্জন না করতেন, তাহলে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হতো না। তিনি নির্বাচন বর্জন করায় বিদেশি কূটনীতিকগণ, এমনকি স্বয়ং জাতিসংঘ ঐ নির্বাচন বাতিল করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে নির্বাচন হবে কি হবে না, তা শেখ হাসিনার মর্জির উপর নির্ভর করে। আমেরিকা ও ইউরোপ, এমনকি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল পর্যন্ত তার পক্ষে রয়েছেন।

বাংলাদেশ আসামির কাঠগড়ায়

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকগণ হরহামেশাই সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে আসন্ন নির্বাচনের আয়োজন সম্পর্কে জানতে চান। বিদেশ থেকে একের পর এক ডেলিগেশন বাংলাদেশে এসে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। ভাবখানা এমন যে, যেন তাদের তাগাদা ও মনিটরিং ছাড়া এদেশে নির্বাচন সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে না। বাংলাদেশ যেন আসামির কাঠগড়ায়। বিদেশিরা এসে বাংলাদেশকে নির্বাচন সম্পর্কে জেরা করার অধিকার রাখেন এবং বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন, এমনকি সেনাপ্রধান পর্যন্ত তাদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশকে এমন লজ্জাজনক অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য শেখ হাসিনাই প্রধানত দায়ী। কবে এবং কিভাবে বাংলাদেশ এ লজ্জাজনক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে তা এখনই বলার উপায় নেই।

সরকার যদি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় এবং নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হয় তাহলে অনুমান করা হয়তো সম্ভব হবে যে, এদেশের রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে কি না।

রাজনীতিতে নাক গলানোর যে স্বাদ বিদেশিরা ভোগ করেছে, তা অব্যাহত রাখার সুযোগ পেলে তারা এ থেকে বিরত হবেন কেন? এটাই দেখার বিষয় যে, এ সুযোগ কারা অব্যাহত রাখতে চান।

শেখ হাসিনার বর্তমান ভূমিকা

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনার যে বিশেষ মেজাজ গড়ে ওঠেছে, তাতে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নিজেকে এদেশের শাসক মনে করেন। তিনি চান যে, এ দেশ তার মর্জিমতো চলতে হবে। যেসব দাবির দোহাই দিয়ে তিনি বিগত নির্বাচন বানচাল করতে সক্ষম হয়েছেন, সেসব দাবি পূরণ করার জন্য তিনি বর্তমান সরকারকে সময় দিতে প্রস্তুত নন। ফটোসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রস্তুত করার জন্য নির্বাচন কমিশন ১৮ মাস প্রয়োজন বলে মনে করে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এত সময় লাগবে কেন?

নির্বাচিত সংসদের অবর্তমানে বর্তমান সরকার রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ২০০৭-'০৮ সালের বাজেট ঘোষণা করতে বাধ্য। শেখ হাসিনা প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার আরো আগে নির্বাচন করে সংসদ বসাতে পারল না কেন? ২২ জানুয়ারির নির্বাচন তিনি হতে দিলেন না। এখন জুন (২০০৭) মাস। এ সরকার ১২ জানুয়ারি ক্ষমতায় এসেছে। এ ৫ মাসের মধ্যে কি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল বলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ দাবি করতে পারেন?

এ কথা প্রমাণিত যে, শেখ হাসিনা বিজয় নিশ্চিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। আশঙ্কা রয়েছে যে, এ সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন করতে তিনি দেবেন কি না। তিনি নির্বাচন বর্জন করতে চেয়েছেন বলে জাতিসংঘসহ গোটা বিশ্ব ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে দেয়নি। আবারও যদি তিনি নির্বাচন বর্জন করেন, তাহলে কী হবে সেটাই দেখার বিষয়। তিনি নির্বাচন আবার বানচাল করতে চাইলে সরকার কি ঠেকাতে পারবে? এ সরকার তার বিরুদ্ধে প্রেসনোট দিয়ে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা দিয়ে তাও ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। যার পক্ষে রয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপ এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, তাকে সমীহ না করে সরকারের উপায় কী? রাজনীতিতে শেখ হাসিনার এ প্রাধান্য বহাল থাকলে বিদেশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করা অসম্ভব।

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আচরণ

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালনায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতা যাচাই করেই সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। দলীয় সরকার চাপ সৃষ্টি করে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করতে বাধ্য করলেও প্রধানত মেধার ভিত্তিতেই তারা নির্বাচিত হন। এরপর বিভাগীয় ট্রেনিং তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করে। তাদের জন্য পাবলিক সার্ভিস রুল্‌স লিখিত আকারে আছে, যা তাদেরকে পালন করে চলতে হয়। তারা পাবলিক সার্ভেন্ট, দলীয় সরকারের সার্ভেন্ট নয়। তারা জনগণের সেবক। কোনো মন্ত্রী বা এমপি তাদেরকে দুর্নীতি ও অন্যায়

আচরণ করতে বাধ্য করতে পারেন না। বড় জোর কোনো কর্মকর্তাকে বদলি করে মনের ঝাল মেটাতে পারেন। যারা মন্ত্রী বা এমপির দুর্নীতিতে শরীক হতে সম্মত হয় তাদের কথা আলাদা; বরং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাই দুর্নীতির পথ দেখায়।

সরকার পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারীরা ও এমপিগণ যদি নীতিবান হন, তাহলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাও নীতিবান হতে বাধ্য হন। সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থেই সততা অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্বাচনে বিজয়ী দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট প্রকাশ পায়। পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে সরকারি কর্মকর্তারা ঐ মেনিফেস্টো বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। দলীয় সরকার ঐ মেনিফেস্টো বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেবে। এ ব্যাপারে যদি কেউ কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাহলে সরকার অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া সরকারি কর্মচারীদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কাজে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা কারো নেই। এ ঐতিহ্য আমাদের দেশে গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, যাতে সুশাসনের মান বৃদ্ধি পায়।

সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে তা অত্যন্ত অপমানজনক। জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যায়িত করে কেয়ারটেকার সরকার আমলে পাইকারিভাবে সকলকে অপসারণ করা হচ্ছে। ড. ইয়াজুদ্দিন আহম্মেদের কেয়ারটেকার সরকার আমলে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, ড. ফখরুদ্দিন আহমদের সরকার তাদেরকে অপসারণ করে। যাদেরকে বর্তমান সরকার নিয়োগ দিয়েছে তারা যে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়, এর কোনো প্রমাণ কি আছে? এভাবে সকল কর্মকর্তাকেই সন্দেহ করা হলে তাদের মর্যাদা অত্যন্ত খর্ব হয়।

এক সরকারের আমলে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে ঐ সরকারের দলীয় সমর্থক মনে করে অপসারণ করা হলে যাদেরকে নতুন সরকার নিয়োগ দেবে তারা ঐ সরকারের দলীয় সমর্থক হওয়ার অভিনয় করতে বাধ্য হবে, যাতে তাদেরকে সন্দেহ করা না হয়। এ অন্যায় প্রথার অবসান প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তাদেরকে দলনিরপেক্ষ মনে করতে হবে এবং চাকরি বিধি লঙ্ঘন ব্যতীত তাদেরকে শাস্তিমূলক বদলি করার কুপ্রথা বন্ধ করতে হবে।

ছাত্র-রাজনীতির সংস্কার

পাকিস্তান আন্দোলনে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচনে ভোটার হিসেবে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিক্ষিত হওয়ার কারণে তারা দেশের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন।

যেকোনো জাতীয় সংকটে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নাগরিক হিসেবে দেশের যে কোনো ইস্যুতে মতামত প্রকাশের অধিকার তাদের অবশ্যই রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়ের উদ্দেশ্যে তারা সংগঠিত প্রচেষ্টাও চালাতে পারে। এসব বিষয়ে কারোই দ্বিমত পোষণ করা স্বাভাবিক নয়।

যে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে তা হলো, রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো সমীচীন কি না?

বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল রয়েছে। প্রত্যেক দল নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণকে সংগঠিত করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচনে তাদের পছন্দের দলকে ভোটও দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এমনকি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতেও রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন নেই। কংগ্রেস ও বিজেপি ভারতের দেশব্যাপী প্রধান দুটো দল। ছাত্র কংগ্রেস বা ছাত্র বিজেপি নামে কোনো অঙ্গসংগঠন নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা অল্প বয়সী হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই আবেগপ্রবণ। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতায় যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করলে শিক্ষার পরিবেশ কিভাবে ধ্বংস হয় এর তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে সকলের আছে। বিশ্বের কোথাও শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক উত্তাপে বিধ্বস্ত নয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় না। আমাদের দেশের মতো সেশনজটের কলঙ্ক কোনো দেশে নেই। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আমাদের দেশে এক জঘন্য অভিশাপ।

১৯৪৪ সালে আমি ফজলুল হক মুসলিম হলের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ ক্লাসে ভর্তি হই। তখন কোনো রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন ছাত্র-অঙ্গনে সক্রিয় ছিল না। অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুসলিম লীগ। মুসলিম ছাত্রলীগ নামে যে সংগঠন ছিল, হল ইউনিয়ন ও ডাকসু নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব ছিল না। এসব নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হতো না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দুটো প্যানেল গঠিত হতো এবং নির্বাচন চলাকালে কোনো নামে প্রচারাভিযান চলত। নির্বাচনের পর ঐ নামের অবসান হয়ে যেত।

নির্বাচনে মেধাবী ছাত্ররাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। প্রচারাভিযানে প্রার্থীদের পরিচিতিমূলক হ্যান্ডবিলে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পরীক্ষায় কেমন সম্মানজনক অবস্থান ছিল এরই বিবরণ লেখা হতো। মেধাবী নয় এমন কোনো ডানপিটে ধরনের ছাত্রকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি।

দলীয় রাজনীতি শিক্ষাঙ্গন দখল করায় মেধাবী ছাত্ররা এখন হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আর পাত্তা পায় না। রাজনৈতিক দাপট প্রদর্শনের যোগ্য নেতারাই এখন হল নিয়ন্ত্রণ

করে। নির্বাচন হলে এ জাতীয় নেতারাই প্রার্থী হয়। রাজনৈতিক উত্তাপের ভয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইউনিয়নে বহু বছর থেকে নির্বাচনই হয় না। ডাকসু নির্বাচন তো ১৯৯০ সালের পর থেকে বন্ধ। রাজনৈতিক দলীয় ভিত্তিতে অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারই পরিণামে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং শিক্ষাঙ্গনের স্বার্থে সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষাজীবনের স্বার্থে দলীয় রাজনীতির লেজুড় হিসেবে কোনো ছাত্রসংগঠন থাকা কিছুতেই উচিত নয়। এ অপরাজনীতির ফলেই হল ইউনিয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন হতে পারছে না এবং ইউনিয়নের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এককালে যেসব গুণাবলি বিকাশ লাভ করত তা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এ বিষয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতিতে টেনে আনা মোটেই কল্যাণকর নয়। বেগম জিয়া ছাত্রদলকে একবছর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখেন এবং এ বিষয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার নিকট অনুরোধ জানান; কিন্তু তার নিকট থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি ছাত্রদলকে সক্রিয় হওয়ার জন্য অনুমতি দেন এবং ছাত্রদলের সভাপতি নিয়োগ করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন নয়। জামায়াত ও ছাত্রশিবির একই ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী হলেও সংগঠন হিসেবে ছাত্রশিবির সম্পূর্ণ পৃথক। ছাত্রশিবিরের নেতৃত্ব নির্বাচনে জামায়াতের পক্ষ থেকে সামান্য হস্তক্ষেপেরও সুযোগ নেই। শিবিরের সদস্যগণ প্রতি বছর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের সভাপতি নির্বাচন করে। তাদের কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদেরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের সংগঠন পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের কোনো দায়িত্ব ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর নেই। শিক্ষাঙ্গনে তারা নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট। তাদের মিটিং-মিছিলে জামায়াতের স্লোগান শোনা যায় না।

দেশবাসী আশা করে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন চালু না রাখার যে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে, তা সকল রাজনৈতিক দলই মেনে নেবে এবং শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক সংঘাত থেকে মুক্ত রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

৩২০.

শ্রমিক সংগঠনে সংস্কার

১৯ শতকের শেষদিকে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ১ মে তারিখে শ্রমিকসমাজ দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করার দাবি আদায় করতে গিয়ে পুলিশের গুলির মুখে বুক পেতে দেয়। তাদের এ আত্মত্যাগকে সারা বিশ্বের শ্রমিকসমাজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং প্রতি বছর ১ মে তারিখে 'মহান মে দিবস' পালন করে।

তখনও কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি। কার্ল মার্কসের 'শ্রমিকরাজ তন্ত্রের' ভিত্তিতে যখন কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন তারা শ্রমিকসমাজকেই বেছে নেয়। 'কারখানার মালিকানা শ্রমিকদের হতে হবে'– এ আকর্ষণীয় স্লোগান দিয়ে কমিউনিস্টরা শ্রমিকসমাজকে বিদ্রোহী করে তোলে। কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের কমিউনিস্ট নেতাদেরকে তোয়াজ করতে বাধ্য হয়। মালিকদের নিকট থেকে শ্রমিকদের কিছু স্বার্থ আদায় করে কমিউনিস্ট নেতারা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকদেরকে আন্দোলনে ঠেলে দিয়ে মালিকদের নিকট থেকে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করে নেতারা বিলাসী জীবন যাপন করতে থাকে।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কমিউনিস্ট নেতাদের এ খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিকরাজ কায়েমের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। সমাজতন্ত্র এর পিতৃভূমি রাশিয়াতেই আত্মহত্যা করার পর কমিউনিস্ট নেতারা এ ময়দান ত্যাগ করে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢুকে পড়ে। শ্রমিক ময়দানে থাকাকালে জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের সামান্য প্রভাবও ছিল না। এনজিওগুলোর মাধ্যমে তারা গণভিত্তি রচনার চেষ্টা করছে।

কমিউনিস্টদের শ্রমিক ময়দান ত্যাগ করার পর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকসমাজে দলের অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। পূর্বে শ্রমিক সংগঠনগুলো কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত। এখন তারা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাদের স্লোগানে রাজনৈতিক দাবির প্রাধান্য দেখা যায়; অথচ শ্রমিকদের অধিকারের আওয়াজ এতটা প্রবল নয়।

শ্রমিক সংগঠনের ভিত্তি হলো ট্রেড ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization- ILO) জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ সনদ শ্রমিকদেরকে এ অধিকার দিয়েছে যে, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করতে পারবে। Collective Burgeining Agency (CBA)-এর মর্যাদা লাভ করার মতো জনশক্তি যে শ্রমিক সংগঠনের আছে, এর প্রতিনিধি ত্রিপক্ষীয় কমিটির সদস্য হতে পারবে।

আন্তর্জাতিকভাবে এটা স্বীকৃত যে, শ্রমিকরা Trade Union করতে পারবে। অর্থাৎ, সংগঠিত হয়ে দাবি জানাতে পারবে। কিন্তু এ দাবি আদায় করতে গিয়ে যাতে মালিকপক্ষের সাথে সংঘর্ষের কারণে উৎপাদন বন্ধ না হয়ে যায়, সে জন্য সরকারের শ্রম বিভাগ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিকপক্ষের সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় (Tripartite) কমিটি শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সরকারপক্ষ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে উভয় পক্ষকে সমঝোতায় পৌছতে সাহায্য করবে। এ পদ্ধতিতে বিনা সংঘর্ষে শ্রমিকরা তাদের যোগ্য অধিকার লাভ করে, মালিকেরাও কারখানার অস্তিত্ব রক্ষা করে যথাসাধ্য স্বার্থ ত্যাগ করতে সম্মত হয়। এ চমৎকার পদ্ধতিতে শ্রমিক-মালিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হওয়ারই কথা।

২০০৬ সালের শেষদিকে সাভার ও গাজীপুরে চরম শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করা হয়। যেসব কারখানার মালিক ঐ চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না তাদেরকে চাপ দেওয়ার জন্য মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব নিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যারা চুক্তি অনুযায়ী বেতন দিতে সক্ষম হবেন না তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

শ্রমিকসমাজকে ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠন করতে দিলে এবং ত্রিপক্ষীয় কমিটি যথাযথ দায়িত্ব পালন করলে শ্রমিক-অঙ্গনে সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক নয়।

শ্রমিক মহলে শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা বহাল রাখার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গসংগঠন হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে পৃথক সংগঠন থাকা মোটেই সমীচীন নয়। যে কারণে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকা উচিত নয়, সে একই কারণে শিল্পাঙ্গনেও শ্রমিকদের মাঝে অঙ্গসংগঠন থাকা অনুচিত।

সম্প্রতি (জুন ২০০৭) গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল কাদের স্বীকার করেছেন যে, ২০০৬ সালে শ্রমিক মহল অসন্তোষ ও আন্দোলনের নামে যে জ্বালাও-পোড়াওয়ের ঘটনা ঘটেছে, তা আওয়ামী লীগের উদ্যোগেই হয়েছে। কারখানা জ্বালিয়ে দেওয়া ও লুট করায় যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তাদের সম্পর্কে মালিকেরা মন্তব্য করেছেন যে, তাদের কারখানার শ্রমিকরা এসব করেনি; বহিরাগতরাই করেছে।

শ্রমিক ময়দানে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন না থাকলে এমন নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে পারত না। তাই দেশের স্বার্থে, উৎপাদন ও উন্নয়নের স্বার্থে, সর্বোপরি শ্রমিকদের স্বার্থেই তাদের মাঝে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকা উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর এ বিষয়েও চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

নির্বাচনী সংস্কার

সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে কতক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলসমূহের সম্মতির উপর নির্ভর করে; আর কতক এমন রয়েছে, যা বাস্তবায়ন সম্ভব কি না তা প্রশাসনের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কতক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই :

১. ফটোসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজ ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য নতুন তালিকা তৈরি করার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছিলেন।

২০০০ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা বহাল রেখে হালনাগাদ ভোটার তালিকা তৈরি করার দাবিতে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। আওয়ামী আইনজীবীরা ঐ মামলায় বিজয়ী হন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ সকলেই আওয়ামীপন্থি। বিচারপতিগণের নিকট সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী তাদের অধিকাংশই আওয়ামীপন্থি। নির্বাচন কমিশন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করে। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। ফলে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা গেল না।

ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ২০০৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে কেন নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে দেওয়া হলো না, সে রহস্য উপলব্ধি করা কঠিন। যাহোক, এবার ফটোসহ নতুন ভোটার তালিকা তৈরির বিরুদ্ধে এখনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। আশা করি, এ কাজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সুচারুরূপে সমাধা হবে।

২. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন (Registration)।

নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজনৈতিক দলসমূহকে নির্বাচন কমিশনের প্রণীত শর্তাবলি মেনে নিয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। কোনো দল নিবন্ধিত না হলে নির্বাচন কমিশন সে দলকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেবে না। নিবন্ধিত হতে হলে রাজনৈতিক দলকে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে–

ক. কমপক্ষে ৩২ জেলা এবং এসব জেলার সকল উপজেলায় দলের অফিস ও নির্বাচিত কমিটি থাকতে হবে।

খ. দলের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা নির্বাচিত হতে হবে বলে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

গ. দলের আয়ের উৎস ঘোষণা করতে হবে।

ঘ. ছাত্র-অঙ্গন ও শ্রমিকসমাজে দলের কোনো অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে না।

ঙ. বিদেশে দলের কোনো শাখা থাকা চলবে না।

নিবন্ধনের জন্য এসব শর্ত রাজনৈতিক দলের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের আছে কি না, এ প্রশ্ন ওঠতেই পারে। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ যেসব শর্ত মানতে সম্মত হয়, সেসব নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যেসব শর্ত প্রধান প্রধান দল মেনে নিতে সম্মত হবে না, সে সম্পর্কে কমিশন কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? নির্বাচন কমিশন কি কোনো শর্তের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের সাহায্য নিতে পারবে? যেমন শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে যদি সুপ্রিম কোর্টের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। ভবিষ্যতে রাজনীতিকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাতিল করতে চান, তাহলে জাতীয় সংসদে তা করতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন কোনো শর্ত চাপিয়ে দিতে দৃঢ়চিত্ত হলে তা করতে পারবেন। দেশকে আর অরাজক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার শর্তাবলি

দেশের সংবিধানে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, এর অতিরিক্ত কোনো শর্ত আরোপ করার কোনো ইখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। সকল নাগরিকেরই ভোট দেওয়ার অধিকারের সাথে ভোট পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কে জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য আর কে অযোগ্য, এর ফায়সালা ভোটাররাই করবে। দুর্নীতির অপরাধে যারা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হবে, তারা তো সংবিধান অনুযায়ীই অযোগ্য বলে গণ্য হবে। তাই এ বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কোনো শর্ত আরোপের প্রয়োজন নেই।

'নির্বাচনে প্রার্থীকে অন্তত গ্রাজুয়েট হতে হবে'– এ জাতীয় কোনো শর্ত আরোপ করা অযৌক্তিক। জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য কোনো ডিগ্রিধারী হওয়া জরুরি নয়। জনগণের মাঝে বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী ব্যক্তি নির্বাচনে উচ্চ ডিগ্রিধারীকে পরাজিত করেছেন, এমন বহু নজির রয়েছে।

নির্বাচনে টাকার খেলা ঠেকানো

গত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে, কালো টাকার মালিক বা বড় ব্যবসায়ীরা প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল থেকে মোটা অংকে নমিনেশন খরিদ করে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে। রাজনীতিবিদ হিসেবে গণপরিচিতি না থাকায় তারা দলীয় প্রতীকের জোরে বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত নয় মনে করে নির্বাচনী এলাকায় টাকার খেলায় মেতে ওঠে;

কোটি কোটি টাকা নির্বাচনী অভিযানে বিনিয়োগ করে; তরুণ ও যুবকদের যত রকম ছোট-বড় সংগঠন আছে তাদেরকে আকর্ষণীয় অংকের অর্থ দান করে; এলাকার খেলার ক্লাব, পাঠাগার, যুব সমিতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়ে তাদেরকে প্রার্থীর পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য নিয়োগ করে; এলাকার স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ইত্যাদিতে মোটা অংকের অনুদান দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমর্থন হাসিলের চেষ্টা করে; হাটে-বাজারে ও উল্লেখযোগ্য স্থানে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে এলাকার ভোটারদের জন্য বিনোদন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে; প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সর্বত্র ব্যানার টাঙিয়ে দেয়; প্রার্থীর নামে তোরণ তৈরি করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উদ্যোগে প্রার্থীর নেতৃত্বে মিছিল-মিটিং করে ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তার করে; ভোটের দু-একদিন আগে খামের ভেতর টাকা নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দোআ চেয়ে বেড়ায়। যারা টাকা পায় তারা নাকি ভোট দেয়। তারা বেঈমানি করে না। তারা নাকি মনে করে যে, নগদ যখন পেলাম তখন ভোট দেব; অন্যকে দিলে তো আর কিছু পাব না। এভাবেই কালো টাকার মালিকেরা টাকার জোরে নির্বাচনে জিতে যায়।

টাকার এ খেলা ঠেকানোর জন্য নির্বাচন কমিশন যেসব বিধিমালা ঘোষণা করে থাকে, তা অমান্য করলেও এর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। কমিশন নির্বাচনী অভিযানে ৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করতে পারবে না বলে প্রার্থীদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রার্থীরা হিসাবপত্র জমা দিয়ে দেখান যে, তারা ৫ লাখ টাকার বেশি খরচ করেননি। টাকা ছড়ানোর যে বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে, এ সবই নির্বাচনী আচরণবিরোধী; কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা ঠেকাতে সক্ষম হয় না।

নির্বাচনী চুক্তি প্রয়োজন

নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে নিম্নরূপ চুক্তি হতে হবে :

১. যারা দলের সাংগঠনিক তৎপরতায় সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে দীর্ঘ দিন দলের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকেই দলীয় কর্মীদের সম্মতি নিয়ে নমিনেশন দিতে হবে।

২. নমিনেশন পাওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের কিছু দিন পূর্বে যারা এক দল থেকে অন্য দলে যোগ দিতে চায় তারা সুবিধাবাদী। তাদের কোনো নীতি ও আদর্শ নেই। এ জাতীয় স্বার্থবাদী লোকদেরকে দলে গ্রহণ করা হলেও তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সুবিধাবাদীদেরকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে উৎখাত করা প্রয়োজন।

৩. অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক যেসব কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাদেরকে দলীয় তৎপরতায় একটা নির্দিষ্ট সময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি তাদের নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। দলে আসার সাথে সাথেই তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া উচিত নয়।

৪. জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ সেবার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে নমিনেশন দিতে হবে।

৫. নমিনেশন কোনো বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। যে দল টাকার বিনিময়ে নমিনেশন দেয় সে দল নমিনেশন ক্রেতা থেকে অধিক দুর্নীতিবাজ। যে টাকা দিয়ে নমিনেশন খরিদ করতে চায়, সে যে দুর্নীতির মাধ্যমে এ টাকা সুদে-আসলে উসুল করতে চায় তা সুস্পষ্ট। যদি দেশ সেবা ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই সে নমিনেশন চায় তাহলে এত টাকা নিজের গাঁট থেকে কেন খরচ করবে? যে টাকা নমিনেশন কিনতে ও নির্বাচনী অভিযানে ব্যয় করতে চাচ্ছে তা জনসেবায় ব্যয় করলেই তো পারে, যদি সত্যিই জনসেবা তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের জন্য যে আচরণবিধি প্রণয়ন করে, তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হলে শুধু বিধি ঘোষণা করা অর্থহীন।

টাকার খেলা বন্ধ করার একমাত্র উপায়

জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব :

১. দেশের উন্নয়ন ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

২. যাকিছু দেশ ও জনগণের জন্য ক্ষতিকর সেসব রহিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. উপরিউক্ত দুটো বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

৪. সরকারের নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ডে কোনো ত্রুটি লক্ষ করলে সংসদে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। শুধু বিরোধীদলীয় সদস্য নয়, সরকারি দলের সদস্যদেরও সংশোধনের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। দলের স্বার্থের চেয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়াই সদস্যদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের দেশের প্রচলিত নির্বাচনপদ্ধতি কতটুকু সহায়ক, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। ঐ পদ্ধতি উপরিউক্ত দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য অধিকতর উপযোগী বলে আমার ধারণা। তাই উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। আমার ধারণা যে, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি বহাল রেখে

টাকার খেলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। টাকার খেলা বন্ধ করার একমাত্র উপায়ই হলো ঐ বিকল্প পদ্ধতি।

অবশ্য আগামী নির্বাচন প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ীই হবে। এ পদ্ধতি একমাত্র জাতীয় সংসদই পরিবর্তন করতে সক্ষম। এ সত্ত্বেও আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও সুস্থিরভাবে বিবেচনা করার সুযোগ দিতে চাই, যাতে এ বিষয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং মতবিনিময় চলতে থাকে।

বর্তমান নির্বাচনপদ্ধতি

জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের জন্য বাংলাদেশকে ৩০০টি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। বিভিন্ন দলের মনোনয়ন নিয়ে প্রার্থীরা নির্বাচনী এলাকায় জনগণের নিকট ভোটপ্রার্থী হয়। ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করা যায়।

এ পদ্ধতিতে যারা নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী হয় তারা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাদের জন্য এটা ব্যক্তিগত মান-ইজ্জতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা বিজয়ী হওয়ার জন্য সব রকম ছল, বল, কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করে। বিশেষ করে তারা সাধ্যেরও বাইরে টাকা-পয়সা বিনিয়োগ করে। ব্যাপকভাবে টাকার খেলা চলে, যার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থীর পক্ষে যারা নির্বাচনী কর্মী হিসেবে রাত-দিন জান-প্রাণ দিয়ে সময় ও শ্রম দান করে, প্রার্থী বিজয়ী হলে তারা বিনিময়ে অনেক কিছু আশা করে এবং এমপি সাহেবের পেছনে রাত-দিন লেগে থাকে। এমপি দেশ ও জাতির জন্য চিন্তা করার সময়ও পান না। পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ের আশায় নির্বাচনী কর্মীদের দাবি পূরণে রাত-দিন তদবিরে ব্যস্ত থাকে। তাদের দাবি পূরণ করা না হলে তারা পরবর্তী নির্বাচনে তাকে পরাজিত করে প্রতিশোধ নিতে পারে।

নির্বাচনী এলাকায় জনগণের যত ছোট-বড় সমস্যা আছে তার সমাধানের দায়িত্ব এমপি সাহেবের উপর বর্তায় বলে এলাকাবাসী মনে করে। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদ স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধানের চেষ্টা করলে এবং এসব পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে চিন্তা, সময় ও শ্রম দিতে হয় না।

এমপি সাহেব অবশ্যই ঐসব পরিষদকে সমস্যার সমাধানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে সহায়তা করবেন। কিন্তু তার প্রধান দায়িত্ব হলো, জাতীয় সমস্যার সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। আমাদের দেশের এমপিগণের অনেকেই অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন জাতীয় সংসদের কাজ যথাসময়ে শুরুই করতে পারেন না। যারা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এমপি হয়েছেন, তারা এ টাকা উদ্ধার করে আরো অতিরিক্ত মুনাফা জোগাড়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েন। সংসদে যাওয়ার সময় তাদের হাতে নেই।

বিকল্প পদ্ধতি

নির্বাচনের আরেকটি পদ্ধতি জার্মানি ও তুরস্কসহ বহু দেশে প্রচলিত। সে পদ্ধতিতে গোটা দেশকে একই নির্বাচনী এলাকা গণ্য করা হয়। কোনো ব্যক্তিকে এলাকাভিত্তিক প্রার্থী করা হয় না। ব্যক্তির বদলে দলকে প্রার্থী হিসেবে পেশ করা হয়।

প্রত্যেক দল নিজেদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ভোটারদের নিকট পেশ করবে। ভোটাররা বিভিন্ন দলের মেনিফেস্টোর মধ্যে তুলনা করে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের মাপকাঠিতে যাচাই করে তাদের পছন্দের দলকে ভোট দেবে।

পার্লামেন্টের মোট আসনসংখ্যার সমান বা কমসংখ্যক ব্যক্তির তালিকা প্রত্যেক দল নির্বাচন কমিশনে পেশ করবে। জনগণও জানবে যে, কোন্ দলের তালিকায় কাদের নাম শামিল রয়েছে। দলের যোগ্যতম লোকের নাম তালিকার শীর্ষে থাকবে। যোগ্যতার মান অনুযায়ী তালিকাটি প্রস্তুত করা হবে।

প্রদত্ত ভোট গণনার পর যে দল যত ভোট পেয়েছে, সে অনুপাতে পার্লামেন্টে আসন পাবে এবং দলের প্রদত্ত তালিকার প্রথম নাম থেকে শুরু করে দলের জন্য বরাদ্দ সংখ্যার নাম নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। কোনো দল প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যার শতকরা ৫ বা যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার কম ভোট পেলে সে দল পার্লামেন্টে কোনো আসন পাবে না।

এ পদ্ধতির সুফল

১. প্রত্যেক দলের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হওয়ায় পার্লামেন্টের মান অনেক উন্নত হবে। ছোট দলের যোগ্যতম ব্যক্তিরাও নির্বাচিত হতে পারেন।

২. কোনো প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে ভোটারদের দুয়ারে ধরনা দিতে হবে না এবং ভোটের জন্য কোনো প্রার্থীর টাকার খেলায় মত্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

৩. মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে পছন্দের দল তালাশ করার কারণে ভোটারদের মান বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান ব্যাপক হবে।

৪. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচনী কর্মীদের দাবি পূরণের মুসিবত থেকে মুক্তি পাবেন এবং দেশ ও জনগণের খিদমতে তাদের মেধা, সময় ও শ্রম পূর্ণরূপে নিয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

৫. এ পদ্ধতি চালু হলে প্রতিভাবান, মেধাবী, চিন্তাশীল ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে রাজনীতির মান উন্নত করতে অবদান রাখার সুযোগ পাবেন এবং দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থপর লোভী ব্যক্তিদের থেকে রাজনীতি মুক্তি পাবে।

এ পদ্ধতি সম্পর্কে আপত্তি

মানবরচিত কোনো পদ্ধতিই শতকরা ১০০ ভাগ ক্রটিহীন নয়। নির্বাচনের এ পদ্ধতি সম্পর্কেও আপত্তি করার মতো পয়েন্ট আছে। যেমন– এ পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি ও

ভোটারদের মাঝে সরাসরি তেমন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, যেমন অপর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এ আপত্তি খণ্ডন করে বলা যায় যে, যিনি জনপ্রতিনিধি তিনি যে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি ঐ দলীয় সংগঠনের দায়িত্বশীল হয়ে থাকলে জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালনকালে অবশ্যই জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছেন। তাই তিনি গণবিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। আরেকটি আপত্তি তোলা হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তি যেভাবে এলাকার উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন, অপর পদ্ধতিতে তা হতে পারে না। এর জবাবে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব স্থানীয় উপজেলা ও জেলা সরকার পালন করবে। জাতীয় সংসদের সদস্যের উপর এ দায়িত্ব না থাকাই উচিত।

নির্বাচনের উভয় পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করলে যেকোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে, টাকার খেলা বন্ধ করতে হলে, দুর্নীতিপরায়ণদেরকে ঠেকাতে হলে এবং সুস্থ গণতন্ত্র ও উন্নত মানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই সর্বদিক দিয়ে অধিক উপযোগী। এ পদ্ধতির নাম Proportional System of Representations (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি)। প্রত্যেক দল মোট প্রদত্ত ভোটের প্রাপ্ত সংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব পাবে।

এ বিষয়ে আমার একটি পুস্তিকা ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ১৬ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটির নাম 'জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি'। প্রাপ্তিস্থান: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা।

৩২১.

রাজনৈতিক দলে ভাঙা ও গড়ার পটভূমি

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনী মহাজোট অংশগ্রহণ করার পরপরই এরশাদের বিরুদ্ধে এক মামলার রায়ের ফলে নির্বাচন কমিশন এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করে। এরশাদকে বাদ দিয়ে তার দল নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এরশাদ মহাজোট নেত্রীর দুয়ারে ধরনা দিলে শেখ হাসিনা এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করেন যে, মহাজোট নির্বাচন বর্জন করছে।

নির্বাচন বানচালের জন্য কারা কিভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরিস্থিতি সৃষ্টি করল তা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত লিখেছি। জরুরি অবস্থা জারির সাথে সাথেই নতুন কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচন ঠেকাতে সক্ষম হওয়ায় মহাজোট নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হয়ে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উৎসাহের সাথে শরীক হন।

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ মাত্র তিন মাস এবং তাদের একমাত্র দায়িত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করা করা; কিন্তু যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন মুলতবি হলো এবং নির্বাচন বর্জনকারীরা যেসব দাবিতে অবরোধ আন্দোলন করে দেশকে অচল করে দিল তাতে সকল মহলই অনুভব করল যে, নতুন সরকারের মেয়াদ কিছুটা দীর্ঘ হতেই হবে। কতটা দীর্ঘ হওয়া উচিত তা গত ১২ এপ্রিল (২০০৭) প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার পূর্বে কারো জানা ছিল না। জানা গেল, ২০০৮ সালেই তার সরকারের মেয়াদ শেষ হবে এবং এর পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্য হাসিল করতে হলে তিনটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে :

১. ফটোসহ নতুন ভোটার তালিকা এবং সম্ভব হলে সকল নাগরিকের পরিচিতিমূলক কার্ড (আইডি কার্ড) প্রস্তুত করতে হবে।

২. দুর্নীতিপরায়ণ ও কালো টাকার মালিকেরা যাতে নির্বাচিত হতে না পারে এবং রাজনীতিতে সৎ ও যোগ্য লোকদের নেতৃত্ব যাতে সম্ভব হয় সে উদ্দেশ্যে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদেরকে আইনের আওতায় এনে আদালতে দণ্ডিত করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতান্ত্রিক বিধি পূর্ণরূপে পালন করতে হবে। পরিবারতন্ত্র গণতান্ত্রিক নয়; পরিবারভিত্তিক নেতৃত্ব পরিবর্তন করতে হবে। রাজনৈতিক দলসমূহকে নির্বাচন কমিশনের প্রণীত শর্তসমূহ পূরণ করে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

উপরিউক্ত তিনটি কাজ সমাধা করার পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে গেলে আবার রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। প্রথম দুটোর কাজ তো পুরোদমে চলছে; কিন্তু তৃতীয় কাজটি খুবই জটিল ও কঠিন। এ কাজ করা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকেই এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ থাকায় এ কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলসমূহ দাবি জানাচ্ছে যে, ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ অবিলম্বে দেওয়া হোক, যাতে রাজনৈতিক দলে সংস্কারের কাজ দ্রুত আরম্ভ করা যায়। আমেরিকার বিদায়ী রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস বিদায় হয়ে যাওয়ার পূর্বে চারটি প্রধান দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ উপলক্ষে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে এ দাবি সমর্থন করলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নও এর পক্ষে ওকালতি করেছে; কিন্তু সরকার ঘরোয়া রাজনীতি বহাল করতে আরো বিলম্ব করতে চাচ্ছে।

বিলম্বের কারণ

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারকে সাংবিধানিক সরকার বলা চলে না। কেয়ারটেকার সরকারকে সংবিধান যেসব দায়িত্ব দিয়েছে এর অতিরিক্ত অনেক কাজে এ সরকার হাত দিয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারের জন্য সংবিধান যে মেয়াদ বরাদ্দ করেছে, এ সরকার এর চেয়ে ৮ গুণ বেশি দীর্ঘ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ সরকারের একমাত্র ভিত্তি সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা ও জনগণের বাধ্যতামূলক সমর্থন। সমর্থন করা ছাড়া জনগণের কোনো উপায় নেই। আর সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা থাকায় সরকারও নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী ও সরকারের একটা বিরাট উৎকণ্ঠা রয়েছে। নির্বাচনের পর যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে, সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা থেকে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এ সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি বৈধ বলে স্বীকৃত না হলে সেনাপ্রধানসহ এ সরকারের সকল উপদেষ্টাকে মহাবিপদে পড়তে হবে।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটই বিজয়ী হতো। নির্বাচন না হওয়ায় সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিএনপি। তাই বেগম জিয়ার নেতৃত্বেই যদি বিএনপি আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয় তাহলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও পরবর্তী সরকারের অনেক কাজকেই তারা হয়তো বৈধতা দেবে না। তাই সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানের খড়গ বিশেষভাবে বিএনপি'র উপরই পতিত হয়েছে। শেখ হাসিনা তখন খুশি হয়ে এ সরকারের সব কাজকেই বৈধতা দেবেন বলে ঘোষণা করেন।

পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন যখন দুর্নীতি দমনের অভিযান জোরদার করে, তখন শেখ হাসিনার আস্থাভাজন দলীয় নেতারাও দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনরাই গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে এমন সব তথ্য পরিবেশন করেছেন, যার ভিত্তিতে স্বয়ং শেখ হাসিনাও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় যদি আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয় তাহলে তারাও সরকারের অনেক কাজের বৈধতা দেবে না।

সঙ্গত কারণেই এ সরকার মনে করে যে, শেখ হাসিনার অপরাজনীতির কারণেই জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছে এবং ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বানচাল হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা বিদেশে থাকাকালে সরকার তার বিরুদ্ধে যে প্রেসনোট জারি করেছিল তাতে বলা হয়েছে, 'সাম্প্রতিক অতীতে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দায়িত্বহীন লাগাতার আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতিতে দেশের জনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে।' শেখ হাসিনাকে

বিদেশ থেকে ফিরে আসা রোধ করার উদ্দেশ্যে জারি করা উক্ত প্রেসনোট হাইকোর্টের ভয়ে ও আন্তর্জাতিক চাপে প্রত্যাহার করতে সরকার বাধ্য হলেও উক্ত প্রেসনোটে শেখ হাসিনা সম্পর্কে সরকারের অভিমত সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

সরকারের আশঙ্কা যে, প্রধান দুটো দলের নেতৃত্ব দুই নেত্রীর হাতে থাকলে দলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু হবে না। তারা নিজের ছেলেদেরকেই দলের নেতৃত্বে বসিয়ে একসময় বিদায় নেবেন। এভাবে পরিবারতন্ত্র স্থায়ীভাবে চালু থেকে যাবে। দলের নেতৃত্ব মেধা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে দুই নেত্রীকেই রাজনীতি থেকে বিদায় করতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই বেগম জিয়াকে বিদেশে নির্বাসিত করা ও শেখ হাসিনাকে বিদেশ থেকে ফিরে আসতে না দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দুর্নীতির দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে অপসারণের প্রচেষ্টা চলছে। অবশ্য সর্বোচ্চ আদালতে যদি তারা দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে কারো আপত্তি করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়া পর্যন্ত ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হলে দুই নেত্রী দলের নেতৃত্বে আগের চেয়েও বেশি মযবুত হয়ে বসার সুযোগ পেয়ে যাবেন। দুই নেত্রীর ব্যক্তিত্ব ও দাপটে দলের যেসব নেতা দলে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব দিতে এ পর্যন্ত সাহস পাননি, তাদেরকে দলের নেতৃত্ব দখলের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিতে সরকার বিলম্ব করা প্রয়োজন মনে করছে। আইন উপদেষ্টা স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন, সরকার গণতান্ত্রিক সংস্কারের সুযোগ দিচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন, নির্বাচনের পূর্বেই গণতন্ত্রের রোডম্যাপ কায়েমের প্রচেষ্টায় সরকার নিয়োজিত। তিনি এ কথা গোপন রাখেননি যে, সরকার রাজনৈতিক দলের সংস্কারের পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিতে বিলম্ব করছে।

নতুন দল গঠনপ্রচেষ্টা

এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই নতুন দল গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রধান দুই দলের বিকল্প হিসেবে একটি নতুন দলের জন্য কারিশমাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন। ঘটনাক্রমে ঠিক ঐ সময় নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের সর্বমহলের মোবারকবাদ পেয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তাকে কারিশমাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করে হয়তো অনেকেই তাঁকে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকবেন। সরকার তাঁকে রাজনৈতিক দল গঠনে সরাসরি প্রেরণা দিয়েছেন কি না, তা আমার জানা নেই। তবে জরুরি অবস্থায় যখন রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল তখন একমাত্র ড. মুহাম্মদ ইউনূসই নতুন দল গঠনের তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন এবং মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বলেই সবাই ধারণা করে।

২০০৬ সালে শেখ হাসিনার চৌদ্দদলীয় জোটের তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দেখে ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক হিসেবে যত বিবৃতি ও বক্তব্য পেশ করেছেন, তাতে তিনি যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠ ছিলেন। শেষদিকে তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় তাদের দ্বারা সমালোচিত হন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। এমনকি দলের নামকরণও করে ফেলেছিলেন। 'নাগরিক শক্তি' নামক দলটির গঠনপ্রক্রিয়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় সবাই বিস্মিত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করা থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, যারা তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তারা রাজনৈতিক ময়দানে অগ্রসর হতে সম্মত হননি।

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক আছেন, যারা যথেষ্ট রাজনৈতিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বহু বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। তারা পত্রিকায় কলাম লিখেন; কিন্তু তারা রাজনৈতিক ময়দানে আসেন না। এ ময়দান যে বড়ই কঠিন তা সবাই উপলব্ধি করেন। এ ময়দান ফুলশয্যা নয়; অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ। আজ মন্ত্রিত্বের আসনে আছেন, কাল কারাগারে বন্দী। জনগণকে সংগঠিত করা যে কত শ্রম ও কষ্টসাধ্য তা কে না জানে? তাই যারা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন তারা রাজনীতি করার ঝামেলা পোহাতে চান না। সৎ, যোগ্য ও প্রতিভাবান লোক এ ময়দানে না এলে ময়দান তো শূন্য থাকবে না। সুবিধাবাদী, দুর্নীতিবাজ, অসৎ স্বার্থপরদের জন্য এ ময়দান ছেড়ে দিয়ে যারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে নীতিবাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট মনে করেন তারা কি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তিপনা চালু থাকার দায় এড়াতে পারেন?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ময়দান থেকে সরে যাওয়ার পর নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়; কিন্তু কারিশমা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাবে জনগণের মাঝে এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। অবশ্য ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যাপারে ময়দানে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেছে।

প্রধান চারটি দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য তিনটি দলের কিছু লোক নতুন দল গঠনে সক্রিয় মনে হয়েছিল; কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া না গেলে এ প্রচেষ্টা হয়তো সফল না-ও হতে পারে।

প্রধান দুই দলে ভাঙনের লক্ষণ

বিএনপি'র প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা জেলে আবদ্ধ আছেন। সে তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা বাইরেই বেশি আছেন। উভয় দলের নেতাদের

মাঝেই দলের সংস্কারের পক্ষে বেশ কতক নেতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। উভয় দলেই সংস্কারবাদীদের বক্তব্য একই রকম।

ক. দলের গঠনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক দিক দিয়ে সংশোধন করতে হবে।

খ. দলীয় প্রধানের একক সিদ্ধান্তের ক্ষমতা বাতিল করতে হবে।

গ. দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কেউ দলীয় পদে থাকতে পারবেন না।

ঘ. দলীয় প্রধানের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকবে না।

ঙ. দলের নির্দিষ্ট ফোরামে অবাধ মতবিনিময়ের পর ভোটের মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ নিজ নিজ দলের নেত্রীর নিকট পেশ করা হবে। যদি নেত্রী এসব গ্রহণ করতে সম্মত হন তাহলে তারই নেতৃত্বে এসব বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আর যদি তিনি এসব প্রস্তাব বিবেচনা করতেই সম্মত না হন, তাহলে নেত্রীকে মাইনাস করেই সংস্কারপন্থিগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

উভয় দলের নেতৃবৃন্দ যদি সংস্কারপন্থি ও সংস্কারবিরোধী হিসেবে বিভক্ত হয়ে পড়েন তাহলে একই নামে দুটো দল সৃষ্টি হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে নতুন দলে অনেকেই যোগদান করতে পারেন। তবে যদি নেত্রী দুর্নীতি মামলার ধকল কাটিয়ে ওঠতে পারেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষিত না হন তাহলে নেত্রীর বিরোধী উপদল মূল দলের নামে বিকল্প হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না।

জিয়াউর রহমানের আমলে মিজানুর রহমান চৌধুরী সভাপতি হয়ে মালেক উকিলের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিকল্প আওয়ামী লীগ গঠন করেছিলেন; কিন্তু শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর তা টিকেনি। ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর বিএনপি নামটি দখল করে স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী ও শাহ আজিজুর রহমান পৃথক সংগঠন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তার দলের সভাপতি থাকাকালে এ প্রচেষ্টা চলেছিল; কিন্তু বেগম জিয়া ময়দানে আসায় তা পণ্ড হয়ে গেছে।

আওয়ামী লীগ নামটি শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই শেখ পরিবারের কেউ দলের হাল ধরলে এ নামে আর কোনো নেতা পৃথক দল করে টিকতে পারবেন না। যেমন বাকশাল নাম ব্যবহার করে আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্ব টিকেনি। তেমনিভাবে বিএনপি নামটি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ঐ পরিবারের কেউ দলের হাল ধরলে এ নামে আর কারো নেতৃত্ব টিকবে না। উভয় দলেই এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যার নেতৃত্বে দল ঐকবদ্ধ থাকতে পারে। তাই দুই নেত্রী দলের নেতৃত্বে না থাকলে উভয় দলেরই অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি সরকার সমর্থিত দলে যোগদান করবে।

ড. ফখরুদ্দীন সরকারের সমর্থক একটি দল অতি প্রয়োজন

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার যাকিছু করছে তা আগামী নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়া অত্যাবশ্যক। তা না হলে এ সরকারের যে কোনো কাজ অসাংবিধানিক বলে অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করার সুযোগ থেকে যায়। তাই এমন একটি বা একাধিক রাজনৈতিক দল থাকা প্রয়োজন, যাতে আগামী নির্বাচনে তারা সংসদে অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকারের যাবতীয় কার্যাবলিকে বৈধতা দান করতে পারে।

জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে সামরিক শাসন থাকায় তারা ক্ষমতার দাপটে রাজনৈতিক দল সহজেই গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। সরকারপ্রধানের নেতৃত্বে তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। এমপি ও মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতায় শরীক হওয়ার লোভে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে অনেকেই সরকারি দলে যোগদান করেছেন। সামরিক শাসনে সশস্ত্র বাহিনীর লোক সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে; কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর লোক দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না। জেনারেল আইয়ুব খান প্রায় চার বছর সামরিক শাসন চালানোর পর ১৯৬২ সালে যখন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাকেও রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয়েছে। রাজনৈতিক দলের জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। যে কোনো যোগ্য লোককে মন্ত্রী বানানো যায়; কিন্তু যারা আগে থেকে রাজনৈতিক ময়দানে কর্মতৎপর তাদেরকে ছাড়া রাজনৈতিক দল গঠন করা সম্ভব নয়। রাজনীতিও একটি শিল্প। প্রত্যেক শিল্পেই অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। জনগণকে সংগঠিত করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক ছাড়া রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা যায় না।

সেনাশাসক রাজনৈতিক দল গঠন করে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পরও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলে কোনো সমস্যা হয় না। তার নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী হয়ে সামরিক শাসনামলের সকল কার্যাবলিকে বৈধতা দান করে দিতে পারে; কিন্তু ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারের পেছনে সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও এটা সামরিক সরকার নয়। নির্বাচনের পর নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এ সরকারকে বিদায় নিতে হবে। তারা চান যে, নতুন একটি রাজনৈতিক দল সংগঠিত হোক; কিন্তু এ দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো সুযোগ ড. ফখরুদ্দীন বা অন্য কোনো উপদেষ্টার নেই। ড. মুহাম্মদ ইউনুসের মতো কারিশমাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিত্ব ময়দানে দেখা যাচ্ছে না বলে নতুন দল গঠিত হলেও সে দলের ক্ষমতাসীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। এটাই বর্তমান সরকারের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা।

সরকারের কাঙ্ক্ষিত দল গঠনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মোটেই সঠিক নয়। প্রধান

দুটি রাজনৈতিক দলে যে সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে তা সফল হলে নতুন দল গঠনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। তাই অবিলম্বে ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

সরকারের শঙ্কার কোনো কারণ নেই

যে পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে, তাতে সকল স্তরের জনগণ স্বস্তিবোধ করছে। সরকার দুর্নীতি দমনের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাতে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। ফটোসহ নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে জনগণ উৎসাহী। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার যে সময়সীমা ঘোষণা করেছে, এতে শেখ হাসিনা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক নেতা আপত্তি করেননি। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে এ সরকারের জনপ্রিয়তা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। তাই নির্বাচিত সংসদে এ সরকারের বৈধতা নিশ্চিতভাবেই স্বীকৃতি পাবে। এ বিষয়ে সরকারের শঙ্কার কোনো কারণ নেই। এ সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেনি। সশস্ত্র বাহিনীর উদ্যোগেই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। তাই আশা করা যায় যে, জাতীয় সংসদ সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। তাই অবিলম্বে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা প্রয়োজন, যাতে রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কাঙ্ক্ষিত সংস্কারকর্ম সমাধা করতে সক্ষম হয়।

ম্যানচেস্টারে পাঁচ সপ্তাহ

আগেই লিখেছি যে, এবার (২০০৭) তিন মাসের জন্য বেড়াতে এসেছি। ম্যানচেস্টার এ দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগর। আমার তিন ছেলে ও বড় ছেলের এক ছেলে এখানে থাকে। ছোট ছেলে ও বড় নাতি লন্ডনে থাকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এখানে পাঁচ সপ্তাহ থেকে লন্ডন যেতে হবে। আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়াযযামের বড় ছেলে সোহায়লও ম্যানচেস্টারে থাকে। এদের সবার বাসায়ই বেড়াতে হবে। লন্ডনে দেড় মাস থেকে ম্যানচেস্টারে ফিরে আসতে হবে এবং এখান থেকেই ৩১ আগস্ট ঢাকা রওয়ানা হওয়ার কথা রয়েছে।

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর ম্যানচেস্টার শাখা পুরুষদের ৪টি ও মহিলাদের ৪টি করে মোট ৮টি প্রোগ্রাম আমাকে নিয়ে সাজিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দুটো করে প্রোগ্রামে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলছে। ঢেঁকির এ দায়িত্ব লন্ডনে গিয়েও পালন করতে হবে। এ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ উদ্দেশ্যে আমাকে নিতে চাচ্ছে; কিন্তু কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছি। দেশেও ঢাকার বাইরে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে আমি যাই না বা যেতে পারি না।

ঢাকার অসহ্য গরম থেকে পালিয়ে এসে এখানে বেশ আরামেই আছি। আমি শীতকাতর নই, গরমকাতর। গরম সহ্য করতে বেশ কষ্ট পাই। ১ জুন যখন এখানে পৌঁছলাম, আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীন বলল, 'আপনারা ঢাকা থেকে গরম নিয়ে

এসেছেন। এখানে কয়েকদিন যাবৎ গরম পড়ছে।' এখানে শীত না থাকাকেই গরম বলা হয়। তা না হলে তেমন গরম নয়। গরম বেশি হলে টেবিল ফ্যানের সামান্য বাতাসই যথেষ্ট। এখানে পৌঁছার প্রথম সপ্তাহে দু দিন কিছু সময় ফ্যান ব্যবহার করতে হয়েছে। পরের সপ্তাহে একটানা চার দিন বৃষ্টি। দিনের বেলাও সোয়েটার গায়ে দিচ্ছি। বেশ আরামই বোধ করছি। রাতে কম্বল গায়ে দিয়ে আরামে ঘুমাই।

দিন এত লম্বা যে, শেষ হতে চায় না। পৌনে দশটায় সূর্য ডুবে। জুনে এগারোটারও ৫/৭ মিনিট পর ইশার নামাযের সময় হয়। ৩টার পরই ফজরের সময় শুরু হয়ে যায়। ১২টার আগে বিছানায় যাওয়াই হয় না। ৩টায় রাত শেষ হয়ে যায়। বাংলাদেশের ফজরের আগে শেষরাত বলে একটা সময় থাকে। এ দেশে শেষরাত নেই। দুপুর রাতই শেষ রাত।

৩২২.

বাংলাদেশে আদর্শিক সংঘাত

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা করেছি। রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রের চর্চার অভাব, রাজনৈতিক তৎপরতায় অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ, নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নেওয়া, অবৈধ উপায়ে সম্পদশালী হওয়ার লিপ্সা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে দেশ মহাসংকটকাল অতিক্রম করছে।

স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ একনায়কত্বের কবলে পড়েছে। মুজিব হত্যার পর গণতন্ত্রের পথে যাত্রার শুরুতেই সামরিক একনায়কত্বের খপ্পরে পড়ে। দীর্ঘ ৯ বছর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র বহাল হলো। সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি চালু হয়েছে। এ পদ্ধতিতে তিনটি জাতীয় নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দেশ-বিদেশের সকল পর্যবেক্ষক সাক্ষ্য দিয়েছেন। পরাজিত হওয়ার কারণে একটি দল নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নেওয়ার ফলে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সরকার গণতন্ত্র বহাল করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা যদি সফল হয় ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন সম্ভব হয়, তাহলে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট কেটে যেতে পারে।

কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক ময়দানে আদর্শের যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা যে কোনো সময় আবার সংকট সৃষ্টি করতে পারে। আদর্শের দু পক্ষ যদি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দায়িত্ব দিতে সম্মত হয় তাহলে আশা করা যায়, বড় কোনো সংকট সৃষ্টি হবে না। একই দেশে দুটো বিপরীত আদর্শ একসাথে চালু থাকতে পারে

না। দেশ কোন্ আদর্শ অনুযায়ী চলবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি উভয় পক্ষ মেনে নিলে কোনো সংঘর্ষ হবে না। নির্বাচনের পর নির্বাচন হতে থাকলে একসময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।

বিপরীতমুখী দুই আদর্শ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দুটো বিপরীতমুখী আদর্শের দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা অত্যন্ত স্পষ্ট–

১. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ ও ভারতের আধিপত্যবিরোধী স্বাধীন চেতনা।

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ভারতের আধিপত্যকামী।

রাজনৈতিক দলসমূহ এ দুটো আদর্শের ভিত্তিতেই বিভক্ত। রাজনৈতিক জোট গঠনের সময় এ দুটো আদর্শের ভিত্তিতেই দলগুলোর মধ্যে মেরুকরণ হয়। অবশ্য নির্বাচনী জোটে সাময়িকভাবে শুধু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো দল আদর্শকে উপেক্ষা করে থাকে।

সকল পেশার মাঝেই এ আদর্শিক বিভক্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আইনজীবী, সাংবাদিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক সমিতিসমূহ, শ্রমিকসমাজ, ছাত্রমহল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারসহ সকল ক্ষেত্রেই এ বিভক্তি সুস্পষ্ট।

সাধারণ জনগণ এ আদর্শিক চেতনার ধারক না হলেও নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বিভক্তির শিকার হয়। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের সচেতন জনশক্তি দুটো বিপরীতমুখী আদর্শে বিভক্ত।

ঐ দুটো আদর্শের বিশ্লেষণ

প্রতিটি আদর্শের মধ্যে তিনটি দিক রয়েছে–

> ক. জাতীয়তার দিক, খ. রাষ্ট্রীয় নীতির দিক ও গ. সার্বভৌমত্বের দিক। জাতীয়তার দিক দিয়ে পার্থক্য হলো, বাংলাদেশি বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রীয় নীতির দিক দিয়ে পার্থক্য হলো, ইসলামী মূল্যবোধ বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সার্বভৌমত্বের দিক দিয়ে পার্থক্য হলো, ভারতের আধিপত্যবিরোধী বনাম আধিপত্যবাদের সমর্থক।

আমরা এ তিন দিক দিয়ে আদর্শের দুটো পক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করছি। রাজনৈতিক দলগুলো এ দুটো পক্ষে বিভক্ত হয়ে আছে।

জাতীয়তার দিক

জাতীয়তার দিক দিয়ে এক পক্ষ হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী আর অন্য পক্ষ হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদী।

ক. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের যুক্তি :

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের জনগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের নামের ভিত্তিতেই জাতি হিসেবে পরিচিত। এক দেশে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার মানুষ থাকলেও সকল নাগরিক রাষ্ট্রভিত্তিক নামেই পরিচয় দেয়। তাদের পাসপোর্টে ঐ পরিচয়ই লেখা হয়। যেমন ভারতীয়, পাকিস্তানি, নেপালি, জাপানি, চিনা, আমেরিকান, কনাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, সৌদি, মিসরি, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলের পূর্বে বাংলাদেশি নাগরিকদের পরিচয় পাসপোর্টে লেখা হতো বাঙালি। বাঙালি বললে বাংলাভাষী বোঝায়। বাংলাদেশি উপজাতিসমূহের ভাষা বাংলা নয়। অথচ তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তারা বাংলাদেশি; বাঙালি নয়।

তাছাড়া অনেক বাংলাভাষী বা বাঙালি বাংলাদেশের বাইরেও রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও আসামের একাংশে অনেক বাংলাভাষী বা বাঙালি রয়েছে। বাঙালি বললে শুধু বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাভাষীদেরকেই বোঝায় না। তদুপরি ভাষার ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্রীয় পরিচয় হয় না। ইংরেজি ভাষা ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ আরো অনেক দেশের রাষ্ট্রভাষা। তারা কেউ ইংরেজ জাতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেয় না। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের জনগণের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা আরবী; কিন্তু তারা আরব জাতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেয় না; রাষ্ট্রের নামের ভিত্তিতেই তাদের পরিচয় হয়।

তাই বিশ্বজনীন রীতি, পদ্ধতি ও যুক্তির ভিত্তিতেই বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলেই রাষ্ট্রের নামের ভিত্তিতে বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশি জাতি। রাষ্ট্রের নাম 'বেঙ্গল' হলে বাঙালি বা বেঙলি জাতি বলা সমীচীন হতো।

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের যুক্তি :

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সকল নাগরিককে একক বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতিকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উপজাতিরা নিজেদেরকে বাঙালি গণ্য করতে মোটেই সম্মত নয়। তাই তারা বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভারত তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে সাহায্য করে। তাদের উপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়ার কারণেই তারা বিদ্রোহী হয়ে গেল। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯৮ সালে তথাকথিত একটি শান্তি চুক্তির নামে উপজাতিদেরকে এতটা স্বাধীনতা দান করেছেন, যার ফলে পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসরত বাঙালিরা নিজ দেশে পরাধীনে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগ এখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে জিদ ধরে আছে। এর পক্ষে তাদের নিকট কী যুক্তি রয়েছে তা বোধগম্য নয়। শেখ মুজিবের অন্ধ সমর্থন ছাড়া অন্য কোনো যুক্তি আছে কি না তা স্পষ্ট নয়। শেখ মুজিব তাদের নিকট আরাধ্য দেবতাতুল্য। তাই তারা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে দাবি করলেও গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশালী একদলীয় শাসন কায়েমের পক্ষে জাতীয় সংসদে অন্ধ সমর্থন জানিয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষেও ঐ অন্ধ সমর্থনই একমাত্র যুক্তি।

বাঙালি যদি সত্যি কোনো জাতি হিসেবে গণ্য হতে পারে তাহলে বাংলাদেশের বাইরে ভারতের বাঙালিরাও এ জাতির অন্তর্ভুক্ত। যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও আসামের বাঙালি এলাকার সমন্বয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করা কর্তব্য। এ জাতীয় কোনো পরিকল্পনা যদি আওয়ামী লীগের না থাকে তাহলে তাদের এ বিষয়ে জিদ ত্যাগ করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকেই মেনে নেওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় নীতির দিক

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে লেখা হয়, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। এ সংশোধনী একটি মৌলিক বিষয় বিধায় তা গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রিসভা সংবিধান সংরক্ষণের ওয়াদা করে শপথ নিয়েছিলেন; অথচ প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই তার দলীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করতে লজ্জাবোধ করেননি। সংবিধান থেকে তার প্রিয় আদর্শ উৎখাত হওয়ার পর সংবিধানবিরোধী মতবাদকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অবৈধ। সংবিধান সংশোধন করে তার আদর্শকে পুনরায় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করার অধিকার তার আছে; কিন্তু সংবিধানবিরোধী আদর্শকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমর্থন করার কোনো অধিকার তার নেই। এটা রীতিমতো রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি না, তা তিনি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

সংবিধানের ৮ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে'। এ কারণেই ইসলামী মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য। এটা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে 'রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার যাবতীয় কার্যাবলির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না; ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।' ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মের বিশ্বাসীরা এ নীতি মেনে নিয়েছে; কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে, তারা এ নীতিকে কুফরী মতবাদ বলে মনে করে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের বিপরীত

ধর্মের প্রচলিত অর্থে 'দীন ইসলাম' শুধু একটি ধর্ম নয় এবং ইসলাম কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানসর্বস্বও নয়; ইসলাম আল্লাহর প্রণীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবে প্রয়োগ করে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা রূপায়িত করে গেছেন।

মানবজীবনের অনেক দিক রয়েছে– ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। ইসলাম এসব দিকের জন্যই ভারসাম্যপূর্ণ ও নির্ভুল বিধান দিয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল (স) এসব দিকের মধ্যে শুধু ধর্মীয় দিকের বিধানটুকু মেনে নিলেই যথেষ্ট হবে বলে স্বীকার করেননি; বরং সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ইসলামের সবটুকু মানার নির্দেশ দিয়ে সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের অনুকরণ করো না।'

এ আয়াতে জীবনের সকল দিকের জন্য রচিত ইসলামী বিধান মেনে চলার জন্য ঈমানদারদেরকে হুকুম করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোনো একটি দিকের বিধান মেনে চলে না, সে এর বদলে অন্য যে বিধানই মানুক, তা শয়তানের অনুকরণ হিসেবে গণ্য হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শুধু ইসলামের ধর্মীয় দিকের বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট মনে করে; আর সকল দিকের বিধান মানতে অস্বীকার করে। কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান না মেনে অন্য বিধান মানলে তা শয়তানের বিধান বলে আল্লাহর নিকট গণ্য। জীবনের কোনো দিক তো শূন্য থাকতে পারে না। কোনো না কোনো বিধান তো মানতেই হয়। রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামী বিধান মানতে অস্বীকার করলে অন্য যে বিধানই মানা হোক তা শয়তানের অনুকরণ বলে ঐ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর কোনো হুকুমকে অস্বীকার করাকেই কুফরী কাজ বলা হয়। আর ধর্মীয় দিক ছাড়া অন্য সকল দিকে ইসলামকে মানতে অস্বীকার করা কত বড় কুফরী তা হিসাব করে দেখলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে 'মহাকুফরী মতবাদ' বলতে বাধ্য হতে হয়।

মুসলিম জাতির সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের লড়াই

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার এ যুদ্ধে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে যে, যুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে মি. গান্ধি ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দল ঘোষণা করল যে, ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে এবং ভারতের হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সকল ধর্মের লোক এক ভারতীয় জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হবে। এ রাষ্ট্রের আদর্শ হবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের মার্চে লাহোরে দলীয় সম্মেলনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিল যে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে অবশিষ্ট ভারত থেকে পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।

তখন ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪০ কোটি, যার মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যাই ১০ কোটি। অখণ্ড ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে ৩০ কোটি অমুসলিমের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। ইংরেজ চলে গেলেও স্বাধীন ভারতে ১০ কোটি মুসলমান অমুসলিমদের অধীন হয়েই থাকতে বাধ্য হবে। এ মুসিবত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ ঘোষণা করল যে, মুসলিম জাতি একটি পৃথক জাতি। মুসলিম জাতি গোটা ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জাতি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী নয়। মুসলিম জাতি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী তাদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবন পরিচালনা করবে।

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর স্বাধীন ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকবে, নাকি বিভক্ত হবে এবং মুসলিম জাতি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের নাগরিক হবে, নাকি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ লাভ করবে– এ বিষয়ে ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঐ নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানরা শতকরা ৯৭ ভোট পাকিস্তানের পক্ষে প্রদান করেছে। ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান জনগণের সিদ্ধান্তেই স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান না হলে বর্তমান বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া তো দূরের কথা, ভারতের একটি প্রদেশের মর্যাদাও পেত না। বাংলাদেশ তখন অখণ্ড বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে একটি প্রদেশ মাত্র হতো।

মুসলমানরা যদি কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করতে সম্মত হতো তাহলে ভারত বিভক্ত হতো না। মুসলিম জাতি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই ভারতকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং এরই ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তাই বাংলাদেশের ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ নয়; বরং এ মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই

যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে আখ্যায়িত করতে চান, তারা নিজস্ব মতাদর্শকে গণভিত্তিক মনে করেন। যদি এ মতবাদের কোনো ভিত্তি জনগণের মধ্যে প্রোথিত থাকত তাহলে ১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ উচ্চারিত হতো। জেনারেল জিয়াউর রহমান শুধু মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারই নন; স্বাধীনতার ঘোষকও। তাঁরই নেতৃত্বে যখন সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত করা হয়েছে, তখন আওয়ামী লীগ নেতারা সামান্য

আপত্তিও উত্থাপন করতে সাহস পাননি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণভোটে অংশগ্রহণ করেছে। তখন জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব বলে তারা মনে করেননি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য ভোট দিয়েছিল। পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্য জনগণের ছিল না; কিন্তু ভুট্টো ও ইয়াহইয়া খান ষড়যন্ত্র করে ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখতে গিয়ে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধ করতে বাধ্য করেছেন। জনগণ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভোট দেয়নি। এটাই যদি জনগণের উদ্দেশ্য হতো তাহলে গণভোটের মাধ্যমে তা উৎখাত করা সম্ভব হতো না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট একটি বিশেষ প্রশ্ন

শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে যারা নামায পড়েন, রোযা রাখেন এবং হজ্জ করেন, তারা কার হুকুমে এসব ইবাদত করেন? এসব হুকুম তারা কোথায় পেলেন? তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, আল্লাহর হুকুমেই তারা তা করেন এবং এ হুকুম তারা কুরআন থেকেই পেয়েছেন। তাহলে এ কথা সত্য যে, তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মান্য করেন। তাদের রাজনৈতিক বক্তৃতায় 'ইনশাআল্লাহ' কথাটি বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন। নির্বাচনী স্লোগানে তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' বলে থাকেন।

যে কুরআনকে তারা আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করেন, সে কুরআন যে রাসূল (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে তাঁকে নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করেন। আল্লাহ, রাসূল (স) ও কুরআনকে যদি তারা বিশ্বাসই করেন তাহলে নামায-রোযা-হজ্জের মতো ধর্মীয় বিধানগুলো মানাকেই কি তারা যথেষ্ট মনে করেন? কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানগুলোকে না মানার পক্ষে তাদের নিকট কী যুক্তি রয়েছে? রাসূল (স)-কে কি শুধু নামায-রোযার বেলায় অনুকরণ ও অনুসরণ করা যথেষ্ট মনে করেন? তারা কি রাসূল (স)-কে শুধু ধর্মনেতা মনে করেন? আল্লাহ তাআলা কি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল (স)-কে সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করার নির্দেশ দেননি? মুহাম্মদ (স) কি শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ছিলেন? রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় কি তিনি রাসূল ছিলেন না?

আল্লাহ তাআলা কি আংশিকভাবে রাসূল (স) ও কুরআনকে মানার অধিকার কাউকে দিয়েছেন? যারা মুসলিম দাবি করে তাদেরকে ইসলামের সবটুকু মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু বিধান মানে এবং কিছু অংশ মানতে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আন এবং কিছু অংশকে অস্বীকার কর? যারা এমনটি করে তাদের জন্য এ ছাড়া আর কী বদলা হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদেরকে কঠিন আযাবে নিপতিত করা হবে।' (সূরা বাকারা : ৮৫)

মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন?

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রোগ কেমন করে সৃষ্টি হলো, বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের পিতামাতা তাদের নাম মুসলিম হিসেবেই রেখেছেন; কিন্তু যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা গড়ে ওঠেছেন সেখানে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে শেখার কোনো সুযোগ পাননি। আমি স্বয়ং এর সাক্ষী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ ও এমএ পাস করতে গিয়ে যা শিখেছি তাতে বস্তুবাদ (Materialism), দ্বান্দ্বিকতাবাদ (Dailectism), ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ইত্যাদি তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করতাম। ছাত্রজীবন শেষে কলেজে অধ্যাপনাকালে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, এসব তত্ত্ব সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী। মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতেন তাহলে তারাও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতেন।

১৭৫৭ সালে আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্বে ৫৫০ বছর ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কোনো শিক্ষাব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।

পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের ব্যর্থতার পর কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে চালু রাখার উদ্দেশ্যে আলেমসমাজ জনগণের আর্থিক সহযোগিতায় মাদরাসা শিক্ষা চালু করেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারেনি। তারা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা চালু না থাকায় মাদরাসার মাধ্যমে যে আলেমসমাজ গড়ে ওঠছেন তারা দীন ইসলামের বহুবিধ খিদমত করেছেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে শুধু ইংরেজি শিক্ষিতরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। আলেমসমাজের নেতৃত্ব শুধু ধর্মীয় ময়দানেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের শিক্ষা জনগণের মাঝে ব্যাপক হতে পারেনি। ১৯৪০-এর দশক থেকে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের আদলে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলায় আমার মতো লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিতরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করে এবং আখিরাতে আল্লাহর রহমত হাসিল করতে চায় তারা দুনিয়ার জীবনটাকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে এবং রাজনৈতিক চক্করে পড়ে দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করতে সম্মত নয়।

৩২৩.

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দিক

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাকেই বলা হয়, যে রাষ্ট্র অপর কোনো রাষ্ট্রের অধীন নয়। কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রই অন্য কোনো রাষ্ট্রের আধিপত্য মেনে নেয় না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পারস্পরিক স্বার্থে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক হতে পারে; কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের আধিপত্য মানতে সম্মত হলে দেশের স্বাধীন মর্যাদা থাকে না।

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত প্রত্যক্ষভাবে কূটনৈতিক ও সামরিক সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ও সেক্টর কমান্ডারদেরকে শরীক করা হয়নি। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীকে বন্দী করে সকল অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধসরঞ্জাম ও যানবাহনসহ ভারতে নিয়ে যায়।

কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দ এসব নীরবে হজম করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের মতামত নিলে তারা নিশ্চয়ই দখলদার পাক সেনাবাহিনীকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বাংলাদেশেই তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতেন এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামাদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করতেন।

ভারতের এ আচরণ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ভারত বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র মনে করে না। তারা মনে করে যে, তারা যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে জয় করেছে। তাই তাদের মর্জিমতোই এ দেশকে চলতে হবে।

১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) যখন পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে তখন দিল্লিতে ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি গর্বের সাথে ঘোষণা করেছেন, 'আজ পাকিস্তানের টু নেশনস থিওরি (দ্বি-জাতি তত্ত্ব তথা মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি হওয়ার তত্ত্ব) বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হলো'। এ কথার তাৎপর্য হলো, মুসলমানরা আলাদা জাতি বলে দাবি করে ভারতকে বিভক্ত করেছিল। ঐ তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং ভারত বিভাগ সম্পূর্ণ ভুল ছিল।

'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' নামক বইটিতে আমি কতক তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছি, ভারতীয় নেতারা বাংলাদেশে এসে উপদেশ দিতে দ্বিধাবোধ করেন না যে, আমাদেরকে ১৯৪৭-এর পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত।

বাংলাদেশ ভারতের আধিপত্য মেনে চলুক– এ দাবি ভারত করতেই পারে। কারণ, ভারতই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়া বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী কোনো রাজনৈতিক নেতা এ আধিপত্য মেনে নিতে কিছুতেই সম্মত নয়।

ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ

প্রধানমন্ত্রী মুরারজী দেশাই-এর স্বল্পকালীন আমল ছাড়া কোনো ভারত সরকারই বাংলাদেশের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করেনি। বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে মর্যাদা দেয় বলে ভারত সরকারের নিম্নোক্ত আচরণ থেকে প্রমাণ মেলে না।

১. ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি উপজাতিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে সাহায্য করেছে।

২. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রেখার স্থায়ী ব্যবস্থা করার দাবিকে ভারত সরকার কখনো গুরুত্ব দেয়নি।

৩. সীমান্তের ছিটমহলগুলোর সমস্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের সামান্য আন্তরিকতার প্রমাণও পাওয়া যায়নি। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের বেরুবাড়ি ছিটমহল ও ভারতের তিনবিঘা ছিটমহল বিনিময় হওয়ার কথা। চুক্তির সাথে সাথে বাংলাদেশ বেরুবাড়ি ছিটমহল ভারতকে দিয়ে দিয়েছে; কিন্তু তিনবিঘার দখল ভারত আজ পর্যন্ত ছাড়েনি।

৪. ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তে শত্রুসুলভ আচরণে অভ্যস্ত। বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা করা, গরু ও ফসল জোর করে নিয়ে যাওয়া, বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলমানদেরকে বাংলাদেশি বলে আখ্যায়িত করে জোর করে বাংলাদেশে পুশ-ইন করা, ভারতীয় পণ্য বেআইনিভাবে বাংলাদেশে পাচারে সহায়তা করা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে যুলুম করা তাদের নিয়মিত অভ্যাস।

৫. ভারত সরকার বাংলাদেশকে তাদের অবাধ বাজার মনে করে। তাই ভারতের সাথে বাংলাদেশের পণ্য বিনিময়ে তারা আন্তর্জাতিক বিধিমালার ধার ধারে না। বাংলাদেশ ভারত থেকে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য খরিদ করে, ভারত এর এক-পঞ্চমাংশও খরিদ করে না। তাই বাংলাদেশ বিরাট বাণিজ্য ঘাটতির শিকার হচ্ছে।

৬. ফারাক্কা বাঁধ ও অন্যান্য বাঁধের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি যথাসময়ে না দেওয়ার ফলে বাংলাদেশ শুকনো মৌসুমে মরুভূমির অবস্থায় পতিত হয় এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানিতে বন্যায় ভেসে যায়।

৭. পশ্চিম বঙ্গে শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য ফনীভূষণ মজুমদার ও কালিদাস বৈদ্যের নেতৃত্বে তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলা নিয়ে বঙ্গভূমি নামে পৃথক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে তারা তৎপর।

৮. চোরের মায়ের বড় গলা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতে পরিচালিত আন্দোলনকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে ভারত বারবার অভিযোগ করছে যে, বাংলাদেশের চারপাশে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রদেশে বিদ্রোহীরা যে আন্দোলন করছে তাদেরকে নাকি বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। ২০০৪ সালে চারদলীয় জোট

সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোরশেদ খান চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন যে, আপনারা এসে অনুসন্ধান করুন; হেলিকপ্টার রেডি আছে। তারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি।

৯. ভারতের বিদ্রোহীদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ঐসব প্রদেশে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পৌছার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারত প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। এ সুবিধা দিলে ভারতীয় বিদ্রোহীরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক তৎপরতা চালাবে বলে বাংলাদেশ এ দাবি মানতে সম্মত হচ্ছে না।

১০. বাংলাদেশের একমাত্র খনিজসম্পদ গ্যাস। দেশের জনগণের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। অথচ এ গ্যাস ভারতে রপ্তানি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

১১. চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজনই পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ ভারত তাদের প্রয়োজনে এ বন্দর ব্যবহার করার অধিকার দাবি করছে।

এভাবে বাংলাদেশের উপর আধিপত্য করার হীন প্রচেষ্টায় ভারত সরকার লিপ্ত। তাদের এ আচরণ সৎ প্রতিবেশীর পরিচায়ক হতে পারে না। এ কারণেই জনগণ ও সকল দেশপ্রেমিক মহল ভারতকে বন্ধু মনে করতে পারছে না। বাংলাদেশ সকল প্রকারে ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করছে; কিন্তু ভারত বন্ধুসুলভ আচরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ভারতের প্রতি আওয়ামী লীগের আচরণ

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থি ও ধর্মনিরপেক্ষ মহল কখনো বাংলাদেশবিরোধী উপরিউক্ত ভারতীয় আচরণের প্রতিবাদ করেন না; বরং ভারত তাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলে তারা গদগদ হয়ে প্রচার করেন। ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ সত্ত্বেও যদি ভারত তাদের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে থাকে, তাহলে দেশের জনগণ তাদের সম্পর্কে কী ধারণা করবে? ভারতের আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ নাকি শত্রুতাসুলভ– এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ জনগণের মাঝে জরিপ চালিয়ে দেখতে পারে যে, জনমত কোন্ দিকে।

শেখ হাসিনা ২০০৪ সালে ভারত সফরে গেলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যাননি। অথচ প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সভানেত্রী, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতিথির মর্যাদা দান করলেন। কারণ, তিনি সেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। বাংলাদেশে নাকি হিন্দুদের প্রতি নির্যাতনের ফলে হাজার হাজার হিন্দু ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তার এ অভিযোগের ফলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও পত্রিকা সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছে যে, '৭১ সালের মতো ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে পাঠিয়ে এর প্রতিকার করা হোক।

এর কিছু দিন পূর্বে ভারতের গুজরাট রাজ্যের আহমেদাবাদ শহরে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুসলিম গণহত্যা চালিয়েছেন। শেখ হাসিনা এর সামান্য প্রতিবাদও করেননি।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কুড়িগ্রাম জেলার পাদুয়া বড়ইগ্রাম এলাকায় একটি ফাঁড়ি ভারতীয় বিএসএফ-এর দখলমুক্ত করার জন্য মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানের নির্দেশে বিডিআর জোয়ানরা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে ১৬ জন ভারতীয় সৈনিক বাংলাদেশের মাটিতে নিহত হলো। শেখ হাসিনা দিল্লিতে ফোন করে প্রধানমন্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাইলেন এবং ফাঁড়ির দখল ভারতীয়দেরকে ফিরিয়ে দিলেন। বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে বেআদবি করার শাস্তিস্বরূপ(!) মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানকে বিডিআর-এর দায়িত্ব থেকে অপসারণ করলেন।

২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে আবদুল জলিল বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দিয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা রক্ষা করার জন্য এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি চারদলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে লালনকারী অপশক্তি আখ্যায়িত করে এই সরকারের সাথে নীতিগত কোনো সম্পর্ক না রাখার জন্যও ভারতের প্রতি আহ্বান জানান।

ঐ সমাবেশে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সত্যজিৎ চাটার্জি বলেন, 'ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না।' আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় দল ভারতকে বাংলাদেশে '৭১-এর মতো আক্রমণের আহ্বান জানানোর ফলেই সত্যজিৎ বাবু এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দিতে সাহস পেলেন।

২০০৫ সালের ডিসেম্বরে উক্ত সমিতির সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, 'আজ হোক কাল হোক ট্রানজিট তো দিতেই হবে। তাহলে বিলম্ব করে লাভ কী?'

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ মহানেতা মেয়র মহিউদ্দীন একাধিক বার চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করার জন্য ভারতের দাবি মেনে নিতে বলেছেন। একবার জোশের চোটে বলে ফেললেন, 'আমরা ক্ষমতায় গেলে ভারতের সকল দাবি পূরণ করব।' এটা কি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে?

উপরিউক্ত তথ্যাবলি কি এ কথার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয় যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যকামী? বাংলাদেশের জনগণ কি এ আধিপত্য কামনা করে?

এর কারণ কী?

ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এটা অস্বাভাবিক নয়। এ উদ্দেশ্যেই তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করেছে। এর জন্য তাদেরকে

নিন্দনীয় মনে করার চেয়ে যারা বাংলাদেশের উপর বিদেশের আধিপত্য কামনা করে তারাই প্রকৃত নিন্দনীয়।

১৯৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত করেই ব্রিটিশ সরকার থেকে লর্ড উপাধি অর্জন করেন। তার দেশে হিরো হিসেবে তিনি সম্মানিত হন। তাকে নিন্দা করার চেয়ে সেনাপতি মীর জাফরই কি প্রকৃত নিন্দার পাত্র নয়? মীর জাফর নবাব হওয়ার লোভে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তেমনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতার লোভে ভারতের আধিপত্য কামনা করলে তা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে জনগণের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকাকালে আওয়ামী লীগ ইসলাম ও আলেমসমাজের প্রতি যে জঘন্য আচরণ করেছে, এর ফলে সচেতন ইসলামী মহলের ভোট থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজিত হয়। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বমোট যে সংখ্যক ভোট পেয়েছে, তা বিএনপি'র প্রাপ্ত ভোটের সামান্য কম। অথচ সংসদে তাদের আসনসংখ্যা এত কম হলো কেন? অনেক নির্বাচনী আসনে মাত্র ৫ থেকে ১৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছে। ইসলামপন্থী ভোটই নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দিয়েছে। কোনো সচেতন ইসলামপন্থি তাদেরকে ভোট দেয়নি। এ কথা উপলব্ধি করেই শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ইসলামী ভোট বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো ইসলামী গ্রুপের সাথে চুক্তি করেন।

আওয়ামী লীগের ভারতীয় আধিপত্য কামনার আরো একটি কারণ হলো, তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা। বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য কায়েম না হলে তাদের এ ইসলামবিরোধী মতবাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ইসলামকে ঠেকাতে হলে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত ও আমেরিকার ভূমিকা

কোনো দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সে দেশের জনগণ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোন্ আদর্শ বা কোন্ দল ক্ষমতাসীন হবে। এ ব্যাপারে বিদেশিদের কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। প্রত্যেক দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে ফায়সালা করে থাকে। যদি কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের নির্বাচনে কোনো বিশেষ দলকে বিজয়ী করার জন্য কোনো ভূমিকা পালন করে, তাহলে তা সে দেশের স্বাধীন মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার শামিল।

কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ভারত ও আমেরিকা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে নির্বাচনে বিজয়ী করার চেষ্টা করাকে কোনো দূষণীয় কাজ মনে করছে না। অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো তারা প্রকাশ্যে এ বিষয়ে তাদের মনোভাব প্রকাশ করছে।

২৮ জুন (২০০৭) দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শিব শঙ্কর মেনন ২৭ জুন শেখ হাসিনার বাসভবনে সাক্ষাৎকালে তাকে আশ্বাস দেন যে, ভারত আগামী সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে। তিনি শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করেন যে, নির্বাচনের ফলাফল এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলের রাজনৈতিক শক্তির পক্ষেই যাবে।

শিব শঙ্কর বাবু বেগম জিয়ার সাথেও সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু নির্বাচনে তাকে সাহায্য করার কোনো আশ্বাস দেননি। কারণ স্পষ্ট। বেগম জিয়ার অপরাধ হলো, তিনি দেশের ইসলামী শক্তির সহযোগী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী। বিএনপি'র ১৯ দফার একটি দফার নাম ইসলামী মূল্যবোধ। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতাই বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উৎখাত করেন।

গত মে মাসে (২০০৭) আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি নিকোলাস বার্ন্স বলেন, 'আমেরিকা ও ভারত একযোগে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য কাজ করবে।'

ভারত ও আমেরিকা যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী সেহেতু তারা এটা পছন্দ করতে পারে, যেন বাংলাদেশে তাদের আদর্শে বিশ্বাসী শক্তি ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু তারা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে ক্ষমতাসীন করতে কিভাবে সাহায্য করবে, তা দেশবাসীকে গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমেরিকা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতের সাথে কিভাবে একযোগে কাজ করবে? এটা কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র নয়? বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না দিয়ে তাদের পছন্দের দলকে ক্ষমতাসীন করার ষড়যন্ত্র করার ঘোষণা দেওয়ার নির্লজ্জ দুঃসাহস তারা দেখাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিদেশিদের দুয়ারে ধরনা দেওয়ার কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এর জন্য এ দেশের মীর জাফররাই দায়ী। দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ ও সুজনরা এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকলে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, তারাও আধিপত্যকামী। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শক্তি ক্ষমতাসীন হবে কি না, এ বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার না দিয়ে আমেরিকা ও ভারত ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনী ফলাফল তাদের মর্জিমতো দেখতে চায়। এটা কেমন করে সম্ভব হবে তা গবেষণার বিষয়।

মুসলিম দেশের জন্য আমেরিকার গণতন্ত্র

আমেরিকা ভারতের সাথে একযোগে কাজ করে বাংলাদেশে গণতন্ত্র বহালের চেষ্টা করতে চায়; কিন্তু মুসলিম দেশে আমেরিকা যে গণতন্ত্র চায়, এর সাথে জনমতের কোনো সম্পর্ক নেই। আমেরিকার পছন্দনীয় দল নির্বাচনে বিজয়ী না হলে সে

ফলাফল তারা মেনে নেয় না। আলজেরিয়ায় স্যালভেশন পার্টিকে নির্বাচনে বিজয়ী হতে দেখে সে দেশের সেনাবাহিনী নির্বাচনী প্রক্রিয়া বন্ধ করে এবং আমেরিকা সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে সমর্থন জানায়। ২০০৬ সালের শুরুতে ফিলিস্তিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আল ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। নির্বাচনে হামাস পার্লামেন্টের দু-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়। হামাস সরকারকে আমেরিকা ও ইসরাইল স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। আমেরিকা ফিলিস্তিনকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ইসরাইল ফিলিস্তিনের ন্যায্য পাওনা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে।

আমেরিকা ও ইসরাইল নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের আল ফাতাহ দলের বিজয় কামনা করেছিল। তাদের মর্জির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জনগণ হামাসকে বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী করায় এ ফলাফল তারা মেনে নেয়নি। এই সেদিন (জুন ২০০৭) মাহমুদ আব্বাস হামাস-ফাতাহ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ফাতাহ দলের একক সরকার প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে এ অগণতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্য করার ঘোষণা দেয় ইসরাইল, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

মুসলিম দেশের নির্বাচনের ব্যাপারে আমেরিকা, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি অনুযায়ী আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তারা সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ও নির্বাচন কমিশন এ বিরাট আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হবে কি না তা-ই দেখার বিষয়। তারা দেশের সকল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনী লড়াই করার জন্য বিপুল আর্থিক সাহায্য করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদবিরোধী দলগুলোকে টুকরা টুকরা করার জন্য এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যেও আর্থিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। কোনো ইসলামী দল যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টিও করতে পারে।

ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার ক্রুসেড

১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো পরাশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন-এর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই সমাজতন্ত্র তার জন্মভূমিতেই আত্মহত্যা করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। আমেরিকা একক পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বের একচ্ছত্র মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী হিসেবে আমেরিকা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনামলে আমেরিকার নিরাপত্তা বিভাগের ডাইরেক্টর থাকাকালে প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটন আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশ্বজনীন করার মাধ্যমে আমেরিকার নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য গবেষণায় লিপ্ত হন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি প্রফেসর হান্টিংটনের গবেষণার ফসল 'The Clash of Civilizations and Remaking of World Order' নামক সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠার বিখ্যাত গ্রন্থে ইসলামকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে একমাত্র আতঙ্ক হিসেবে আবিষ্কার করা হয়।

এ বিষয়ে আমি ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং ঐ গ্রন্থের পর্যালোচনা করে 'ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা' শিরোনামে একটি বইও রচনা করেছি। উক্ত গ্রন্থে তিনি একটি চ্যাপ্টারে ইসলাম ও আরেকটি চ্যাপ্টারে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত যুবকদের বিরাট বাহিনী সারা বিশ্বে গড়ে ওঠেছে, যারা ইসলামী সভ্যতাকে অতীতের মতো বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চায়।

তিনি লিখেছেন, 'সমাজতন্ত্র একটি সাময়িক আপদ ছিল, যা ৭০ বছরেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইসলাম একদিন বিশ্ব জয় করেছিল। আবার বিশ্বজয়ের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। তাই ইসলাম কোনো সাময়িক আপদ নয়, স্থায়ী মহাবিপদ।'

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এর জন্য বিনা তদন্তে ইসলামপন্থিদেরকে দায়ী করে সন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে বোমা বিস্ফোরণের যত ঘটনা ঘটেছে, এর কোনোটারই তদন্ত না করে ঘটনার সাথে সাথে ইসলামপন্থিদেরকে দায়ী করা হয়েছে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশে যাতে ইসলামপন্থি শক্তি ক্ষমতাসীন হতে না পারে এবং সকল মুসলিম দেশে যাতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্ষমতায় টিকে থাকে সে টার্গেটকে সামনে রেখেই আমেরিকা মোড়লগিরি করছে। বাংলাদেশেও ঐ পলিসি অনুযায়ীই আমেরিকা কাজ করছে। ভারত ও ইসরাইল চুক্তিবদ্ধ। ভারত ও আমেরিকাও চুক্তিবদ্ধ। ইসরাইল, আমেরিকা ও ভারত– এ ত্রিচক্র ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

৩২৪.

ভারত বিভাগ কি ভুল ছিল?

ভারতবর্ষের ৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটি মুসলিম জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতকে বিভক্ত করতে বাধ্য হয় এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ দুটো রাষ্ট্রে পরিণত হয়– ভারত ও পাকিস্তান। হিন্দু ভারতের প্রধান নেতা মি. গান্ধি তাঁর 'ভারতমাতা'র দেহ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহের লাল নেহেরু গোটা ভারতবর্ষের শাসক হওয়ার অদম্য কামনা পূরণ না হওয়ায় আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে আজ হোক কাল হোক আবার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হবে। ঐ আধিপত্যবাদী মনোভাবের ফলেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে দখল করে রাখা হয়েছে। হায়দারাবাদকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকতে দেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানকে দখল করার উদ্দেশ্যে দুবার যুদ্ধ করেও ভারত ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সার্বভৌম মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকুক তা তারা মোটেই চান না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সে উদ্দেশ্যেই শেখ মুজিবকে ২৫ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিলেন। সে চুক্তি নবায়ন না হওয়ায় বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের উপর তারা আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সফল করার প্রত্যাশায় তারা অপেক্ষমাণ।

সুতরাং ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে এ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ভারত বিভাগ ভুল ছিল। ১৯৯২ সালে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা ও দৈনিক 'দেশ বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী মায়ারাম সজ্জন বলেন, '১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ ভুল ছিল।' সমাবেশে তখনকার প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী হাজির ছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় যে, কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি। শুধু পাকিস্তানের হাই-কমিশনার এর প্রতিবাদে হল থেকে বের হয়ে যান।

ভারত বিভাগ না হলে মুসলমানদের কী দশা হতো?

ভারত বিভাগের সময় গোটা ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। বর্তমান ভারতে সে সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ। এক শ' কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বিশ কোটি। শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সরকারি চাকরি, সশস্ত্র বাহিনী, শিক্ষকতা, ডাক্তারি ও প্রকৌশলী পেশা ইত্যাদিতে মুসলমানদের সংখ্যা অতি নগণ্য। জনসংখ্যার দিক দিয়ে শতকরা বিশ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত বিভাগসমূহে শতকরা দুই থেকে চার ভাগের বেশি নয়। সর্বক্ষেত্রে উচ্চ পদে শতকরা একজনও নয়। সম্প্রতি 'সাচার কমিশন' নামে এক

সরকারি কমিশন মুসলমানদের দুরবস্থার যে বিবরণ দিয়েছে, তাতে কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাদের বিজয়ের জন্য মুসলমানদের ভোট বড়ই প্রয়োজন।

ভারত যদি বিভক্ত না হতো, তাহলে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান ভারতের মুসলমানদের যে দশা হয়েছে, এর চেয়ে কি সামান্য উন্নতও হতো?

পাকিস্তান কায়েমের পরই বাঙালি মুসলমানদের উন্নতি শুরু হয়

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রশাসনিক উচ্চ কর্মকর্তা দু মানের ছিল। সমগ্র ভারতের জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হতো তাদেরকে ICS (Indian Civil Service) অফিসার বলা হতো। এরা প্রধানত ইংরেজ ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারতীয়দেরকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক আইসিএস অফিসার নিয়োগ করা শুরু হয়। আর প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রদেশের সরকারের জন্য অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; বঙ্গদেশের (Bengal) অফিসারদের জন্য ছিল BCS (Bangal Civil Service) ক্যাডার।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হওয়ায় প্রাদেশিক সরকারের সচিবালয় পরিচালনার যোগ্য সিনিয়র বাঙালি মুসলমান অফিসার ছিল না। বাঙালি কোনো মুসলমান আইসিএস অফিসার না থাকায় ভারত থেকে আগত মুসলমান আইসিএস অফিসার সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একজন মাত্র বাঙালি মুসলমান বিসিএস অফিসারকে প্রমোশন দিয়ে আইসিএস পদবি দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে।

১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের জন্য কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষায় সারা পাকিস্তানে চট্টগ্রামের শফিউল আযম প্রথম স্থান অধিকার করেন। ৯ জন বাঙালি মুসলমান CSP (Civil Service of Pakistan) হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছে। প্রতি বছরই সিএসপি হওয়ার সুযোগ হয়েছে বাঙালি মুসলমানদের। সশস্ত্র বাহিনীতেও বাঙালি মুসলমান যোগদান করার সুযোগ পেয়েছে। পূর্ব বাংলা সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হওয়ার জন্য বাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া সুযোগ হয়েছে। সকল হিন্দু পুলিশ ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পশ্চিম বঙ্গে চলে যাওয়ায় এ সকল পদে বাঙালি মুসলমানরা স্থান পেয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের অগ্রগতি

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব বাংলায়, পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, খেলাধুলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাঙালি মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে সর্বদিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে।

পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে পূর্ব বাংলায় শিল্প-কারখানা ছিল না বললেই চলে। ভারত থেকে মুসলিম শিল্পপতিরা এসে এ ময়দানে বিরাট অবদান রাখে। স্বাধীন বাংলাদেশে এ সবই বাঙালি মুসলমানদের কল্যাণে আসে। পূর্ব বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য হিন্দুদের মালিকানায় ছিল। ভারত থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীরা হিন্দুদের সাথে বিনিময় করে এখানকার ব্যবসায়-বাণিজ্য দখল করে নেয়। স্বাধীন বাংলায় এ সবই এখন বাঙালি মুসলমানদের হাতে।

১৯৪৪ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন ভিসি মুসলমান হলেও বাঙালি ছিলেন না; আরবী ও ফারসি ছাড়া অন্য কোনো বিভাগীয় প্রধান মুসলমান ছিলেন না। প্রফেসরদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙালি মুসলমান ভিসি হন। সে সময় অনেক হিন্দু প্রফেসর ভারতে চলে গেলে বাঙালি মুসলমানরা প্রমোশন পেয়ে তাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বাঙালি মুসলমান শিক্ষকতার ব্যাপক সুযোগ পায়। স্বাধীন বাংলাদেশে তাই এখন এত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে পেরেছে। কলেজ তো গ্রামাঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ভারত বিভাগের পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে বাঙালি মুসলমান বিচারপতি ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পূর্বে ঢাকায় হাইকোর্টই ছিল না। এখন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রায় সবাই বাঙালি মুসলমান বিচারপতি। ১৯৪৭-এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে বাঙালি মুসলমান ব্যারিস্টার ও আইনজীবী নগণ্য সংখ্যক ছিল। বাংলাদেশের জজ কোর্ট ও নিম্ন-আদালতে মুসলমান আইনজীবী শতকরা ২০ জনের বেশি ছিল না। এখন হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিস্টারদের বিরাট বাহিনী। সারা দেশে আইনজীবীদের বিশাল সংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ জনই বাঙালি মুসলমান।

পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে এ এলাকায় কোনো মেডিক্যাল কলেজ ছিল না। মিটফোর্ট মেডিক্যাল স্কুল থেকে এলএমএফ ডাক্তার হতো। পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কায়েম হয়েছে। পাকিস্তান আমলে আরো বেশ কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এখন আরো অনেক হয়েছে। আগে ঢাকায় মাত্র একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ছিল; পাকিস্তান আমলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হয়; বাংলাদেশে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে।

আজ বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষ সকল দিকে যে বিরাট উন্নতি করছে তা ভারত বিভাগেরই সুফল।

ভারত বিভাগ না হলে

ভারত বিভাগ না হলে বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের যে দুর্দশা, মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা এতটা মন্দ না হলেও, স্বাধীন পাকিস্তান ও

বাংলাদেশে মুসলমানদের যে বিরাট উন্নতি হয়েছে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। বিশেষ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীতে ক'জন মুসলমান উচ্চ পদে সুযোগ পেত? বাঙালি মুসলমান কেউ ব্রিগেডিয়ার ও জেনারেল হওয়ার স্বপ্নও দেখতে পেত না। কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসে বাঙালি মুসলমান ক'জন সুযোগ পেত? বাঙালি মুসলমান ক'জন ভিসি, প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি, শিল্পপতি, রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করত? ভারত বিভাগ না হলে শেখ মুজিবের মতো কোনো নেতার উদ্ভবও হতো না, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মও সম্ভব হতো না।

ভারত বিভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মেধাসম্পন্ন বিরাটসংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত বিভিন্ন পেশার লোক বিশ্বের বহু দেশে যোগ্যতা ও সুনামের সাথে কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশে দুর্নীতির ফলে মেধার মূল্যায়ন না থাকায় অনেকে বিদেশে চলে গেছে। সৎ লোকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার কায়েম হলে ঐসব মেধাবীদেরকে দেশ গড়ার উদ্দেশ্যে কাজে লাগালে বাংলাদেশ অনেক দিক থেকে উন্নতি লাভ করতে পারে।

বাংলাদেশ বিরাট সম্ভাবনাময় দেশ। ভারত বিভাগের ফলে সে সম্ভাবনা আরো বিকাশ লাভ করেছে। দেশে মুক্ত গণতন্ত্র ও সৎ নেতৃত্ব কায়েম হলে বাংলাদেশ সর্বদিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলমানদের প্রতি আকুল আবেদন

দীর্ঘ ইংরেজ শাসনকাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা আজ পর্যন্ত চালু থাকায় মুসলমান শিক্ষিত সমাজ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পারিবারিক কারণে তাদের অনেকে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মান্য করে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অনেকে নামায-রোযা করে। তাদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে জানার সুযোগ গ্রহণ করে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বিরাট। তাদের মধ্যে বিশাল এক দল রাজনীতিবিদ এ মতবাদের ধারক ও বাহক। আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি সকল পেশার মধ্যেই এ মতবাদের সমর্থক রয়েছে। তারা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার শিকার। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু থাকায় তারা নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এনজিও কর্মকর্তারা জনগণের মধ্যে এ মতবাদ চালুর ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয়।

এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে যারা নামায-রোযা করেন তারা নিজেদেরকে মুসলিম মনে করেন এবং আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও পরকালে বিশ্বাস করেন। তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন আপনারা যে কুরআনের হুকুম অনুযায়ী নামায-রোযা করা প্রয়োজন মনে করেন, সে কুরআনকে বোঝার জন্য অধ্যয়ন করুন। আপনারা না বুঝে হয়তো কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন, বোঝার চেষ্টা করুন।

আপনারা শিক্ষিত এবং দুনিয়ার উন্নতির প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ত করা প্রয়োজন মনে করেছেন। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বার্থে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা শিখেছেন। আখিরাতের অনন্ত-অসীম জীবনের স্বার্থে আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে না পারলেও বাংলা ভাষায় কুরআনের তাফসীর পড়ে আল্লাহর বাণীকে বোঝার চেষ্টা করুন।

মানবজাতিকে আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠালেন– তাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের সকল দিকের জন্য কী বিধান দিয়েছেন তা কুরআন থেকে জেনে নিন। এসব বিধান প্রয়োগ করেই মুহাম্মদ (স) একটি অসভ্য বর্বর জাতিকে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ নমুনা স্থাপনের যোগ্য বানিয়েছিলেন।

আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের প্রিয় জন্মভূমিকে উন্নত দেখতে চান, দেশের জনগণকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হিসেবে গড়ে তুলতে চান এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে পৌঁছাতে চান। এ ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আপনাদেরকে কোনো পথনির্দেশ দেয় না। এ মতবাদে শুধু এটুকু নির্দেশনাই দেয় যে, দেশ গড়ার ব্যাপারে ধর্মকে টেনে আনবে না। এ নেতিবাচক বিধান ছাড়া এ মতবাদ কোনো ইতিবাচক পথ নির্দেশ করতে সক্ষম নয়। এ মতবাদে বিশ্বাস করলে আপনাদেরকে দেশগড়ার উদ্দেশ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান নিজেদেরকেই প্রণয়ন করতে হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত সরকার দেশ পরিচালনা করেছে তারা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ীই দেশকে গড়ে তোর চেষ্টা করেছেন।

দেশ এ পর্যন্ত যেভাবে চলেছে তাতে কি আপনারা সন্তুষ্ট? এভাবেই দেশ চলতে থাকুক এটাই কি আপনারা চান? রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। তাদের নিকট কি কোনো ইতিবাচক আদর্শ আছে?

গণতন্ত্র কি কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ?

কেউ বলতে পারেন যে, গণতন্ত্রই বাংলাদেশের আদর্শ? বিশ্বের মোড়ল আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় দোসররা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকেন; কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখুন তো, মানবজীবনের সকল দিকের জন্য গণতন্ত্র কি আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে?

যেকোনো বিষয়ে অধিকাংশ লোকের মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে– এটাই গণতন্ত্রের একমাত্র দাবি। স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ, সমিতি, ক্লাব ইত্যাদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে কমিটি রয়েছে এর সদস্যদের অধিকাংশের মতানুযায়ীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে যে প্রার্থীর পক্ষে অধিকাংশ ভোট পড়ে সে প্রার্থীই বিজয়ী বলে সিদ্ধান্ত হয়। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র।

মানব জীবনের সকল বিষয়েই কি এ পদ্ধতি প্রযোজ্য? মানুষ নৈতিক জীব। ভালো ও মন্দ সম্পর্কে সকল মানুষেরই নৈতিক বোধ আছে। যারা মন্দ কাজ করে তারাও এ কাজকে মন্দ বলেই জানে। যে ঘুষ খায় তাকে ঘুষখোর বললে সে রাগ করে কেন?

মিথ্যাবাদীও সত্যবাদীর প্রশংসা করে কেন? চুরি করা মন্দ কাজ জানে বলেই চোর গোপনে এ কাজ করে। মিথ্যাবাদীরা একজোট হয়ে দাবি করে না যে, সত্য কথা বলা মন্দ। কোনো দুর্নীতিবাজই দুর্নীতি করা ভালো বলে দাবি করে না। অধিকাংশ লোক মিথ্যা বললেও তা আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। নৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অচল।

এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি ও জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সকল গণমাধ্যমের সাহায্যে দেশের মানুষকে সৎ ও যোগ্য বানানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি শুধু যোগ্য লোক তৈরি করা হয় এবং তারা সৎ না হয় তাহলে তারা যোগ্যতার সাথে অসৎ কাজই করবে। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে দুর্নীতিতে বিশ্বেসেরা বলে যে দুর্নাম রটেছে, এর জন্য কি নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ জনগণ দায়ী, নাকি উচ্চ শিক্ষিতরাই বেশি দায়ী? তাহলে প্রমাণিত হলো যে, সৎ লোকের অভাবই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ মহাসমস্যার সমাধানে গণতন্ত্র কি সামান্য সাহায্যও করতে সক্ষম?

যিনি মানবজাতির স্রষ্টা তিনি কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনাই মানুষকে সৎ বানায়। চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি দমন করার জন্য যে দারোগা-পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারা যদি সৎ না হয় তাহলে চোর-ডাকাত-সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে ঐসব অন্যায় কাজ বৃদ্ধি করে। দারোগা-পুলিশকে ঘুষ খাওয়া থেকে কে দমন করবে? আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতা ছাড়া এর কোনো প্রতিকার নেই।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে পেশ করেন। সে আদর্শ সোভিয়েত রাশিয়ায় কায়েম করার পর বিশ্বে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশেও অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোক এ আদর্শের অনুসারী হন। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সে আদর্শ রাশিয়ায় পরিত্যক্ত হওয়ার পর বিশ্বের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা তথাকথিত 'ফ্রি ইকোনমি'র নামে তাদের চরম শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানবজাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কি কোনো অবদান রাখতে পারে? গণতন্ত্র কি অর্থনৈতিক আদর্শ বলে গণ্য?

আমার মতো অনেক উচ্চ শিক্ষিত বাংলাদেশি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের পর অর্থনৈতিক সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে পেয়েছে। তাদেরই প্রচেষ্টায় সুদবিহীন ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সেরা ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লেনদেনে দুর্নীতি করেন না বলে দ্রুত উন্নতি করে চলেছে। এরা এ দেশেরই লোক। এ সৎ লোকগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি; যে পদ্ধতিতে এ সৎ লোকগুলো তৈরি করা হয়েছে তা কুরআন থেকেই প্রাপ্ত। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবেদন জানাই যে, ইসলামকে জানুন। আদর্শশূন্য অবস্থায় অবস্থান করে দেশের জন্য কল্যাণ করতে সক্ষম হবেন না।

ইসলামকে উৎখাত করা সম্ভব নয়

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এ মতবাদ কোনো ইতিবাচক আদর্শের সন্ধান দেয় না। এ মতবাদ তাদেরকে আদর্শের ব্যাপারে এক মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে। অথচ ইসলাম একটি ইতিবাচক আদর্শ। এ আদর্শ মানবজীবনের সকল দিকে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করে। মানবজাতির সামনে এর বিকল্প কোনো আদর্শ নেই। একসময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রকে অনেকে আদর্শ মনে করত। এ মতবাদের পতনের পর বিশ্ব এখন সম্পূর্ণ আদর্শশূন্য। গণতন্ত্রকে আদর্শ বলে দাবি করা হয় বটে; কিন্তু গণতন্ত্র আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না।

এ পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ যদিও এ মতবাদকে আঁকড়ে ধরে রাখতে জিদ ধরেন তাহলে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করার নেতিবাচক কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অথচ এ কাজটিতে সফল হওয়া অসম্ভব। এ আদর্শ ময়দানে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তারা দেশ গড়ার কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করতে পারবেন না।

ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রাসূল (স)-এর জীবনাদর্শ। জনগণ এ কুরআনকে ভক্তি করে এবং রাসূল (স)-কে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। কুরআনকে উৎখাত করার সাধ্য কারো নেই। ব্রিটিশ আমলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হলেও আলেমসমাজ মসজিদভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের চর্চা চালু রেখেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করলেও লাখ লাখ মানুষ ইসলামকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে জনগণের নিকট পরিবেশন করতে বাংলা ভাষায় কুরআনের অনেক তাফসীর অনুবাদ করা হয়েছে। বহু হাদীস সংকলন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষী ইসলামী চিন্তাবিদগণের রচিত বহু বই-পুস্তক বাজারে চলছে। বিদেশি বহু মনীষীর রচিত ইসলামী গ্রন্থাবলি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইসলামের উপর আঘাত এলে লাখ লাখ মানুষ ইসলামকে রক্ষা করার জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত রয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জোর করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অভিভাবক

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জনগণ থেকে হতাশ। জনগণের উপর তাদের কোনো আস্থা নেই। তাই ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তারা জনগণের কাছে ফিরে না গিয়ে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন। এরাই তাদের অভিভাবক; কিন্তু এ অভিভাবকেরা ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরে যে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে তা কি বাংলাদেশে সম্ভব?

অসহায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জঘন্য অপচেষ্টা

বাংলাদেশে যারা ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র কায়েম করতে চান, তারা নিজ নিজ ভাষায় তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। কোনো দল 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন' কায়েমের কথা বলে, কোনো দল আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে, কোনো দল ইসলামী শাসনতন্ত্রের কথা বলে, কোনো দল নেজামে ইসলাম (ইসলামী সমাজব্যবস্থা) কায়েমের কথা বলে। এসব কথার ভাষা ভিন্ন হলেও মর্মকথা একই।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এসবেরই বিরোধী হলেও তা এসব উদ্দেশ্যের নাম উল্লেখ করে বিরোধিতা করার সাহস পায় না। কেউ এভাবে বলে না যে, আমরা আল্লাহর আইনের বিরোধী বা খিলাফতের বিরোধী; অন্যদিকে সকল ইসলামী দলই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে সবচেয়ে বড় কুফরী মতবাদ বলে ঘোষণা করেছে। তাদের আদর্শের নাম ধরে ইসলামী দলগুলো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়; কিন্তু তারা ইসলামী দলের আদর্শের নাম নিয়ে বিরোধিতা করার সাহস পায় না। কারণ, তারা জনগণের নিকট ইসলামবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হিম্মত রাখে না, এ ব্যাপারে তারা অসহায়।

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা গালি হিসেবে এমন একটি বিশেষণ ব্যবহার করে, যা সাধারণ জনগণের নিকট বোধগম্য নয়। তারা ইসলামী দলগুলোকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে গালি দেন এবং ইসলামী রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলে প্রচার করে। 'সম্প্রদায়' শব্দটি ইংরেজি 'কমিউনিটি' শব্দের অনুবাদ। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশি জনগণকে বাংলাদেশি কমিউনিটি বলা হয়। ভারতীয় ও পাকিস্তানির মতো ব্রিটিশ কমিউনিটিও পরিচিতির জন্য ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কমিউনিটি রয়েছে। মুসলিমরাও একটি কমিউনিটি।

যদি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করে তাহলে এরই নাম হয় সাম্প্রদায়িকতা। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙা হয়ে থাকে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ যখন বিনা দোষে অপর সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে তখনই এটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙা বলা হয়। সাম্প্রদায়িকতার এ সরল অর্থ জ্ঞানপাপী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জানেন না, এমন নয়। তবু তারা ইসলামী দলকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেন।

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। এ আদর্শ মানবরচিত নয়। বিশ্বস্রষ্টা মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ আদর্শ তাঁর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন। যারা এ আদর্শকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করতে চান, তারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকামী। তাদের এ প্রচেষ্টা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম হলে অমুসলিম সম্প্রদায়ও মুসলিমদের মতোই কল্যাণ লাভ করবে। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হলে চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি সমাজ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলে কি অমুসলিম জনগণ অসন্তুষ্ট হবে? ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাংলাদেশে সাড়ে পাঁচ শ' বছর আল্লাহর

আইন জারি ছিল। প্রথম দিকে তো মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকেও হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায় কোনো বিদ্রোহ করা প্রয়োজন মনে করেনি। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করা মূর্খতার পরিচায়ক। এটা অসহায় জ্ঞানপাপীদের বিদ্বেষপূর্ণ গালি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চায়। কারণ, কোনো ধর্মই মিথ্যা বলা বৈধ মনে করে না। আর মিথ্যা বলাই তাদের রাজনৈতিক বেসাতি। ধর্ম সততার নির্দেশ দেয়। আর তারা রাজনৈতিক ময়দানে অসততাকে দূষণীয় মনে করে না।

পঞ্চাশের দশক থেকে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয়। আইয়ূব খানের সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। তাই জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি তাদের অজানা নয়। এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনার শাসনামলে কোথাও বোমা বিস্ফোরণ হলে বিনা তদন্তেই তিনি জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করতেন।

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশে তৎপরতা শুরু করেছে। অথচ জামায়াতে ইসলামীর মতো পুরনো সংগঠনকে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পর্কিত বলার মতো জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ করতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ও পত্রিকাগুলো সামান্য দ্বিধাবোধ করেনি। তাদের এ অপবাদে জনগণ কান দেয় না; জামায়াত জনগণেরই সংগঠন।

৩২৫.

শাসনতন্ত্রের মর্যাদা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দলিল। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সরকার যাতে ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণের কল্যাণে ক্ষমতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যেই শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। অল্পসংখ্যক মানুষই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। যদি তাদের হাতেই শাসনতন্ত্র রচনা, পরিবর্তন, সংযোজন বা সংশোধন করার ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় তাহলে ক্ষমতা অপব্যহার করার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

রাষ্ট্রে জনগণ ও সরকার দুটো পৃথক পক্ষ। নাগরিক হিসেবে জনগণের অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। জনগণের যা অধিকার, তা সরকারের কর্তব্য। আর সরকারের যা অধিকার, জনগণের তা কর্তব্য। উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। সংবিধানের প্রতিটি ধারাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে

উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। তাই সরকার একটি পক্ষ হওয়ার কারণে শাসনতন্ত্র রচনা করা বা এতে রদবদল করার ক্ষমতা সরকারের হাতে দেওয়া হয় না।

জনগণ সকলে মিলে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে সক্ষম নয়। তাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকেই এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর জন্য আদর্শ পদ্ধতি হলো, শুধু শাসনতন্ত্র রচনা করার উদ্দেশ্যেই একদল লোককে নির্বাচিত করা, যারা এ দায়িত্ব পালন করে বিদায় নেবে। এর বিকল্প ব্যবস্থাই সাধারণত গ্রহণ করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সর্বসম্মতভাবে সংবিধান প্রণয়ন করেন। সরকারি দল তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতেই সংবিধান রচনা করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। তাই পার্লামেন্টের সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধান সংশোধনের বেলায়ও নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত নয়; পার্লামেন্টের দু-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশের মতামতের ভিত্তিতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়। সংবিধান সংশোধনের বিধান ও পদ্ধতি সংবিধানেই বিধিবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধান

১৯৭২ সালে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে যে, জাতীয় সংসদের দু-তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতেই এর সংশোধন হতে পারে। শেখ মুজিবের শাসনামলে জাতীয় সংসদে এ পদ্ধতিতেই চার বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৪ বার সংশোধন করা হয়েছে। একমাত্র ৫ম সংশোধনী ছাড়া সকল সংশোধনী এভাবেই জাতীয় সংসদে সম্পন্ন করা হয়েছে।

পঞ্চম সংশোধনীটি জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংশোধন করে তা গণভোটে অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের এক বিরাট প্রয়োজনে জিয়াউর রহমান ঐ সংশোধনীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংবিধানে বাংলাদেশের আদর্শ হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' উল্লেখ থাকায় সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছিল না। প্রতি বছর হজ্জের জন্য সৌদি আরবে লোক পাঠাতে মিসরীয় দূতাবাসের সাহায্য নিতে হতো। ১৯৭৫ সালে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সেনা-অভ্যুত্থানের পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও সংবিধান সংশোধন না করা পর্যন্ত সৌদি সরকার বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতে সম্মত হচ্ছিল না। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান সৌদি বাদশাহ খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করে হজ্জ যাত্রীদেরকে সৌদি আরব পাঠানোর অসুবিধা দূর করার জন্য এ দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের অনুরোধ করেন। সৌদি বাদশাহ সংবিধান থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত করার পরামর্শ দেন। সে সময় জাতীয় সংসদ না থাকায় জিয়াউর রহমান বাধ্য হয়ে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করেন।

বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি মাত্র সংশোধনী জাতীয় সংসদের অনুপস্থিতির কারণে নিতান্ত প্রয়োজনে করতে হয়েছে। আর সকল সংশোধনী শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংসদেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকৌশল

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলে শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ঘটনাক্রমে শাহ সাহেবের সাথে ছাত্রজীবন থেকেই আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনে কেন যেন তিনি আমার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মাঝে মাঝে আমার সাথে কোনো কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতেন। এ সুযোগে আমি তাঁর কাছ থেকে জিয়াউর রহমান ও তাঁর শাসনকৌশল সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করতাম। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, 'তিনি নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং তাঁর সাথে নামায পড়ার সময় ইমামতি করার জন্য আমাকে আদেশ দিতেন। তিনি মদ্যপান করেন না এবং সেনাবাহিনীতে প্রকাশ্যে মদ্যপান বন্ধ করেছেন।'

প্রশ্ন করলাম, 'খালেদ মুশাররফ যেভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, জিয়াউর রহমান থেকে সেভাবে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার তেমন কোনো আশঙ্কা আছে কি না?' জবাবে বললেন, 'জিয়াউর রহমান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে জেনারেলদেরকে তাঁর প্রতি আস্থাশীল রাখার কৌশল অবলম্বন করেছেন। দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তিনি যা কিছু করতে চান, সেসব বিষয়ে মন্ত্রিসভায় আলোচনা করার পূর্বে জেনারেলদের সাথে আলোচনা করে তাদের পরামর্শ নেন।'

আরেক প্রশ্নের জবাবে বললেন, '১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে ছোট ছোট দলের প্রধানদেরকেও বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দান করেছেন, যাতে রাজপথে কোনো আন্দোলন না হয়। তারা যা বলতে চান তা যেন সংসদেই বলতে পারেন, সে ব্যবস্থা তিনি করেছেন।'

১৯৮২ সালে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার করা পর শাহ সাহেব বললেন, 'জিয়া হত্যার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে জেনারেলদের সাথে পরামর্শ করার কৌশল অবলম্বন করেননি। জিয়ার এ কৌশল হয়তো তিনি জানতেন না বা প্রয়োজন বোধ করেননি। বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন। সেনাপ্রধান এরশাদ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের দাবি জানালেন। চাপে পড়ে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার তিন বাহিনী প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও আরো কয়েক জন মন্ত্রী নিয়ে পরিষদ গঠন করলেন। পরিষদে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু হওয়ায় সেনাপ্রধান তা প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্টকে বিবৃতি দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করলেন এবং সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের সাম্প্রতিক দাবি

সম্প্রতি (জুলাই ২০০৭) জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। অনেক দেশে তা আছে বলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। কোনো উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক দেশে এ জাতীয় পরিষদ নেই। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিষদ আছে, তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দায়িত্ব পালন করে। গণতান্ত্রিক সরকারের উপর সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বা সরকার পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো পরিষদ নেই। বাংলাদেশেও এ জাতীয় পরিষদের কোনো প্রয়োজন নেই।

তুরস্কে কামাল পাশা সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বেসামরিক রাজনৈতিক সরকারের উপর হস্তক্ষেপের যে ক্ষমতা রেখে গেছেন, এর ফলে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করতে পারছে না। জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকারও সেখানে অসহায়। ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্লামেন্টে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করায় সে দেশেও জনগণের রাজনৈতিক অবস্থান সীমিত।

শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নত কোনো ব্যবস্থা আছে বলে প্রমাণিত নয়। সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও সমস্যাসংকুল। তাই যেসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়েছে, সেখানে এ অবস্থানে পৌঁছতে বহু বছর লেগেছে। বাংলাদেশে ১৯৯১ সাল থেকে গণতন্ত্র চালু হয়েছে। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে আরো সময় লাগবে। বর্তমান সরকারকে ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ দিলে গণতন্ত্র আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ক্ষমতা লাভ করেছেন; কিন্তু তিনি গণতন্ত্রকে লালন করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রকে হত্যাই করে ফেললেন। ১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান হয়। সকল রাজনৈতিক দল কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির পক্ষে একমত হওয়ায় ১৫ বছরের মধ্যে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে। যেসব কারণে চতুর্থ নির্বাচন হতে পারল না, সেসব কারণ দূরীভূত হচ্ছে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। ফটোসহ নতুন ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের মাধ্যমে রাজনীতির যথেষ্ট সংস্কার হতে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার যে প্রচেষ্টা চলছে তাতে আশা করা যায় যে, গণতন্ত্র অনেকখানি অগ্রগতি লাভ করবে। দুর্নীতি দমনের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে তাতে আশা করা যায় যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্নীতি অনেক হ্রাস পাবে।

বর্তমান সরকার নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জনগণের আস্থা লাভ করেছে এবং আগামী নির্বাচনের যাবতীয় আয়োজন করে

চলেছে। আশা করি, সেনাপ্রধান নিশ্চিন্ত আছেন যে, তাঁর সহযোগিতায় সরকার অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে।

এ পরিস্থিতিতে সকল মহলকেই ধৈর্যধারণ করে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন। রাজনীতি, নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলে যে ব্যাপক সংস্কার চলছে তাতে এখনই এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন নেই, যা করতে গেলে সংবিধানে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হয়।

নির্বাচিত জাতীয় সংসদই সংবিধান সংশোধনের অধিকারী। এ অধিকারে অন্য কোনো সংস্থা হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করলে মতবিরোধ সৃষ্টি হবে। জরুরি অবস্থার সুযোগে এমন কিছু করলে সুপ্রিম কোর্টে এর বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ থাকবে। সংবিধানের মতো পবিত্র দলিলের মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে আশা করি, বর্তমান সরকার এ জাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। নিরপেক্ষ সরকার হিসেবে এ সরকার যত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, এর সাফল্যের জন্য সংবিধানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ দেশের সংবিধানকে মুলতবি রেখে সামরিক শাসন জারি করেন; সকল রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেন; সামরিক বাহিনীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তুরস্ক বা ইন্দোনেশিয়ার আদলে সংবিধান সংশোধন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ঘোষণা করেন, ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় রাজনৈতিক জোট এবং বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গণতন্ত্র বহালের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে ১৫ দলীয় জোট দাবি করল যে, তৃতীয় সংশোধনী পর্যন্ত বহাল রেখে সংবিধান সংশোধন হোক। অর্থাৎ, তারা এরশাদকে সংবিধানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দিতে সম্মত হলেন; ৪র্থ ও ৫ম সংশোধনী বাতিল করার ইখতিয়ার এরশাদকে দিলেন। আরেকটি দল সকল সংশোধনী বাতিল করে ১৯৭২-এ প্রণীত মূল সংবিধান বহাল করার দাবি জানাল। এভাবে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সংবিধান সংশোধন করার অধিকার জেনারেল এরশাদের আছে বলে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিল। তারা এ কথা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হলেন যে, সংবিধানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা যদি এরশাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে তিনি তার মর্জিমতো রদবদল করবেন; তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না।

সংবিধানে এর সংশোধনের ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের হাতে দেওয়া আছে– এ কথা স্মরণ করিয়ে জামায়াতে ইসলামী রাজধানী ঢাকাসহ সকল জেলা শহরে ২৮ মার্চ (১৯৮৩) এক হ্যান্ডবিল বিলি করে। পরের দিন সেকালের প্রধান দৈনিক

ইত্তেফাক ঐ বিজ্ঞাপনটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে সকল মহলে ঐ বক্তব্য তুলে ধরে। এরপর কোনো রাজনৈতিক দল সংবিধান সংশোধনের পক্ষে আর কোনো দাবি জানায়নি। জেনারেল এরশাদও এ বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এভাবেই সংবিধানে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। যে কয়টি কারণে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি, শুধু সে কয়টি কারণই দূর করুন।

ভারতে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করল, আমরা কেন ব্যর্থ হলাম?

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় অনুযায়ীই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা পণ্ডিত জাওয়াহের লাল নেহরুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালেই ভারতীয় গণপরিষদ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। পণ্ডিত নেহরু দীর্ঘকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হন। কংগ্রেসের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফলে ভারতের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়নি। এরই ফলে ভারতে গণতন্ত্র কোনো সময়ই বিপন্ন হয়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর পরই পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান ও বলিষ্ঠ নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তিকাল করেন। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সংহত হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রপ্রধানের তিরোধানে সরকার স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে। দিল্লিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিটিশ আমলেই মযবুত অবস্থায় ছিল। করাচিতে পাকিস্তানের নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে ওঠার সময়ই প্রধান ব্যক্তিত্বের অবসানে পাকিস্তান বিরাট ধাক্কার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দীন, যিনি পাকিস্তান আন্দোলনে একজন প্রাদেশিক প্রধান নেতাও ছিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি কোনো প্রভাবশালী নেতা হিসেবে গণ্য ছিলেন না।

কায়েদে আযমের পর পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্রীয় নেতার মর্যাদায় ছিলেন নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সমমানের অন্য কোনো কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিল না। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে রাওয়ালপিন্ডিতে জনসভায় আততায়ীর গুলিতে প্রধানমন্ত্রী নিহত হওয়ার পর পাকিস্তান একেবারেই নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। গোটা পাকিস্তানের জনগণের নিকট নেতা হিসেবে গণ্য কোনো ব্যক্তিত্ব আর রইল না। খাজা নাজিমুদ্দীনের মতো দুর্বল নেতাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো হলো। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ-এর পর

বঙ্গদেশের প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় প্রথম সফরে এসেই 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে ঘোষণা দিয়ে নিজের প্রদেশেই চরম নিন্দনীয় হয়ে গেলেন।

খাজা নাজিমুদ্দীনের মতো দুর্বল নেতৃত্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি থাকাকালেই রাষ্ট্রপ্রধান সাবেক আমলা মালিক গোলাম মুহাম্মদ, প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা ও সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান– এ তিন কুচক্রী ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র শুরু করে। এসব চক্রান্তের কারণে এবং মুসলিম লীগের দুর্বলতার ফলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা বিলম্বিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালের (পাকিস্তানের জন্মের ৯ বছর পর) মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। ঐ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারা পাকিস্তানে প্রথম নির্বাচনের কথা ছিল; কিন্তু সেনাপ্রধান আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের অক্টোবরেই সামরিক শাসন জারি করে শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং সকল রাজনৈতিক দলকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

আইয়ুব খান দীর্ঘ দশ বছর স্বৈরশাসন চালু রাখার ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের এমন দশা হয় যে, আইয়ুব শাহীর পর চার দশকেও সেনাবাহিনীর খপ্পর থেকে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্র মুক্তি পায়নি।

রাজনৈতিক ময়দানে ক্ষমতার সুমধুর স্বাদ গ্রহণ ও ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির যে মহাসুযোগ পাওয়া যায়, সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনীতে সে সুযোগ নেই। তাই কোনো দেশে সশস্ত্র বাহিনী রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে গণবিপ্লব ও গণ-অভ্যুত্থান ব্যতীত তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। পাকিস্তান, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়া এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এ দশা কেন?

পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করেই তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৭০ ও '৭১ সালে শেখ মুজিব অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি জনগণের যে অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হলেন, তাতে পণ্ডিত নেহরুর চেয়েও অধিক যোগ্যতার সাথে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে সুসংহত করা সম্ভব ছিল। তিনি কেন গণতন্ত্রকে লালন করার পরিবর্তে হত্যা করলেন, সে বিষয়ে ইতঃপূর্বে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

গণতন্ত্র হত্যা না করলে তাঁকেও এমন নৃশংসভাবে হত্যা করার কারণ ঘটত না বলেই ইতিহাস বিশ্লেষকদের ধারণা। মুজিব হত্যার পথ বেয়ে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটল। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ প্রতিবিপ্লব

ঘটিয়ে সৈনিকদের হাতেই নিহত হলেন, সেনা অফিসারদের হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সেনাপতি আইয়ুব খানের মতোই সামরিক শাসন চালু করলেন।

১৯৯০ সালে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনর্বহাল হয় এবং ১৫ বছরে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির ফলে একদলীয় স্থায়ী শাসন কায়েমের সুযোগ না থাকায় গণতন্ত্র সুসংহত হওয়ারই কথা।

ইতঃপূর্বে আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ বিজয়ী না হলে নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নেওয়ার কারণেই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশের সকল নির্বাচন পর্যবেক্ষক ২০০১ সালের নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেয়নি। ২০০৭-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা বোধের অভাবেই শেখ হাসিনা মহাজোট করেও নির্বাচন বর্জন করে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। নির্বাচন বানচাল করার জন্য সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর ফলেই জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছে।

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর প্রশংসনীয় ভূমিকা

চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর শেষ হয়ে যাওয়ার পর ২৮ অক্টোবর থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে লগি-বৈঠা-লাঠির হিংসাত্মক সন্ত্রাসী ও অবরোধের যে হিংস্র রাজনীতি চালু হয়, তাতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং সরকার অচল হয়ে যায়। সারা দেশে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে যদি সেনাবাহিনী সামরিক শাসন জারি করত, তাহলে জনগণ অবশ্যই স্বাগত জানাত। ১১ জানুয়ারি (২০০৭) যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, এমন অবস্থায় যে কোনো দেশেই সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

আইয়ুব খান থেকে এরশাদ পর্যন্ত যত সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বিচক্ষণ সেনাকর্মকর্তাগণ যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশ সেনাশাসন থেকে রক্ষা পেয়েছে। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সংবিধান মুলতবি বা বাতিল করতে হতো। সংবিধান অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় বেসামরিক সরকারের হাতেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ বারবার ঘোষণা করেছেন যে, সেনাবাহিনী সরকারি ক্ষমতা দখল করবে না; রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না; কোনো রাজনৈতিক দল গঠন বা দলের সংস্কারে কোনো ভূমিকা পালন করবে না। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন।

এ সকল ঘোষণায় দেশবাসী আশ্বস্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্র পুনর্বহাল হবে। তাই বাংলাদেশের গণতন্ত্র পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা নেই। বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে, জনগণই সরকারি ক্ষমতার উৎস। পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো বাংলাদেশের ক্ষমতার প্রকৃত উৎস সশস্ত্র বাহিনী নয়। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দেশরক্ষার সাথে সাথে জনগণের শাসনেরও রক্ষক।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

বর্তমান নির্বাচন কমিশন সরকারি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এটা সংবিধানেরই দাবি। নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে এ কমিশন অনেক সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কমিশন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট নিবন্ধিত হওয়ার শর্ত বাধ্যতামূলক করেছে; নিবন্ধিত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে কতক শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করে সেসব প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা এবং বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকা কমিশনের স্বাধীনতার জন্য জরুরি।

জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগকে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার বিধান সংবিধানে থাকা সত্ত্বেও বিগত তিনটি রাজনৈতিক সরকার তা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকার তা সম্পন্ন করার পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এতে সাংবিধানিক কোনো জটিলতা নেই।

সরকারি ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে কথা ওঠেছে যে, সংবিধানে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা নেই বললেই চলে। তাই ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছু সংশোধন প্রয়োজন।

উপরিউক্ত সকল বিষয়ের মধ্যে যেসব বিষয় সংবিধান সংশোধন ছাড়া করা সম্ভব তা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। যে কয়টি বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন সেসব বিষয়ে আমার বিনীত পরামর্শ হলো–

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ সর্বসম্মতভাবে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করুক, যাতে জাতীয় সংসদে তা গৃহীত হতে পারে। জাতীয় সংসদ ছাড়া সংবিধান সংশোধনের কোনো চেষ্টা বর্তমান সরকারের করা উচিত নয় এবং কোনো রাজনৈতিক দলের তা সমর্থন করা মোটেই সমীচীন নয়।

'জীবনে যা দেখলাম' ৭ম খণ্ডে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির আলোচনা শেষ হয়েছিল।

১১ জানুয়ারি (২০০৭) জরুরি অবস্থা জারির পর দেশে চরম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল। বাধ্য হয়ে ১৯৯৫-এর ধারাবাহিক আলোচনা মুলতবি রেখে কয়েকটি কিস্তি ঐ প্রসঙ্গে লিখতে হলো। এখন থেকে ১৯৯৫ সালের ঘটনা লিখছি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে এ লেখা পাঠকদের নিকট সময়োপযোগী মনে না হলেও আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে লিখতে বাধ্য হলাম।

মজলিসে শূরার অধিবেশন

১৯৯৫ সালের জুনের কথা। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের পটভূমি পাঠকগণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তা না হলে বক্তব্য বুঝে আসবে না।

১৯৯৪ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করার দাবিতে জাতীয় সংসদ বর্জন শুরু করে। ২৭ জুন এ তিন দল ঘোষণা করে যে, ঐ বিল পাস না করলে তারা আর সংসদে যাবে না। ১৯৯৪-এর ২৮ ডিসেম্বর সকল বিরোধী দলের ১৪৭ জন এমপি একযোগে স্পিকারের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দেন। ১৯৯৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি স্পিকার সংসদে ঘোষণা করেন যে, পদত্যাগ গৃহীত হয়নি। ১৯৯৫ সালের ২০ জুন বিরোধী দলের অনুপস্থিতির ৯০ দিন পূর্ণ হয়ে যায়।

সংবিধান অনুযায়ী কোনো এমপি স্পিকারের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া মাত্রই তার পদ শূন্য হয়ে যায় এবং কোনো এমপি সংসদের কার্যনির্বাহী দিবসের ৯০ দিন একাধারে অনুপস্থিত থাকলে তার পদও শূন্য হয়ে যায়। সংবিধান অনুযায়ী এমপিদের কোনো পদ শূন্য হয়ে গেলে ৯০ দিনের মধ্যে ঐ পদে উপনির্বাচন করতে হয়।

১৪৭ জন এমপি'র সদস্যপদ শূন্য বলে স্বীকার করে নিলে সরকারকে হয় জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে হয়, আর না হয় শূন্য পদ পূরণের উদ্দেশ্যে উপনির্বাচন করতে হয়। সরকার এর কোনোটাই করতে ইচ্ছুক নয় বলে টালবাহানা করে কালক্ষেপণ করার নীতি গ্রহণ করেছে। তাই ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়ে পাঠান যে, ৯০ দিন অনুপস্থিতির কারণে জাতীয় সংসদের আসনসমূহ শূন্য হলো কি না। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন যে, আসন শূন্য হয়ে গেছে; ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপনির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

দেশের কোনো কোনো এলাকায় বন্যা হওয়ার অজুহাতে সরকার উপনির্বাচন তিন মাস পিছিয়ে দেয়। দৈব দুর্বিপাকের কারণে উপনির্বাচন তিন মাস পিছিয়ে দেওয়ার বিধান সংবিধানে থাকায় সরকার তা কাজে লাগাতে পারল।

বিএনপি সরকারের মেয়াদ ১৯৯৬ সালের মার্চে শেষ হওয়ার কথা। তাই মাত্র কয়েক মাসের জন্য উপনির্বাচন সম্ভব নয় জেনেও সংবিধানের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ২২ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ধার্য করা হলো; কিন্তু কোনো মনোনয়নপত্র দাখিল না হওয়ায় রাষ্ট্রপতি ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন।

১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর ১৪৭ জন এমপি পদত্যাগ করার পর উপনির্বাচনের মাধ্যমে এত সংখ্যক আসন পূরণের কোনো ইচ্ছা সরকারের ছিল না। তাই তাদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল সংসদ ভেঙে দেওয়া। সে দায়িত্ব পালন না করে অনৈতিকভাবে আরো এগারো মাস সংসদ চালু রাখা হয়। এ পটভূমিতে সেক্রেটারি জেনারেল মজলিসে শূরার অধিবেশনে ভাষণ দান করেন।

সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ

'বিরোধী দলের সকল এমপি পদত্যাগ করা সত্ত্বেও সরকার একদলীয় সংসদ চালিয়ে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছে। যত টালবাহানাই করুক, সরকার ১৯৯৬-এর মার্চ পর্যন্ত মেয়াদ পূরণ করতে পারবে না। তাই ১৯৯৬-এর জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। সরকার যাতে সংসদ ভেঙে দিতে বিলম্ব করতে না পারে এবং ১৯৯৫-এর মধ্যেই নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়, সেজন্য এ সময় সরকারের পদত্যাগ দাবিতে জোরদার আন্দোলন করা প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি আন্দোলন চায়; কিন্তু আওয়ামী লীগ তেমন আগ্রহী নয় বিধায় বর্তমানে আন্দোলন স্তিমিত অবস্থায় আছে।'

'বিরোধী দল পদত্যাগ করায় জাতীয় সংসদে দু-তৃতীয়াংশ আসনের অভাবে কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বেগম জিয়া ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় পরবর্তী নির্বাচন হবে। এ নির্বাচন বিরোধী দলের বর্জন করাই উচিত; কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের আগ্রহ নেই বিধায় সন্দেহ হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে ঢিলা দিয়েছে কেন?'

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সরকার উপনির্বাচন করবে না। এ অবস্থায় সংসদ অবিলম্বে ভেঙে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে সরকারের পতন বিলম্বিত না হয়।'

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমার সিঙ্গাপুর গমন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৪-'৯৫ সালের শীতকালে আমার এমন প্রচণ্ড রকমের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, মাথাসহ সারা শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হয়েছে।

জ্বর-সর্দি হলে তো স্বাভাবিক কারণেই মাথা অত্যন্ত ভারী বোধ হয়। কয়েক দিন পর জ্বর চলে গেলেও মাথা ভারীই রয়ে গেল।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা সফরে গেলে ফ্লোরিডায় হাসপাতালে চেকআপ করে মাথা ভারীর কারণ কিছুই জানা গেল না। অবশ্য মাথায় কোনো ব্যথা-বেদনা ছিল না; কিন্তু সবসময় মাথা ভারী থাকায় বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঢাকায় মাথার সিটি স্ক্যান করেও মাথা ভারী লাগার কারণ ডাক্তারদের নিকট ধরা পড়ল না। ডাক্তারেরা এমআরআই (ম্যাগনেটিক রেযোনেন্স ইমেজিং (MRI) করে দেখার পরামর্শ দিলেন। তখন পর্যন্ত ঢাকায় এমআরআই করার ব্যবস্থা ছিল না। তাই জামায়াত আমাকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জামায়াতের বিদেশ বিভাগের সেক্রেটারি আবু নাসের ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর আমাকে নিয়ে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে রওয়ানা হলেন। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর খুবই মনোরম। সেখানকার সংগঠনের ভাইয়েরা বিমানবন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। মাঝারি মানের একটা হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

চিকিৎসা শুরু

সিঙ্গাপুরের প্রখ্যাত মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে বড় ডাক্তারের সাথে পরের দিনের জন্য এপয়েন্টম্যান্ট করে রাখা হয়েছিল। চিনা বংশোদ্ভূত সিঙ্গাপুরি ডাক্তার (নাম মনে নেই) আমাকে অনেকক্ষণ সময় দিলেন। কয়েক রকমের পরীক্ষাসহ এমআরআই করার পরামর্শ দিলেন।

জানতে চাইলেন যে, আমি কোনো ওষুধ খাচ্ছি কি না। বললাম, প্রখ্যাত হারবাল বিশেষজ্ঞ ডা. আলমগীর মতির পরামর্শে অলিভ অয়েল খাই। আমি সারা জীবনই কনটিপেশনে ভুগছি। সিঙ্গাপুরি ডাক্তারও এ তেল খেতে পরামর্শ দিলেন।

সেদিন কয়েক রকমের পরীক্ষা হলো। পরের দিন এমআরআই হবে বলে জানানো হলো। যথাসময়ে হাজির হলাম। আমার সকল পোশাক খুলে গলা থেকে পা পর্যন্ত দীর্ঘ এক জামা পরতে দেওয়া হলো। এমআরআই মেশিন থেকে শবাধারের মতো একটি যন্ত্র বের হয়ে এল। আমাকে সেখানে শোয়ানো হলো। মাথা, বুক, হাঁটু ও পায়ে যন্ত্রটির সাথে ফিতা দিয়ে আমাকে বাঁধা হলো। লাশের মতো শুয়ে থাকলাম। এক মহিলা আমাকে বললেন, আপনাকে ৪৫ মিনিট মেশিনের ভেতরে রাখা হবে। একভাবে শুয়ে থাকবেন, সামান্য নড়া-চড়াও করবেন না। যাতে বোরিং ফিল না করেন, সেজন্য মাঝে মাঝে আমি কথা বলব। আপনি কিন্তু চুপ করেই থাকবেন। নিঃশ্বাস বন্ধ রাখতে বললে বন্ধ রাখবেন; ছাড়তে বললে ছাড়বেন।

এরপর আমার কফিনকে মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। জীবন্ত কবরস্থ অবস্থায় মনে-মুখে যিকর করতে থাকলাম। একসময় ঐ মহিলা বললেন, 'আর মাত্র ২০ মিনিট বাকি। বুঝলাম, ২৫ মিনিট পার হয়েছে। মহিলাটি ৫ মিনিট পরপর আমাকে সময়ের

হিসাব দিচ্ছিলেন। যথাসময়ে কবর থেকে মুক্তি পেলাম। জানিয়ে দেওয়া হলো, পরদিন বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার ফলাফল জানা যাবে।

এমআরআই মেশিন পরে ঢাকায় অনেক এসেছে। ইবনে সিনা হাসপাতালে যে উন্নত মানের মেশিন এসেছে তাতে দেখলাম যে, রোগীকে কবরে ঢোকাতে হয় না। খোলা অবস্থায়ই এমআরআই করা যায়। রোগীকে অন্ধকারে পড়ে থাকার যাতনা সইতে হয় না।

চিকিৎসার ফলাফল

পরের দিন ২৭ নভেম্বর ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম। পরীক্ষার ফলাফলের কাগজপত্র নিয়ে তিনি বসা। বললেন, 'সবদিক দিয়েই আপনি ভালো আছেন। এমন কোনো সমস্যা নেই, যার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। মাথা কেন ভারী বোধ হচ্ছে এর কারণ বোঝা গেল না। হয়তো এমনিতেই সেরে যাবে। কোনো যন্ত্রণা যখন নেই তখন ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কিছু ওষুধ দিলাম, যা আপনার সুস্বাস্থ্য অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে।'

১. হার্টের জন্য এমপিরিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে বললেন, ষাটের বেশি বয়সে এ ওষুধটা ব্যবহার করলে হার্ট স্ট্যাবল থাকে। বললাম, আমার ছোট ভাই মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসর। সে আমাকে এ ওষুধ খেতে পরামর্শ দিয়েছিল। সে চিকিৎসক নয় বিধায় আমি এ ওষুধ খাইনি। শুনে তিনি হাসলেন। তখন থেকে এ ওষুধ আমি নিয়মিত খাচ্ছি।

২. রোজ একটি করে কডলিভার অয়েল ক্যাপসুল খেতে বললেন, এটাও নিয়মিত খেয়ে চলেছি।

৩. অলিভ অয়েল যা খাচ্ছি তা খেতে থাকার পরামর্শ দিলেন। এটাও নিয়মিত খাচ্ছি। দু বেলা খাবার পূর্বে মাঝারি চামুচে দু চামচ করে খাই।

৪. জেনারেল হেলথ-এর জন্য ক্যালসিয়াম ও মাল্টিভিটামিন খেতে পরামর্শ দিলেন। রোজ একটা করে ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছি।

৫. সর্দির আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ভিটামিন সি খাওয়ার পরামর্শও দিলেন। রোজ একটা করে এ ট্যাবলেটও খাই।

সিঙ্গাপুর সফর সমাপ্ত

২৮ নভেম্বর (১৯৯৫) ঢাকা ফিরে এলাম। এ সফরে জামায়াতের সোয়া লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আমার মনে হলো, আমার এমন কোনো অসুখ ছিল না, যার চিকিৎসার জন্য এত টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল। তাই এ টাকা বাইতুল মালে ফেরত দেব। আল্লাহ তাআলা আমাকে ২০০১ সালের মধ্যে কিছু কিছু করে টাকা ফেরত দেওয়ার তাওফীক দিয়েছেন।

সিঙ্গাপুর শহরটা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এত গাছ-গাছড়া সত্ত্বেও রাস্তায় কোনো পাতা থাকতে দেখা গেল না। মেয়েদের পোশাক ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মতো এতটা নগ্ন না হলেও মহিলারা প্রায় সবাই হাফপ্যান্ট পরে থাকে। ইংল্যান্ডে যুবক-যুবতীদেরকে প্রকাশ্যে জড়াজড়ি করে যেভাবে চুম্বনরত দেখা যায়, সিঙ্গপুরে তা বেআইনি ও জরিমানাযোগ্য।

সংগঠনের ভাইয়েরা দু দিন আমাকে নিয়ে দুটো প্রোগ্রাম করেছেন। বাংলাদেশিদের সংখ্যা তখন সেখানে এত বেশি ছিল না। একদিন কর্মীসভা হয়, অপরদিন মসজিদে বাংলাদেশিদের সমাবেশে বক্তব্য রাখার পর প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন

১৯৯৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন আমার সভাপতিত্বে শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে আমি বললাম :

'বর্তমান রাজনৈতিক সংকট প্রধানমন্ত্রীর জিদের ফসল। ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলেই বেগম জিয়া ক্ষমতাসীন হলেন। অথচ কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করার জন্য তিন বছর পর্যন্ত চেষ্টা করেও তাঁকে সম্মত করা গেল না। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকে সকল বিরোধী দল এ বিল পাস করার জন্য সংসদ বর্জন করে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবল চাপ প্রয়োগ করল। জুন মাসে তাঁকে আল্টিমেটাম দেওয়া হলো যে, ডিসেম্বরের মধ্যে বিল পাস করা না হলে বিরোধী দলের ১৪৭ জন এমপি একসাথে পদত্যাগ করবেন। এ ছয় মাস সময়েও তাঁর হুঁশ হলো না। ২৮ ডিসেম্বর পদত্যাগের পর বিরোধী দলবিহীন একদলীয় সংসদ চালু রাখলেন। উপনির্বাচনও করলেন না, সংসদও ভাঙতে দিলেন না। এরপর বিল পাস করতে চাইলেও সংসদে দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভাবে তা করা সম্ভব হতো না।'

'সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর বেগম জিয়ার সরকারের পতন হয়ে গেলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তিনি নির্বাচিত নন, নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী। তিনি একদলীয় নির্বাচন করছেন। আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বর্জনে সম্মত হওয়ায় এ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। বেগম জিয়া হেলিকপ্টারে চড়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। ট্রেনে চড়ে সারা দেশে জনসমাবেশ করছেন। অন্য দলের কি এ সুযোগ আছে? কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হলে কি তিনি এ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন?'

'১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচন সকল বিরোধী দল বর্জন করেছে। এ প্রহসনমূলক নির্বাচনে অধিকাংশ জনগণ ভোট না দিলেও তিনি খালি মাঠে গোল দিয়ে বিজয়ী হবেন। এভাবে ক্ষমতায় গিয়ে কি টিকতে পারবেন? স্থায়ীভাবে ক্ষমতায়

টিকে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস হতে দিলেন না। সকল রাজনৈতিক দলকে তাঁর পদত্যাগ দাবিতে গণআন্দোলনে বাধ্য করলেন।'

'১৯৯০ সালে বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে এরশাদের স্বৈরশাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করে গণতন্ত্র বহাল করল এবং কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী করতে চেয়েছিল। বেগম জিয়া আবার গণতন্ত্রকে বিপন্ন করলেন। এর পরিণতি অবশ্যই তাঁকে ভোগ করতে হবে।'

সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ

উক্ত বার্ষিক অধিবেশনে সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিম্নরূপ ভাষণ প্রদান করেন :

> '১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সরকার গঠন ও সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনে জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারি পার্টি বিরাট ভূমিকা পালন করে। সংবিধানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের বিধান ছিল। বিএনপি এ বিধান বহাল রাখার পক্ষে ছিল। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় সরকারের পক্ষে ছিল। জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে সরকার গঠনে সহযোগিতা করল এবং বিএনপিকে সংসদীয় সরকার সমর্থন করতে সম্মত করল।'
>
> 'সে অনুযায়ী সংবিধানে ১২তম সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হলো। এ সংশোধনীতেই কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জামায়াতে ইসলামী চেষ্টা করেছিল। আওয়ামী লীগ যদি এ বিষয়ে সম্মত হতো তাহলে হয়তো বিএনপিকে সম্মত করা সম্ভব হতো। বিএনপি বিষয়টা এড়িয়ে গেল এবং আওয়ামী লীগ 'পরে দেখা যাবে' ভাব দেখানোর ফলে জামায়াতের প্রচেষ্টা সফল হলো না।'
>
> 'এখন বেগম জিয়া একদলীয় নির্বাচন করছেন। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি যানবাহন ব্যবহার করছেন, প্রশাসনকে দলীয়করণ করছেন এবং দলীয় মাস্তানদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। এ জাতীয় নির্বাচন থেকে বাঁচার জন্যই কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি প্রয়োজন।'
>
> 'বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দেওয়ার অপরাধে(!) শেখ হাসিনা জামায়াতকে বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করতে চাননি। সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে তাঁর এ মনোভাব জামায়াতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। জামায়াত সংসদে যে ভূমিকা পালন করে তাতে প্রমাণিত হয় যে, জামায়াত কাউকে অন্ধ সমর্থনও দেয় না, শুধু বিরোধিতার জন্যে বিরোধিতাও করে না। তাই আওয়ামী লীগের সৃষ্ট সমস্যা শেষ পর্যন্ত কেটে যায়।'
>
> 'জামায়াতের মধ্যস্থতা ছাড়া সরকারপদ্ধতির ব্যাপারে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সমঝোতা হতো না এবং ১২তম সংশোধনী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত

হওয়া সম্ভব হতো না। জামায়াতের সকল এমপি-ই সংসদে বক্তব্য রেখেছেন এবং জামায়াতের নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেছেন।'

'সকল জাতীয় ইস্যুতে জামায়াত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। মঞ্জুরি কমিশন গঠন, কৃষিঋণ সুদমুক্তকরণ, শিল্প ও বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ, সন্ত্রাস দমন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ইত্যাদি ইস্যুতে জামায়াত অত্যন্ত সোচ্চার ছিল।'

'ইসলামের পক্ষে সংসদে জামায়াতের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল– আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের কথা বলা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা, ব্লাসফেমি আইনের বিল উত্থাপন করা, ড. আহমদ শরীফের দীন সম্পর্কে বেআদবির প্রতিবাদ করা, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবি করা, বসনিয়া প্রশ্নে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত করা, বাবরী মসজিদ প্রশ্নে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করানো ইত্যাদি।'

'অধ্যাপক গোলাম আযমের ব্যাপারে সংসদে দু বার দীর্ঘ ও নিয়মবহির্ভূত আলোচনার বলিষ্ঠ মোকাবিলা করা হয়েছে।'

'চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ প্রতিপক্ষ গ্রহণ করেনি।'

'ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা রুখে দেওয়া হয়েছে।'

'মাদরাসা শিক্ষা ও ইবতেদায়ী মাদরাসার পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের দাবি জানানো হয়েছে।'

'জামায়াতের এমপিগণ ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করার জন্য কখনো যে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেননি, এ সত্য প্রশাসনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ

তিন দিনব্যাপী মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব পাস হয়। বিশেষ করে একদলীয় নির্বাচনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এবং প্রহসনমূলক নির্বাচনের পর সরকারকে কেয়ারটেকার বিল পাস করে সংবিধানে সংযোজন করার জোর দাবি জানানো হয়।

সমাপনী বক্তব্যে অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে আমীরে জামায়াত বলেন,

'বর্তমান নির্বাচন দেশে ও বিদেশে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। একটি দল এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পর যে সরকার গঠিত হবে তা স্বাভাবিক কারণেই টিকে থাকতে পারবে না। তাই কিছু দিন পরই আবার নির্বাচন হতে পারে।'

'এ পরিস্থিতিতে সারা দেশে জামায়াতকে ব্যাপকভাবে জনসমাবেশ করে জনগণের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে যে, দেশের উন্নয়নের জন্য জামায়াতে ইসলামী কী করতে চায়। জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। তাদের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। কুরআনের আইন প্রয়োগ না করার কারণে মহিলাদের উপর যেসব অত্যাচার চলছে তা থেকে তাদেরকে রেহাই দিতে হলে আল্লাহর আইন অবশ্যই চালু করতে হবে। বিয়ের সময় যৌতুকের জুলুম, বিবাহের পর মোহর আদায় না করা, পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে ওয়ারিশ হিসেবে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা, তালাক দিয়ে সন্তানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, তালাক না দিয়েও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করা ও অন্য বিবাহ করা, পুরুষের সমান কাজ করেও সমান বেতন না পাওয়া ইত্যাদি সকল রকম অন্যায় থেকে মহিলাদেরকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর আইন চালু করার দাবিতে মহিলাদেরকেও সোচ্চার করা প্রয়োজন।'

'মহিলাদের উপযোগী সকল পেশাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

'জনগণের শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী হলেও তাদের বিরাট সংখ্যক লোক জমিহীন কৃষিশ্রমিক। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন থাকলেও কৃষিশ্রমিকদের জন্য কোনো আইন নেই। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করতে হবে।'

'বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান বলে কৃষকদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সত্যিকার উন্নতি সম্ভব নয়। কৃষকগণ যাতে কম খরচে বেশি উৎপাদন করার সুযোগ পান, উৎপাদিত দ্রব্যের যাতে ন্যায্য মূল্য পান, উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি যাতে সংরক্ষণ করা ও বিদেশে রফতানি করা যায় এবং উৎপাদিত শষ্যাদি যাতে গুদামজাতকারী ব্যবসায়ীদের নিকট ন্যায্য মূল্যের কমে বিক্রয় করতে বাধ্য না হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকদেরকে উৎপাদনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিনা সুদে ঋণদান ও ন্যায্য মূল্যে যথাসময়ে সার ও কীটনাশক দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।'

'আইনে শ্রমিকদের যেসব অধিকার স্বীকৃত রয়েছে তা যাতে মালিকগণ বিনা আন্দোলনে দিতে বাধ্য হন, সে বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদেরকে আন্দোলন করতে বাধ্য করা হলে উৎপাদন অবশ্যই ব্যাহত হয়। এতে মালিকদেরই যে বেশি ক্ষতি হয় তা তাদেরকে উপলব্ধি করাতে হবে।'

'বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনবহুল দেশ। এত অল্প জায়গায় এত মানুষ দুনিয়ার কোথাও নেই। এ জনসংখ্যাকে আপদ মনে না করে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। বিশ্বের বহু দেশ তাদের প্রয়োজনেই বিদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করতে

বাধ্য হয়। তাই আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত যুবকদেরকেও প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র কারিগরী শিক্ষা দিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার আয় অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে সকল উপজেলা শহরে, এমনকি হাটে-বাজারেও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'পরবর্তী নির্বাচনে আরো ভালো ফলাফল পেতে হলে উপরিউক্ত বিষয়ে আমাদেরকে ব্যাপকভাবে জনমত গঠন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন।'

৩২৭.

গত কিস্তির লেখায় ১৯৯৫ সালের কথা লেখা শেষ হলো। পুস্তকাকারে সপ্তম খণ্ডে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত লেখা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের লেখা শুরু করার আগে আমার এবারকার ব্রিটেন সফর সম্পর্কে লিখছি।

গত শতাব্দীর পাঁচ বছরের লেখা বাকি আছে। এ শতাব্দীরও ৭ বছর চলে যাচ্ছে। জানি না আল্লাহ তাআলা কত দিন পর্যন্ত লেখার তাওফীক দেবেন। আল্লাহর মেহেরবানী যে, আমি এখন নিজের হাতেই লিখছি। ডিকটেশন দিয়ে লেখাতে হলে আরো একজনের সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া এভাবে লেখানোর অভ্যাস আমার নেই।

প্রতি বছর ব্রিটেনে কেন আসি

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন যে, আমার ছয় ছেলের মধ্যে পাঁচ জনই বিদেশে। একজন জেদ্দায় থাকলেও তার সন্তানেরা ইংল্যান্ডেই থাকে। এদের জন্মও এ দেশেই। আমার চার ছেলে সপরিবারে এ দেশে থাকে। ২০ নাতি-নাতনীর মধ্যে ১৭ জনই ব্রিটেনে থাকে। তাদের পক্ষে একসাথে প্রতি বছর বাংলাদেশে গিয়ে আমাদেরকে দেখা সম্ভব নয় বিধায় প্রতি বছরই আমরা দু বুড়ো-বুড়ি কয়েক মাসের জন্য ব্রিটেনে আসতে বাধ্য হই; ছেলে, বৌমা ও নাতি-নাতনীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা কিছুটা হলেও দূর করার চেষ্টা করি। বিশেষ করে ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা তো দাদা-দাদু কী জিনিস বুঝতেই পারবে না, যদি আমরা না আসি।

আল্লাহ তাআলা সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনীদের জন্য যে মায়া-মমতার বন্ধনে মানুষকে বেঁধে রেখেছেন, এর তাগিদকে উপেক্ষা করার সাধ্য কার? তাই যত দিন স্বাস্থ্যে কুলায় এভাবে প্রতি বছরই আসতে হবে।

বেড়ানোর আনন্দে এবার ছেদ পড়ল

একটি কারণে এবার বেড়াতে আসার আনন্দ অন্য বারের মতো উপভোগ করা গেল না। এখানে আসার এক সপ্তাহ পর আমার স্ত্রীর পায়ে সায়েটিকার আক্রমণ হওয়ায়

বেচারি ব্যথা-বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। 'ফিজিওথেরাপি' হলো এ রোগের চিকিৎসা। ঢাকায় ফিরে গেলে এ চিকিৎসা করা যাবে, ইনশাআল্লাহ। এদেশে বিদেশিদের চিকিৎসা এত ব্যয়বহুল যে, তা আমাদের সাধ্যের বাইরে। অথচ যারা এখানে কর্মরত, তারা বিনামূল্যেই চিকিৎসা সেবা পায়। মালিশ ও সেঁক ইত্যাদি দ্বারা বেচারি কিছুটা উপশম বোধ করছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় পিতামাতার কোনো গুরুত্ব নেই। ইসলামী সভ্যতায় আল্লাহর দাসত্বের পরই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের তাগিদ রয়েছে। আমার ছেলেরা এ দেশের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হলেও তাদের পিতামাতা হিসেবে কোনো অধিকার ভোগ করার সুযোগ আমাদের নেই। তাই চিকিৎসাসেবার অধিকারী আমরা নই।

অথচ আমার বড় ছেলে সৌদি আরবে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কর্মরত থাকায় তার পিতামাতা হিসেবে আমরা চিকিৎসাসেবা পাই। সৌদি আরব গেলে তো প্রায় বিনামূল্যেই চিকিৎসাসেবা পাই। এমনকি বাংলাদেশে চিকিৎসা করতে যে ব্যয় হয় এরও শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যাংক বহন করে থাকে।

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা

মাঝে মাঝে আমি প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানাই। তাদের দোআ পাওয়াই এর আসল উদ্দেশ্য। প্রতি বছর ইবনে সিনা হাসপাতাল বিনামূল্যে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে। ব্রিটেন সফরের আগে এবারও চেক-আপ করা হয়েছে। গলব্লাডারে ছোট দুটো পাথর পাওয়া গেল। আর সব ঠিক আছে। প্রফেসর ডা. মতিয়ার রহমান বললেন, 'যখনই চান পাথর বের করে দেব'। জামায়াতে ইসলামীর বাইতুল মালের অডিটর ডা. আনসার আলীর দেওয়া হোমিও ওষুধ খাচ্ছি।

আল্লাহর রহমতে জেনারেল হেল্থ ভালোই আছে। খাওয়া, ঘুম, লেখা-পড়া যথানিয়মেই চলছে। সায়েটিকার কারণে গত চার বছর ধরে হাঁটা-চলার জন্য ক্র্যাচ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। এবার সফরে আসার আগে কাকরাইলস্থ ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে ১০-১২ দিন ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয়েছে। থেরাপিস্ট ডা. আলতাফ হোসেন সরকার ক্র্যাচ ছাড়া হাঁটার পরামর্শ দিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী এখানে আসার পর ক্র্যাচ ব্যবহার না করেই ১৫ থেকে ২০ মিনিট হাঁটছি। মধ্যম গতিতে হাঁটি। দ্রুত হাঁটা সম্ভব হয় না।

বছর দশেক আগে পুরান ঢাকার অধিবাসী জনাব মুহাম্মদ সাখী মিয়া আমাকে বললেন, 'হাতের তালুতে মধু নিয়ে চেটে চেটে খাবেন, আর কালজিরা খাবেন। এটা হাদীসের কথা।' হাদীসে তালাশ করে পেলাম, 'প্রতি মাসে তিন দিন মধু চেটে খেলে কোনো

রোগ হবে না।' আরেক হাদীসে পেলাম, 'কালজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ওষুধ।' আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, প্রতি দিন ফজরের নামাযের আগেই হাতের তালুতে রেখে চেটে চেটে মধু খাই। কালজিরা বিভিন্নভাবে খাওয়ার চেষ্টা করে সুবিধা বোধ না করে ডা. আলমগীর মতির পরামর্শ চাইলাম। তিনি কালজিরার তেলের শিশি দিয়ে ভাতের সাথে ১০ ফোঁটা করে মেখে খেতে বললেন। দুই বেলা নিয়মিত এ তেল খাচ্ছি।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে দুপুরে লেবুর শরবতের সাথে ইসবগুলের ভুসি খাই। ডাক্তারদের পরামর্শে সামান্য পরিমাণ ভাত খাই এবং প্রচুর পরিমাণে সবজি ও ফল খাওয়ার চেষ্টা করি।

ছোট বেলায় দেখেছি, দাদি ঘরে চিরতা রাখতেন। পেটের পিড়ায় চিরতা ভেজানো পানি খাওয়াতেন। সেই বিখ্যাত চিরতা বর্তমানে ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। আমার ৪র্থ বৌমা নীরু এ ক্যাপসুল খেয়ে উপকার বোধ করে ওর শাশুড়িকে এনে দিল। প্যাকেটে লেখা 'খাদ্যের সম্পূরক'। অর্থাৎ এটা ওষুধ নয়, ভিটামিন ট্যাবলেটের মতো খাদ্য। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ফর্মুলায় প্রস্তুত। লিভার ও কিডনির প্রাকৃতিক সুরক্ষা। গত কয়েক মাস থেকে আমিও এটা খাচ্ছি।

২০০৪ সাল থেকে একটু ব্লাড প্রেসার দেখা গেল। এর জন্য ওষুধ খাওয়া শুরু করলে অব্যাহতভাবে খেতে হয়। তা রোজই খাচ্ছি। একবার নিউরোলজির এসোসিয়েট প্রফেসর ডা. রেজাউল করীম খান দুই বছর আগে 'ফরমুলা ফর জয়েন্টস্' নামে একটা ওষুধ খেতে পরামর্শ দিলেন। এতে বেশ উপকার পেয়েছি। তাই নিয়মিত খাচ্ছি। সিঙ্গাপুরের ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ তো খাচ্ছিই। আল্লাহর রহমতে স্বাস্থ্য স্থিতিশীলই আছে। এ বয়সে স্বাস্থ্যের অবনতি না হয়ে স্থিতিশীল থাকাটাই তো বড় কথা। হায়াত বৃদ্ধির দোআ চাই না। সবার কাছে এ দোআই চাই যে, যতটুকু হায়াত আছে আল্লাহ তাআলা যেন কর্মক্ষম রাখেন। অকর্মণ্য করে দীর্ঘদিন যেন বিছানায় ফেলে না রাখেন।

নাতি-নাতনীদের কথা

আল্লাহর প্রতি লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, নাতি-নাতনীরা দীনের যোগ্য খাদেম হিসেবে গড়ে ওঠছে। পার্থিব যোগ্যতায়ও সন্তোষজনক অগ্রগতি লক্ষ করছি। কিন্তু তাদের যোগ্যতা আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের কাজে লাগার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। আমার ছেলেদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। তাই দেশের জন্য তাদের মনের টান আছে বলে অনুভব করি। এরা ব্রিটিশ নাগরিক হলেও তাদের জন্মভূমিকে ভোলেনি। এরা নিয়মিত দেশের খবর রাখে। ভালো খবরে আনন্দিত ও মন্দ খবরে আমাদের মতোই দুঃখ বোধ করে। টেলিফোন করেও দেশের খবর জানার চেষ্টা করে।

কিন্তু নাতি-নাতনীদের তো ব্রিটেনেই জন্ম হয়েছে। এটাই তাদের জন্মভূমি। এ দেশের আলো-বাতাসেই এরা অভ্যস্ত। এখানে লেখাপড়া করে ভালো ভালো চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। ইসলামী সংগঠনভুক্ত হয়ে দীনের পথেও অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশকে বাপ-দাদার দেশ হিসেবে ভালোবাসে। ব্রিটেনে বসবাসকারী অন্যান্য দেশের লোকদের নিকট বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয়ও দেয়। বাংলাদেশে হলিডে যাপনের জন্য যেতে আগ্রহী হলেও স্থায়ীভাবে যেতে রাজি নয়। দু ছেলের সন্তানেরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাল্যকালে এ দেশে এসে বড় হচ্ছে। তাদের মনোভাবও একই রকম। স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ তাদেরও নেই।

আমার পাঁচ ছেলের ঘরের ১৭ জন নাতি-নাতনী লন্ডন ও ম্যানচেস্টারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আমার বংশ তো সব বিদেশিই হয়ে গেল। শুধু এক ছেলের ঘরের তিন নাতি-নাতনী দেশে আছে। হিসাব কষে দেখলাম, আমি মাত্র তিন জন বাংলাদেশির দাদা এবং ১৭ জন ব্রিটিশ নাগরিকের দাদা, যাদের চার জন এখনো ব্রিটিশ নাগরিক না হলেও কিছু দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এদের জন্ম বাংলাদেশে। আমার পরবর্তী বংশের সবাই দীন ও দুনিয়া দু দিকেই উন্নতি করছে দেখে তৃপ্তিবোধ করলেও আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ তাদের খিদমত থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে বলে অতৃপ্তিবোধ না করেও পারছি না। এর কোনো প্রতিকারের উপায়ও দেখছি না। কবি ইকবালের 'মুসলিম হ্যায় হাম, ওতান হ্যায় সারা জাহাঁ হামারা' কথাটিই একমাত্র সান্ত্বনা।

কয়েক বছর আগে আমি এক কিস্তিতে লিখেছিলাম, 'ইসলামকে সহজ ও সরলভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে যত বই লিখলাম তা থেকে অনেক লোক উপকৃত হচ্ছে। আফসোসের বিষয় যে, আমার নাতি-নাতনীরা বাংলা ভাষা পড়তে অক্ষম বিধায় তাদেরকে শেখাতে পারছি না। এ কথা জেনে বেশ কয়েক জন বাংলা পড়তে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজির তুলনায় বাংলা শেখা বেশ কঠিন। বর্ণের সংখ্যা ইংরেজির প্রায় দ্বিগুণ। তা ছাড়া যুক্তবর্ণের সংখ্যাও অনেক। পড়তে পারলেও অনেক শব্দের অর্থ জানে না। না বুঝে কুরআন পড়ার মতো আর কি! আমার লেখা 'ইসলামের সহজ পরিচয়' বইটা পড়ার পরামর্শ দিয়েছি, যাতে একটি বই থেকে পরিপূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারে এবং ভাষাজ্ঞানও বাড়ে।

এক নাতনীর বিয়ে

২০০৫ সালে বড় ছেলের বড় ছেলে এবং দ্বিতীয় ছেলের বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। এ বিষয়ে লেখা হয়েছে দু বছর আগে। এবার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের ২য় মেয়ে আলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। ২৫ আগস্ট বিয়ে হওয়ার কথা রয়েছে। বিয়ের কয়েক দিন পর ৩১ তারিখে আমরা ঢাকা রওয়ানা হয়ে পরের দিন বিকালে পৌঁছার আশা রাখি।

আমি এখানে আসার আগে থেকেই বাংলাদেশি এক ছেলের সাথে বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। দীনের দিক দিয়ে সন্তোষজনক না হওয়ায় আমরা পিছিয়ে এলাম।

আলিয়া ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবারই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজে বিএ অনার্স পাস করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায়ই এক বছর কায়রো ও আম্মানে আরবী ভাষা শিক্ষা করল। এ দেশের ক্যামব্রিজের ডিগ্রির অত্যন্ত কদর। সে একটা নামকরা ল' ফার্মে চাকরি পেয়ে গেছে। তাদের খরচে ২ বছর ল' পড়বে। এরপর কমপক্ষে ২ বছর তাদের ফার্মে চাকরি করার পর ইচ্ছা করলে চলে আসতে পারবে। সে ইসলামী আইনে পারদর্শী হতে আগ্রহী।

তারই এক পাকিস্তানি সহপাঠিনী বসনিয়ার এক ছেলের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। জানা গেল, ছেলেটি ক্যামব্রিজ থেকেই ফিজিক্সে অনার্স ফার্স্ট ক্লাসের পর ২৬ বছর বয়সেই পিএইচডি ডিগ্রি পেয়ে গেছে। আলিয়ার বড় বোন ডা. আতিয়া ও তার স্বামী ছেলেকে দেখে পছন্দ করল এবং সে এখানে কেন বিয়ে করতে চায়, সে বিষয়ে জানতে চাইলে ছেলেটি বলল, '৬০০ বছর আগে বসনিয়া ওসমানী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আমাদের পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কমিউনিস্ট শাসনামলে আমাদের পরিবার দীনের ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ে। ক্যামব্রিজে এসে ছাত্রদের ইসলামিক সোসাইটির মাধ্যমে আমি মুসলিম হিসেবে বেশ অগ্রসর হতে পেরেছি। আমি আলিয়া ও তার পরিবার সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আরো উন্নত মানের মুসলিম হওয়ার উদ্দেশ্যেই এ বিয়ে করতে চাই।' ছেলের নাম করীম সুরুলিয।

আমার ছোট ছেলে ড. সালমানের সাথে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বসনিয়ার এক মুসলিম ছাত্রের বন্ধুত্ব ছিল। তার মাধ্যমে ছেলের বংশ সম্পর্কে ভালো সার্টিফিকেট পাওয়া গেল। জানা গেল, ছেলের পিতা বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স-এর প্রফেসর এবং মাতা সেখানেই একটা ইন্টার কলেজে ফিজিক্স-এরই টিচার।

আলিয়া এ বিয়েতে সম্মতি দিতে অনেক সময় নিল। ইস্তিখারা করতে থাকল। DEEN INTENSIVE নামক একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের সাথে মক্কা, মদীনা ও তায়েফ সফরে গেল। আমেরিকার প্রখ্যাত কনভারটেড মুসলিম হামযা ইউসুফের নেতৃত্বে আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেনের প্রায় ২০০ নারী-পুরুষ তিন সপ্তাহ সৌদি আরবে শিক্ষা সফরে কাটাল। কাবা শরীফকে সামনে রেখে মাকামে ইবরাহীমে অবস্থানকালে আলিয়া এ বিয়ের পক্ষে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফোনে ওর আব্বাকে জানাল।

১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মাল্টি ন্যাশনাল কনফারেন্সে উক্ত হামযা ইউসুফ অত্যন্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সমগ্র পাশ্চাত্যে তিনি খ্যাত।

বড় নাতির থিসিস

বড় ছেলে মামূনের প্রথম সন্তান নাবীল। আমার এক কুড়ি নাতি-নাতনীর মধ্যে সে-ই সবার বড়। এ প্রজন্মের সবার নেতা। ইসলামী সংগঠনেও সবচেয়ে অগ্রসর। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে পাস করল। এমএসসি ডিগ্রির জন্য একটা থিসিস লিখতে হয়। গত বছর ফোর্ড মোটর কোম্পানিতে 'হিউম্যান রিসোর্স এডভাইজার' পদে চাকরিতে যোগদান করায় থিসিস রচনা করা সম্ভব হয়নি। এবার যথাসময়ে থিসিস জমা দেওয়ায় MSc ডিগ্রি পেয়ে গেল।

থিসিসটা না পড়লে আমি এটা উল্লেখযোগ্য মনে করতাম না। 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' সম্পর্কে থিসিসে সে লিখেছে, এ বিষয়ে যারা অথরিটি হিসেবে স্বীকৃত তাদের লিখিত গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে, বিষয়টি একেবারেই আধুনিক এবং দু শ' বছর পূর্বে এ বিষয়ের কোনো ধারণা ছিল না। নাবিল প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ (স)-এর যুগে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং বহু শতাব্দী ইসলামী সভ্যতা বিশ্বে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। এমনকি নাবীল বিস্ময়করভাবে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের ব্যবস্থার মধ্যেও হিউম্যান রিসোর্স ম্যনেজমেন্টের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এমন একটি সমৃদ্ধ থিসিস সে রচনা করতে সক্ষম বলে আমার মোটেই ধারণা ছিল না।

থিসিসটা পড়ে আমি মন্তব্য করলাম, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের এই গৌরবগাথাকে স্বীকৃতি দিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান নামধারীরা স্বীকৃতি দিত কি না কে জানে?

নাবীল বলে, 'ছাত্রজীবনে ইসলামী সংগঠন পরিচালনার মাধ্যমে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, কর্মজীবনে তা খুবই কাজে লেগেছে। ফোর্ড মোটর কোম্পানিতে কর্মরত চার-পাঁচ শ' জনশক্তিকে ম্যানেজ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আমার সার্ভিসে খুবই সন্তুষ্ট।'

নাতবৌ-এর সাফল্য

নাবীলের স্ত্রী নাসরিন গত জুন মাসে লন্ডনের কিংস মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে বাসার কাছেই লন্ডন হাসপাতালে চাকরি পেয়ে গেল। এ দেশে ডাক্তারি পাস করার পর ইন্টার্নি হিসেবে কর্মরত থাকাকালেই পূর্ণ বেতন পায়। ১ আগস্ট (২০০৭) সে চাকরিতে যোগদান করেছে।

গত বছর নাবীল চাকরিতে যোগদান করলেও বাসা নেয়নি। এবার বাসা নিয়েছে বিধায় জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহটা ওর বাসায় বেড়ালাম। ছুটি থাকায় নাতবৌ

অবিরাম দাদা-দাদুর খিদমতে লেগে ছিল। নাবীলের ছোট দু বোন ঐ বাসায়ই থাকে। তাদের থাকা-খাওয়ার দিকে নাসরিনকে অত্যন্ত যত্নশীল দেখে নাবীলের দাদু খুশি হয়ে মন্তব্য করলেন, 'যোগ্য বড় বৌ-ই আল্লাহ দিয়েছেন।'

এক নাতি কণ্ঠশিল্পী

বড় ছেলের মেঝ ছেলে নাযীলের আম্মা সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর গানের ক্যাসেট শুনতে খুব পছন্দ করত। সে গান শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাযীল ঐ সব গান গাইতে চেষ্টা করত। ওর মিষ্টি গলা শুনে ওর মা বেশ উৎসাহ দিত।

নাযীলের আপন মামা ঢাকার খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী সাইফুল্লাহ মানসূর তার ভাগ্নের মধ্যে শিল্পীর প্রতিভা লক্ষ করে এ ব্যাপারে স্নেহপরায়ণ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

ম্যানচেস্টারে আজারবাইজানের এক সঙ্গীতপ্রতিভা বাস করেন। তিনি উস্তায ফিরোজ নামে পরিচিত। তাঁর কৃতী সন্তান সামী ইউসুফের সাথে নাযীলের বন্ধুত্ব হয়। ইতোমধ্যে সামী ইউসুফ ইংরেজি ও আরবী গানের অত্যন্ত প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। সেও নাযীলের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। নাযীল ক্রমে সামী ইউসুফের পিতার স্নেহধন্য শাগরিদে পরিণত হয়। নাযীল গান রচনা করে, আর উস্তায ফিরোজ সুরকারের দায়িত্ব পালন করেন। সামী ইউসুফ এখন বেশি সময়ই কায়রোতে থাকে। সে বর্তমানে আরব জগতে গানের রাজা।

সিলেটের মাওলানা আবদুল কাদের শরীফ লন্ডনে দীর্ঘ দিন ধরে স্থায়ী বাসিন্দা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামী ছাত্রসংঘের সংগঠক হিসেবে তিনি যথেষ্ট অবদান রাখেন। একসময় তিনি ইংল্যান্ডের দাওয়াতুল ইসলামের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কৃতী সন্তান হাসানুল বান্নার উদ্যোগে AWAKENING (জাগরণ) নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এ সংস্থা নাযীলের ১০টি গানের একটি ক্যাসেট তৈরি করে গানের জগতে ছড়িয়ে দেয়। এরই বদৌলতে নাযীল এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী।

প্রথম গানটি বাংলা ও ইংরেজি মিলিত ভাষায়। বাংলাটুকুর কথা ও সুর ঢাকার তাফাজ্জল হোসাইনের। একটি গান উর্দু, ইংরেজি ও আরবীতে। বাকিগুলো ইংরেজি ও আরবী মিলিত ভাষায়। এসবের রচনা নাযীলের এবং সুর উস্তায ফিরোজের। সবই ইসলামী গান। গানের জগতে পরিচিতির ফলে তাকে আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, কুয়েত ও সৌদি আরবে গান শোনাতে যেতে হয়েছে। আরো অনেক দেশে যেতে হবে।

নাযীল এ-লেভেল পাস করার পর এক বছরে আরবী ভাষা আয়ত্ত করে। এবার ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স-এ অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে এ দেশে আরবী শিক্ষায় আগ্রহীদেরকে সে আরবী শেখায়।

এবার যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করতে হলো

গত বছর (২০০৬) ম্যানচেস্টারে তিন ছেলের বাসায় পাঁচ সপ্তাহ থেকে লন্ডনে এসে ছোট ছেলে সালমানের বাসায় প্রায় দেড় মাস অবস্থানের পর ম্যানচেস্টারে ফিরে গিয়ে দশ দিন পর ঢাকা চলে গেলাম। আমরা সব সময়ই 'ঢাকা-ম্যানচেস্টার-ঢাকা' টিকিট করি। কারণ, ম্যানচেস্টারেই বেশি লোক থাকে।

এবার ধারণা ছিল যে, ম্যানচেস্টারে পাঁচ সপ্তাহ থেকে লন্ডনে দেড় মাস থাকার পর ম্যানচেস্টার ফিরে যাব এবং সেখান থেকে এক সপ্তাহ পর ঢাকা রওয়ানা হব। কিন্তু লন্ডনে আসার পর তিন সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই নাতনীর বিয়ের অ্যাঙ্গেজমেন্টে শরীক হওয়ার জন্য ম্যানচেস্টারে যেতে হলো। সালমানের বাসা বদলের কারণে এক সপ্তাহ ম্যানচেস্টার থেকে ৪ আগস্ট আবার লন্ডন ফিরে আসলাম। ২৫ আগস্ট নাতনীর বিয়ের আগেই ম্যানচেস্টার যেতে হবে।

গত বছর লন্ডনে প্রায় দেড় মাস এক বাসায়ই ছিলাম। এবার বড় নাতির বাসা ও বড় নাতনীর বাসায়ও থাকতে হলো। এভাবে যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ির ঝামেলা পোহাতে হলো। সায়েটিকার কারণে আমার চলাফেরায় অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। এবার আমার স্ত্রীও সায়েটিকায় আক্রান্ত। যেখানে যাই দু জনকেই যেতে হয়। এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে হলে কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্র, লেখা-পড়ার সরঞ্জাম ও ব্যবহারের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হয়। গন্তব্যে পৌছে সেখানে সবকিছু আবার সাজিয়ে রাখতে হয়। এ কাজ আমাদেরকেই সমাধা করতে হয়। আর কেউ আমাদের পছন্দমতো করতে পারবে না। আমরা দু জনও নিজ নিজ জিনিস নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী গোছাই ও সাজাই। এটা কি কম ঝামেলা?

আসলে দুনিয়ার জীবনটা ঝামেলায় পূর্ণ। এখানে সুখ ও দুঃখ একসাথে মিলে আছে। আমরা এখানে বেড়ানোর সুখ ভোগ করতে এসেছি; কিন্তু এ সুখ নিরঙ্কুশ নয়। ঝামেলার দুঃখও এড়ানোর উপায় নেই। বিশেষ করে আমাদের মতো বুড়ো বয়সে পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল, খাওয়া-দাওয়া, এমনকি ঘুমানো পর্যন্ত ঝামেলাময় মনে হয়। 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'– কবির এ কথা কতই না বাস্তব সত্য! একমাত্র পরকালেই সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। বেহেশতে শুধু সুখ, আর দোযখে শুধুই দুঃখ।

বড় নাতনীর বাসায়

বড় নাতনী ডা. আতীয়া গত বছর ম্যানচেস্টার থেকে ডাক্তারি পাস করার পরই লন্ডনে এক হাসপাতালে ইন্টার্নি হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করে। তার স্বামীর নিজস্ব বাড়ি থেকেই কর্মস্থলে যেত। এবার অন্য হাসপাতালে বদলি হয়েছে, যা বেশ দূরে। তাই কর্মস্থলের নিকটে তিন তলায় একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছে। বাংলাদেশী ইসলামী

ব্যাংক যে পদ্ধতিতে সুদমুক্তভাবে বাড়ি নির্মাণে পুঁজি বিনিয়োগ করে, সে পদ্ধতিতেই এ দেশে 'ইসলামিক ফিন্যান্স' নামে একটি সংস্থা রয়েছে। এ সংস্থার সহযোগিতায় ফ্ল্যাটটি কেনা হয়েছে।

নাত-জামাইয়ের ডাক নাম সুমন। এ নাম ওর জীবনে সার্থক। মা-শা-আল্লাহ! সত্যি সে সুমনের অধিকারী। ৪ আগস্ট তৃতীয় ছেলে মোমেন নিজের গাড়ি চালিয়ে ইস্ট লন্ডন পৌঁছল। সুমন সেখান থেকে ওদের বাসায় নিয়ে গেল। ৪৫টি সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠলাম। আমাদের দু জনের জন্যই এ কাজ খুবই কঠিন। আতিয়া বলল, 'অন্য বাসায় তো খাওয়ার জন্য কয়েক বার নিচতলায় যেতে হয়; আমার বাসায় একবার ওঠার পর বারবার নামতে হবে না'। এ দেশের বাড়িগুলোতে উপর তলায় থাকা ও টয়লেট, নিচতলায় রান্না ও খাওয়া। কিন্তু ফ্ল্যাটগুলোতে একসাথেই সব। নাবীলের বাসায়ও এ রকম; কিন্তু ছেলেদের সব বাসায়ই অন্য রকম।

এ নাতনীর হাতে রান্না করা খাবার এবারই প্রথম খেলাম। সে এত পড়ুয়া ছিল যে, মায়ের বড় মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও পাকঘরে মাকে কখনও সাহায্য করেনি। আলিয়া মায়ের কাছেই পাক করা শিখেছে। আতিয়া শাশুড়ির সাথে একবছর ছিল; কিন্তু শাশুড়ি এত আদর করতেন যে, বৌমাকে পাক করতে দেননি। আতিয়া মাঝে মাঝে রান্নাঘরে শাশুড়িকে সাহায্য করে কিছু শিখেছে।

এ নতুন বাসায় মাত্র ২ দিন আগে উঠেছে। আতিয়া পাকঘরের দায়িত্ব নিয়েছে মাত্র। খাওয়ার সময় ওর দাদু বলে ওঠল, 'মা-শা-আল্লাহ! প্রথম রান্নাতেই পাস। আশা করিনি, আতিয়া এত মজার খাবার পাকাতে পারবে।' তিনি ম্যানচেস্টারে ফোন করে আতিয়ার মাকে জানিয়ে দিলেন, তোমার মেয়ে মজা করে রান্না করা শিখে ফেলেছে। তোমাকে শেখাতে হবে না। সুমন বলল, রান্নার বই পড়ে পাক করেছে।

সুমন খুব নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠনভুক্ত হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিলাম। এ জাতীয় কোনো সংগঠনে সক্রিয় না হলে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে মানা হয়, দীন হিসেবে মানা হয় না। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। নবীর প্রতি ঈমানদারদের উপরও এ দায়িত্ব বর্তায়। রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবিদারদের মাঝে যারা নামাযে রাসূলের সাথি হয়েও ঐ দায়িত্ব পালনে সাথি হতে রাজি হয়নি, তারা মুনাফিক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে।

অপ্রত্যাশিত সাহায্য

ম্যানচেস্টার থেকে লন্ডনের দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। ট্রেন বা বাসে যেতে হলে যেটুকু পথ হাঁটতে হয় তা-ও আমার স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমাদের চলাফেরার জন্য মোটর কার ছাড়া উপায় নেই। গত শনিবার মোমেনের গাড়িতে সকাল সাড়ে

আটটায় রওয়ানা হলাম। জ্যামে না পড়লে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা লাগে। লন্ডন শহরে ঢোকার পর প্রায়ই ভিড়ে আটকা পড়তে হয়।

লন্ডন পৌঁছার ৪০ মাইল বাকি থাকতে গাড়ির পেছনের এক চাকা পাংচার হয়ে গেলে কিনারায় থামানো হলো। বেলা তখন সাড়ে বারোটা। চাকা বদলানো খুব কষ্টকর বিধায় মোমেন গাড়িতে যন্ত্রপাতি রাখে না। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ফোন করলে তাদের নিকটবর্তী স্টেশন থেকে লোক এসে চাকা বদলে দিয়ে যায়। এতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। মোমেন ফোন করার কয়েক মিনিট পরই একটা গাড়ি এসে কাছেই থামল। এক লোক বলল, 'Should I help you?' মোমেন সম্মতি দিলে সে যন্ত্রপাতি নিয়ে ৫-৭ মিনিটের মধ্যে চাকা বদলে দিল। টাকা দাবি করল না। মোমেন ১০ পাউন্ড দিলে খুশি হয়ে নিল। মোমেন মন্তব্য করল, মনে হলো আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। জানা গেল, ঐ লোক গাড়ি মেরামতের কারখানায় কাজ করে। এ পথে চলছিল। আমাদের গাড়িকে থেমে যেতে দেখে বুঝতে পারল যে চাকা পাংচার হয়েছে। মোমেন ফোনে ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে জানিয়ে দিল যে তাদের আর আসতে হবে না।

আমরা সবাই এমন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি পরম ও গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। এমন কঠিন মুহূর্তে এ রকম অপ্রত্যাশিত সাহায্যের শুকরিয়া আদায় করা কি সম্ভব? ঐ সাহায্যকারীকে আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা সাহায্য করুন- এ দোআই করি।

এ সময় পাঁচ ছেলেই ইংল্যান্ডে

গত ৩১ জুলাই (২০০৭) মামূন সস্ত্রীক দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে জেদ্দা থেকে লন্ডনে এসে ওর বড় ছেলে নাবীলের বাসায় উঠেছে। লন্ডনে থাকাকালে মামূন এখানকার সংগঠনের তারবিয়াতের দায়িত্বে ছিল। তাই সে এখানে আসলেই সংগঠনের প্রোগ্রামে সময় দিতে বাধ্য হয়। সে যখন লন্ডনে তখন আমরা ম্যানচেস্টারে। আমরা যেদিন লন্ডন পৌঁছলাম, সেদিন সে ম্যানচেস্টার গেল। ওর তিন ভাইয়ের বাড়িতে তিন রাতে খেল। আজ রাত লন্ডন ফিরে আসার কথা। ওদের পাঁচ ভাইয়ের একসাথে দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আলিয়ার বিয়েতে যদি মামূন থাকতে পারত তাহলে পাঁচ ভাই সেখানে একত্রিত হতো। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সালমানের বাসায় মামূনের সাথে আমাদের দেখা হতে পারে।

৩২৮.

ব্রিটেন সকল জাতির বাসস্থান

ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে) বা যুক্তরাজ্য গ্রেট ব্রিটেন নামেও পরিচিত। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড– এ চারটি দ্বীপপুঞ্জ মিলে দেশটি গঠিত। ইউরোপ মহাদেশের সর্বপশ্চিমে দেশটি অবস্থিত।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উন্নত অস্ত্রবলের সাহায্যে গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। ব্রিটেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেশ দখল করতে সক্ষম হয়। এমনকি বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত আমেরিকাও এককালে ব্রিটিশ কলোনি ছিল। আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ভূগোলের বইয়ে পড়েছি, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না।'। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত থাকায় সাম্রাজ্যের কোনো না কোনো এলাকায় সূর্য দৃশ্যমান ছিল।

সাম্রাজ্যের সকল দেশেই ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম ছিল। ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে যারা সরকারের সহযোগী ছিল, তারা উচ্চশিক্ষার জন্য ব্রিটেনে আসার সুযোগ পেত। শ্রমিক হিসেবেও প্রজাদেরকে ব্রিটেনে আনা হতো। এভাবে সাম্রাজ্যের সকল এলাকার বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের লোক এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করতে থাকে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে সকল এলাকা ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করার পরও ঐসব দেশ থেকে ব্রিটেনে লোক আসা অব্যাহত থাকে। যারা আগে থেকেই এ দেশে এসেছে তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত লোকদেরকে আনতে থাকে। এ দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এলাকার বাইরের অনেক দেশ থেকেই এখানে অনেক মানুষ এসেছে এবং আসা অব্যাহত রয়েছে।

দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে এত দেশের লোক হয়তো নেই। আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বহু দেশের লোক স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে; কিন্তু ব্রিটেনে যত দেশের মানুষ বসবাস করছে, এমনটা আর কোথাও নেই বলেই আমার ধারণা। লন্ডন মহানগরীতে প্রায় ৩০০ ভাষায় কথা বলা হয়। একমাত্র ভারতেরই ১২টি এবং পাকিস্তানের ৫টি ভাষার মানুষ এখানে রয়েছে। তাই ব্রিটেনকে বিশ্বের সকল জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষার লোকদের বাসস্থান বলা যায়। ব্রিটিশ সরকারও গর্বের সাথে দাবি করে যে, এ দেশে মাল্টি কালচারাল সোসাইটি রয়েছে; তাদের জনগণ বিশ্বের সকল জাতির প্রতিনিধিত্ব করে।

কেন এ দেশ ছেড়ে কেউ চলে যেতে চায় না?

প্রায় দু শতাব্দী অর্ধেক পৃথিবীকে শোষণ করে এ দেশের শাসকগণ সর্বদিক দিয়ে দেশটিকে সমৃদ্ধ করেছে; Welfare State হিসেবে দেশটিকে গড়ে তুলে দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। দেশের আদিবাসীরা এ কল্যাণরাষ্ট্রের যেসব সেবা উপভোগ করে, বিদেশ থেকে এসে যারা একসময় এ দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে তারাও ঐসব সেবার অধিকারী হয়। বিদেশিদের মধ্যে যারা এ দেশে কাজ করার অনুমতি পায়, তারা নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেও ভোটাধিকারসহ প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

তারা এমন কতক সেবা বিনামূল্যে পায়, যা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকার নাগরিকেরাও ভোগ করে না, ১. বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, ২. শিক্ষার সর্বস্তরে বিনা খরচে লেখা-পড়ার সুযোগ, ৩. আয়-রোজগারে অক্ষম ব্যক্তির জন্য স্থায়ী ভাতা। ৪. কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকারভাতার ব্যবস্থা, ৫. বাসস্থান জোগাড়ের সমস্যা দেখা দিলে কম ভাড়ায় সরকারি বাড়িতে থাকার সুযোগ, ৬. প্রবাসীদেরও যেকোনো সম্পত্তি খরিদ করে এর মালিকানা স্বত্ব ভোগের সুবিধা।

উচ্চশিক্ষা কয়েক বছর আগেও সম্পূর্ণ ফ্রি ছিল। বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাও ফ্রি-ই বলা চলে। উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়ের একটা অংশ শিক্ষার্থীকে ধার হিসেবে দেওয়া হয়, যা সে পরে তার আয় থেকে সহজ কিস্তিতে ফেরত দেবে। যদি তার আয় না থাকে তাহলে ফেরত দিতে হবে না।

এত সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কারণেই এ কল্যাণরাষ্ট্রে থাকার যারা সুযোগ পায়, তারা কেউ স্থায়ীভাবে এ দেশ থেকে যেতে চায় না। যারা উচ্চ বেতনে চাকরি করা বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এখান থেকে বিদেশে যায় তারাও এ দেশের নাগরিকত্ব সযত্নে বহাল রাখে। জন্মভূমির টানে বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে যারা বাপ-দাদার দেশে বারবার যায় তারাও এ দেশ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে যায় না।

ব্রিটেনের জনসংখ্যা

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যা পাঁচ কোটি বিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার। বর্তমানে (২০০৭) ৬ কোটিরও বেশি বলেই ধারণা। আয়তনের দিক দিয়ে এ দেশ বাংলাদেশের দ্বিগুণের কিছু কম।

২০০১ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায় যে, এ দেশের আদিবাসী সাদা রঙের ব্রিটিশ ১ কোটি ১৩ লাখ ১০ হাজার। এশিয়ান মোট জনসংখ্যা ২২ লাখ ৭৪ হাজার। এর মধ্যে ভারতীয় ১২ লাখ ৩৭ হাজার, পাকিস্তানি ৭ লাখ ১৫ হাজার, বাংলাদেশি ২ লাখ ৮১ হাজার। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন (MCB)-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারীর মতে, বর্তমানে (২০০৭) ব্রিটেনে বাংলাদেশির সংখ্যা ৪ থেকে ৫ লাখ– সাড়ে ৪ লাখের কম নয়।

এ দেশে খ্রিস্টানদের পর মুসলিমরাই ধর্মীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। (MCB) এ দেশের ইসলামী সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশাল ফেডারেশন। এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারীর ধারণা যে, ব্রিটেনে মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ লাখের কম নয়।

ধর্মীয় সহ-অবস্থান

দুনিয়ার সকল দেশেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। প্রত্যেক ধর্মের লোক যার যার ধর্ম বিনা বাধায় পালন করে। এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের বিরোধিতা করে না। ধর্ম মনের ব্যাপার। মনের উপর শক্তি প্রয়োগ করা যায় না। তাই জোর করে কাউকে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। লোভ দেখিয়ে বা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত করা সম্ভব; কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ কারণেই ধর্মে ধর্মে লড়াই হওয়া স্বাভাবিক নয়। এক ধর্মের লোক পার্থিব কোনো স্বার্থে অন্য ধর্মের লোকের সাথে লড়াই করতে পারে; কিন্তু সেটা ধর্মীয় কারণে লড়াই নয়।

শেষ নবীর যুগে আরবে পৌত্তলিক ধর্ম ছাড়াও ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ছিল। তাদের মধ্যে ধর্মীয় কারণে কোনো সংঘাত ছিল না। মুহাম্মদ (স) যে দাওয়াত পেশ করলেন, তাঁকে যদি নিছক ধর্ম মাত্র মনে করা হতো তাহলে কেউ এর বিরোধিতা করত না। আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু হিসেবে মেনে নেওয়ার দাওয়াত থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল কায়েমী স্বার্থ বুঝতে পারল যে জনগণ যদি এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, স্বার্থ সবই বিপন্ন হবে। তাই সকল ধর্মের নেতারাই একজোট হয়ে রাসূল (স)-এর বিরোধিতা করেছে।

ইসলামাতঙ্কের কারণ

ব্রিটেন ও আমেরিকাসহ সকল পাশ্চাত্য দেশেই ইসলাম যত দিন শুধু ধর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল তত দিন কেউ ইসলামের বিরোধিতা করা প্রয়োজন মনে করেনি। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব, এরপর সুদান ও আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাশ্চাত্যে ইসলামাতঙ্ক দেখা দেয়। মধ্যযুগে ইসলামী রাষ্ট্রশক্তির সাথে পাশ্চাত্যের যে দীর্ঘ যুদ্ধ চলে (পাশ্চাত্যের ইতিহাসে যা crusade নামে খ্যাত) সে ইতিহাস থেকে এ আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, এককালে ইসলামী সভ্যতা যেভাবে বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিল আবার ইসলাম একটি রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে পুনর্জীবিত হলে পাশ্চাত্য সভ্যতা অবশ্যই বিপন্ন হবে।

৭ম শতাব্দীতে মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্বে ইসলাম একটি সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করার পর সেকালের দুটো ঐতিহাসিক সভ্যতা– রোম ও পারস্য সভ্যতার সাথে স্বাভাবিক কারণেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ইসলামী সভ্যতা উক্ত উভয় সভ্যতার উপর বিজয়ী হয়ে ক্রমে

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিজয়পতাকা সমুন্নত করে। এ কারণেই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এ শঙ্কার পরিণতি

আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর Samuel P. Huntington রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ The Clash of Civilization and the Remaking of World Order ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনামলে তিনি আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে নিরাপত্তা পরিকল্পনার ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি আমেরিকান পলিটিক্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্র-পরিচালকদের নিকট তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সে দেশের নীতি-নির্ধারকদের নিকট তিনি পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তানায়ক।

উক্ত গ্রন্থে গর্বের সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এ সভ্যতা বিশ্বজনীনতা অর্জন করতে যাচ্ছে। গোটা বিশ্ব এ সভ্যতায় প্রভাবান্বিত। সেক্যুলার লিবারেল ডেমোক্রেসি আমেরিকার নেতৃত্বে বর্তমানে সর্বজনীন মর্যাদা লাভ করেছে। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র গোটা বিশ্বে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত।

সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে তিনি দুটো প্রবন্ধে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র হুমকি বলে ঘোষণা করেছেন। পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ার পথে ইসলামী সভ্যতা বিরাট প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে বলে তিনি পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনায়কদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র একটি সাময়িক সমস্যা ছিল, যা উত্থানের ৭০ বছর পরই শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংঘর্ষ বাধানোর শক্তি একমাত্র ইসলামী সভ্যতার মধ্যেই বিদ্যমান। তাই নতুন বিশ্বব্যবস্থা নির্মাতাদের ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিতে হবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে উপলক্ষ বানিয়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ প্রফেসর হান্টিংটনের দেওয়া ব্লুপ্রিন্ট বাস্তবায়নে সিরিয়াস হয়ে তৎপরতা চালাচ্ছেন। আফগানিস্তানে ইসলামী সরকারকে উৎখাত করার জন্য ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়েছে। ইরানকে দমন করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চলছে। সুদানকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। সকল মুসলিম দেশে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামবিরোধী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনে জনগণের

নির্বাচিত হামাস সরকারকে উৎখাত করে জনগণের প্রত্যাখ্যাত দলকে ক্ষমতাসীন করা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার পরওয়া না করে কতক পাশ্চাত্য দেশে মুসলিম মহিলাদের হিজাব পরিধানকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা হচ্ছে।

প্রফেসর হান্টিংটন তাঁর গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় Islam and the west শিরোনামে লেখার প্রথম বাক্যটি নিম্নরূপ :

'Some westerners, including President Bill Clinton have argued that the west does not have problems with Islam, but only with violent Islamic extremists. Fourteen hundred yeas of history demonstrate otherwise.'

অর্থাৎ, 'পাশ্চাত্যের কিছু লোক, প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ (ক্লিনটন ক্ষমতাসীন থাকাকালে লেখা) যুক্তি দেন যে, ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের কোনো বিরোধ নেই। সমস্যা শুধু চরমপন্থি আগ্রাসী ইসলামপন্থিদের সাথে। বিগত ১৪০০ বছরের ইতিহাস ভিন্ন কথাই প্রমাণ করে।'

উক্ত চ্যাপ্টারের শেষ প্যারায় তিনি লিখেছেন, 'The underlying problem for the west is not Islamic Fundamentalism. It is Islam, a different civilization whose people are convinced of the superiority of their culture and one obsessed with the inferiority of their power.'

অর্থাৎ, 'পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামী মৌলবাদ মৌলিক সমস্যা নয়। ইসলামই আসল সমস্যা, যা একটি ভিন্ন সভ্যতা, যার জনগণ তাদের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তারা ক্ষমতার দিক দিয়ে পেছনে পড়ে আছে বলে আবেগতাড়িতভাবে সচেতন।'

ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন কি সন্ত্রাস?

প্রফেসর হান্টিংটন তাঁর উক্ত গ্রন্থের এক চ্যাপ্টারে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, মুসলিম বিশ্বে আধুনিক শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী যুবকেরা পর্যন্ত ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনে নিষ্ঠাবান ও সক্রিয়।

কিন্তু তিনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, ঐ আন্দোলনকারীরা কোনো দেশে কখনো সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে?

তিনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা আরব বিশ্বে ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও হিমালয়ান উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং পশ্চিমে আলজেরিয়া ও তিউনিশিয়া, তুরস্ক ও পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন নামে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব আন্দোলন অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে

সক্রিয়। এ কথা প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই যে, এসব আন্দোলন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস অতি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা

২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনের বাস ও ট্রেনে নৃশংস বোমা হামলার জন্য অপরাধী হিসেবে চিহ্নিতদের মাঝে কতক পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত মুসলিম নামধারী যুবক থাকায় গোটা মুসলিম কমিউনিটিকে সন্ত্রাসী বলে সন্দেহ করা বা ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী মতবাদ মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বিমান হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আসলে কারা দায়ী তা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়নি। দুটি বিমান টুইন টাওয়ারে ও একটি বিমান পেন্টাগনে হামলা চালায়। সবকয়টি বিমানই আমেরিকার এবং পাইলটরাও আমেরিকান। বিমানগুলো যাত্রীবাহী। যাত্রীদের মধ্যে যারা আরব মুসলিম ছিল তাদেরকে অপরাধী হিসেবে সন্দেহ করা হয়েছে। কেউ জীবিত না থাকায় তাদের জবানবন্দি গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি।

এ দুটো মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ দাবি করেনি যে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে যে আত্মঘাতী হামলা চলছে, তা আমেরিকার রাষ্ট্রীয় মহাসন্ত্রাস ও দখলদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম।

টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার সাধ্য যদি উসামা বিন লাদেনের তথাকথিত আল কায়েদার থাকত তাহলে জর্জ বুশের হোয়াইট হাউজ কবেই ধ্বংস হয়ে যেত। জর্জ বুশ এ কথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, সাদ্দাম হুসেইনের সাথে আল কায়েদার সম্পর্ক ছিল। তেমনি টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আল কায়েদাকে দায়ী বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

একমাত্র বাংলাদেশেই হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা তথাকথিত 'জামায়াতুল মুজাহিদীন' নামে একটি সংগঠনের লোকেরা ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট একযোগে একই সময়ে দেশের সকল জেলা শহরে সন্ত্রাসী আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছিল এবং তারা দাবি করেছিল যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তারা এ কাজ করেছে। এর বিরুদ্ধে সকল ইসলামী দল, মসজিদের ইমাম ও গোটা আলেমসমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করায় সরকার ৬ জন শীর্ষ জঙ্গিনেতাকে ফাঁসি দিয়ে এবং আরো অনেককে গ্রেফতার করে এ সংগঠনকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে।

এসব জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসীদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের কোনো সংগঠন যে মোটেই জড়িত নয়, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যে মুসলিম কমিউনিটি সন্দেহের শিকার

২০০১ থেকে আমেরিকার মুসলিম কমিউনিটি এবং ২০০৫ সাল থেকে ব্রিটেনের মুসলিম কমিউনিটি নিগ্রহের শিকার হয়েছে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ঐ দুটো

সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য মুসলিম কমিউনিটিকে দায়ী করাই যথেষ্ট মনে করেনি। ইসলামকেই জঙ্গিবাদী মতবাদ বলে প্রচার করে চরম ইসলামাতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ধর্ম পালনকারী মুসলিম নারী-পুরুষের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। মসজিদ ও মাদরাসাকে মৌলবাদের আখড়া বলে সন্দেহ করে তল্লাশি হয়েছে।

সকল ইসলামী সংগঠন, মসজিদের ইমাম ও মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও 'ইসলামী সন্ত্রাস' ও 'মুসলিম সন্ত্রাসী' জাতীয় নিন্দাবাদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। সন্ত্রাসী যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক হতে পারে। কোনো সন্ত্রাসীর কারণে গোটা কমিউনিটি নিন্দনীয় হতে পারে না। সকল কমিউনিটিতেই কিছু লোক অপরাধী থাকতে পারে। এর জন্য গোটা কমিউনিটিকে দায়ী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

পাশ্চাত্যে মুসলিম কমিউনিটি ইসলামী আন্দোলনে লিপ্ত নয়

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যে ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে, তারা নিজ নিজ দেশে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। এ কারণেই তাদের তৎপরতাকে ইসলামিক মুভমেন্ট বলা হয়। এ জাতীয় কোনো আন্দোলন ইউরোপ ও আমেরিকায় নেই। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পাশ্চাত্যে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটি কোথাও ইসলামী আন্দোলনের কোনো তৎপরতা চালাচ্ছে না।

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে যারা ধার্মিক তারা প্রধানত মসজিদের ভিত্তিতেই সংগঠিত হয়। দৈনিক পাঁচ বার নামায ও শুক্রবারে জুমুআর নামায যেহেতু সমবেতভাবে আদায় করা কুরআনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেহেতু ধার্মিক মুসলিমগণ দুনিয়ার যেখানেই অবস্থান করে তারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা প্রথম কর্তব্য মনে করে। যে এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে এলাকার মুসলিম ঐ মসজিদকে কেন্দ্র করে এ চেষ্টাও করে, যাতে ঐ এলাকার কমিউনিটির মধ্যে যারা ধার্মিক নয় তারাও যেন ধার্মিক হয়ে যায়।

মুসলিম কমিউনিটি যে দেশে বাস করে সে দেশের ভিত্তিতেও সংগঠন গড়ে ওঠে। এ জাতীয় সংগঠনগুলো সাধারণত কোনো 'কান্ট্রি অব অরিজিন' থেকে আগত মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কান্ট্রি অব অরিজিনের ভাষার ভিত্তিতে তারা সংগঠিত হয়। কারণ, যারা এ দেশে জন্মগ্রহণ করেনি তারা তাদের কান্ট্রি অব অরিজিনের ভাষায় মতবিনিময় করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

এ জাতীয় সংগঠনের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। তাদের অন্তর্ভুক্ত কোনো সদস্য রাজনীতি করতে চাইলে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলে যোগদান করে। মুসলিমদের কোনো সংগঠনই রাজনীতির সাথে জড়িত নয়।

এসব সংগঠনের দু দফা কর্মসূচি রয়েছে– প্রথমত, কমিউনিটির লোকদেরকে কুরআন শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত, যারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয় তাদেরকে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী উন্নত নৈতিক চরিত্রে গড়ে তোলা।

যারা এসব সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে তারা মিথ্যা কথা বলে না, প্রতারণা করে না, অবৈধ উপায়ে উপার্জন করে না, ওয়াদা ভঙ্গ করে না, কারো অনিষ্ট করে না, মদ্যপান করে না, বিবাহ ব্যতীত যৌন সম্পর্ক রাখে না। প্রকৃতপক্ষে উন্নত চরিত্র গঠনই এসব সংগঠনের মূল লক্ষ্য। যে দেশেই এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয় সে দেশেই তা দেশে অপরাধ হ্রাসে ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতিতে বিরাট অবদান রাখে। কোনো দেশের সরকারের এ প্রশংসনীয় কর্মসূচিতে শঙ্কিত হওয়ার সামান্য কারণও থাকতে পারে না।

১৯৭৩ সালের কথা। মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (MSA) নামক একটি সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে আমার প্রথম আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ হয়। ঐ সফরে এ কথা জেনে আমি বিস্মিত হই যে, কারাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সাজাপ্রাপ্ত কালো রঙের কয়েদিদেরকে ইসলামে কনভার্ট করার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যোগ্য ইসলাম প্রচারকদেরকে আহ্বান জানানো হয়। সে সময় কয়েদিদের মধ্যে কালোদের সংখ্যাই নাকি বেশি ছিল। এর কারণ জানা গেল যে, দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ কালো কয়েদিদেরকে সামলানো অত্যন্ত দুরূহ ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ লক্ষ করল যে, ইসলাম গ্রহণের পর এ জাতীয় কয়েদিরাই অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও সভ্য হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে ওয়াশিংটনে একজন কালো মুসলমানের সাথে পরিচয় হলে আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম যে, তিনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি কারাগারে মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি'।

পাশ্চাত্যের শঙ্কা একেবারেই অমূলক

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিমদের সংগঠন সম্পর্কে প্রত্যেক দেশের কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে অবহিত করা হলে তাদের Islam-Phobia (ইসলামাতঙ্ক) দূর হতে পারে। প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত রাখা প্রয়োজন যে, মুসলিম সংগঠন ও মসজিদসমূহে কী কী কর্মসূচি পালন করা হয়।

গত জুন মাসে ম্যানচেস্টার মদীনা মসজিদে জুমুআর নামায পড়লাম। ঘোষণা দেওয়া হলো, আগামী রবিবার প্রায় সারা দিনই Open Masjid Day পালন করা হবে। এতে আপনাদের প্রতিবেশী, সহকর্মী ও পরিচিত স্থানীয় লোকদেরকে সাথে করে নিয়ে আসবেন। তারা দেখে যাক যে, আমরা মসজিদে কী করি।

এ ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে, মসজিদগুলো মুসলিম সন্ত্রাসীদের শিক্ষাকেন্দ্র। তারা আমাদের নামায দেখুক এবং বক্তব্য শুনুক। আমি জানতে পেরেছি যে, সব বয়সেরই

অনেক নারী-পুরুষ এসেছিলেন। তাদের জন্য নানা রকম খাবারেরও আয়োজন ছিল। তারা অনুষ্ঠানটি নাকি উপভোগ করেছেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

হান্টিংটনের শঙ্কাকে অমূলক মনে করি না

ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি গড়ে ওঠলে এবং ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটলে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য হুমকি হবে বলে প্রফেসর হান্টিংটন যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তা অমূলক নয়। কিন্তু ইসলামী সভ্যতার উত্থান তো কোনো পাশ্চাত্য দেশ থেকে শুরু হবে না। তা যখন হবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকেই হবে। তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃবৃন্দ তাঁরই পরামর্শে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মানবজাতির নিকট ইসলামের চেয়ে উন্নত কোনো আদর্শ থাকা দূরের কথা, ইসলামের বিকল্প কোনো আদর্শই নেই। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা ইসলামের পুনরুত্থান বিলম্বিত করতে পারেন; কিন্তু ঠেকাতে পারবেন না।

২২৯.

সভ্যতার দ্বন্দ্ব

ইতিহাসে দেখা যায়, একই সময়ে একাধিক সভ্যতা পৃথিবীতে সহ-অবস্থান করেছে। কোনো সভ্যতা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সহ-অবস্থান চলতে পারে। দ্বন্দ্বের ফলে কোনো সভ্যতা ধ্বংসও হতে পারে।

কুরআনে সূরা রূমে রোমান এম্পায়ার ও পারসিয়ান এম্পায়ারের দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (স)-এর যুগে হিজরতের পূর্বে পারস্যের আক্রমণে রোম পরাজিত হয় এবং কয়েক বছর পর রোম আবার বিজয়ী হয়ে যাবে বলে সূরার শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মদিনায় মুসলিমদের বিজয়যুগে এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়; কিন্তু এ জয়-পরাজয় সত্ত্বেও উভয় সভ্যতার অস্তিত্ব বহাল ছিল।

ইসলামী সভ্যতার উন্মেষের পর পারস্য সভ্যতার সাথে সংঘর্ষের পরিণামে জনগণ ইসলাম গ্রহণ করায় এ সভ্যতা বিলীন হয়ে যায়; কিন্তু ইসলামী সভ্যতার সাথে রোম সভ্যতার দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও রোম সাম্রাজ্য খতম হয়ে যায়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বে একাধিক সভ্যতার সহ-অবস্থান অসম্ভব নয়।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থান হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সহ-অবস্থান সম্ভব। ইসলামের পুনর্জাগরণ পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য হুমকি বলে প্রফেসর হান্টিংটনের আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তিনি গোটা বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন বলে এবং তার দেশ আমেরিকাকে বিশ্বে এ সভ্যতার নেতৃত্বে আসীন করতে আগ্রহী হওয়ার

কারণেই ইসলামী সভ্যতার উত্থানকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

সভ্যতার ভিত্তি

বিশ্বজগৎ ও মানবজীবন সম্পর্কে সকল মানুষের ধারণা এক রকম নয়। এ পৃথিবী কেমন করে সৃষ্টি হয়ে গেল? বিশাল প্রাকৃতিক জগৎ কিভাবে চলছে? চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ কিভাবে অবস্থান করছে? বস্তুজগতে কখন কিভাবে প্রাণের সঞ্চার হলো? বিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছেন কি না? থাকলে তাঁর পরিচয় কী? তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন? তিনি কী উদ্দেশ্যে বিশ্বজগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করলেন? স্রষ্টা কি মানবজীবনের জন্য কোনো বিধি-বিধান দিয়েছেন কি না? মৃত্যু কি মানবজীবনের শেষ? পরকাল থাকলে তা কেমন হবে?

এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এসবের জবাব তালাশ করতে গিয়ে দার্শনিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এর ভিত্তিতেই বিভিন্ন রকম বিশ্বাস গড়ে ওঠেছে। বিশ্বাসের পার্থক্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন রকম জীবনাচার, সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করেছে। এভাবেই ভিত্তির বিভিন্নতার কারণে সভ্যতাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি

তিনটি মতবাদকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি বলা চলে–

১. সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ)

এর সারকথা হলো, মানবজীবনের জন্য Divine Guidance (স্রষ্টার নিকট থেকে প্রেরিত বিধান)-এর কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের মেধা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের শিক্ষাই যথেষ্ট।

২. ম্যাটেরিয়েলিজম (জড়বাদ বা বস্তুবাদ)

এর সারকথা হলো, বস্তুর উর্ধ্বে কিছু নেই। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা-ই বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। স্রষ্টা, পরকাল, দোযখ-বেহেশত ইত্যাদি অবাস্তব কল্পনা মাত্র। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এর অস্তিত্ব প্রমাণিত নয় বলেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

৩. ডাইলেকটিজম (দ্বন্দ্ববাদ)

এর মর্মকথা হলো, মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে জীবনে চলার পথ বাছাই করবে এবং তা বাস্তবে চালু করবে। এতে যাকিছু ভুল ধরা পড়বে তা সংশোধন করে নেবে। এভাবে পরীক্ষা ও ভুলের (Trail and error) সংশোধনের মাধ্যমেই সভ্যতা এগিয়ে চলছে।

উপরিউক্ত তিনটি মতবাদে যারা বিশ্বাস করে তাদের নিকট মানবজীবনের জন্য কোনো স্থায়ী বিধান নেই। স্রষ্টা তাদেরকে জীবনবিধান তালাশ করার জন্য অন্ধকারে হোঁচট

খেয়ে খেয়েই চলার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তারা মানুষকে দেহসর্বস্ব বস্তু বলেই মনে করে। নৈতিক চেতনাসম্পন্ন রূহকে তারা চেনে না। কারণ, তা বস্তু নয়। তাই তারা ভোগবাদে বিশ্বাসী। দেহ যাকিছু ভোগ করতে চায়, তার ব্যবস্থা করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। নৈতিকতা বস্তু নয় বলে এর কোনো গুরুত্ব তাদের নিকট নেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসিকতা

ভোগবাদে বিশ্বাসী হলে স্বাভাবিকভাবেই এমন মানসিকতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে অন্যের স্বার্থ বিপন্ন করতে মোটেই পরওয়া করে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে যে সন্ত্রাস, হিংস্রতা ও গণহত্যা নৃশংসভাবে চালাচ্ছে তাতে মানবাধিকার, মানবতা, স্বাধীনতার অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ ভূমিকাকে সভ্যতা বলে স্বীকৃতি দান করা কি কোনোক্রমে সম্ভব? এর চেয়ে বড় বর্বরতা আর কী হতে পারে!

পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্মাতারা অতীতে আফ্রিকার কালো মানুষদেরকে জোর করে ধরে এনে তাদের সাথে দাস-দাসী হিসেবে গৃহপালিত পশুর মতো ব্যবহার করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী সাদা চামড়ার শাসকেরা স্থানীয় কালো রঙের জনগণকে কুকুরের চেয়ে অধিক মর্যাদা দেয়নি।

পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দ মানবতা ও মানবাধিকারের প্রবক্তার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অথচ তাদের আচরণ থেকে লক্ষ করা যায় যে, তারা যাদেরকে বন্ধু মনে করেন তারা ছাড়া অন্য কারো মানবাধিকারের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তারা ফিলিস্তিনে হাজার বছরের আদিবাসী আরব মুসলিমদেরকে উৎখাত করে ইসরাঈল রাষ্ট্রে জোর করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় কিবলা বাইতুল মাকদিসকে ইহুদিদের দখলে দিয়ে দিয়েছেন। এভাবে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে বিশ্বের সকল মুসলিমকে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন।

পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃবৃন্দ ইসলামকেই তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে টার্গেটে নিয়েছেন এবং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরোধী হিসেবে মুসলিম বিশ্বকে শত্রু গণ্য করেছেন। তাই যারা ইসলামের পক্ষে আন্দোলন করছে তাদের কোনো অধিকার তারা স্বীকার করেন না। তাদের মানবিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার, এমনকি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত তারা স্বীকার করেন না। তাদের আধিপত্য যারা মানতে সম্মত নয়, তাদেরকে তারা মানুষ হিসেবেই গণ্য করেন না। তাদের আদর্শ হলো Might is Right. যেহেতু তারা শক্তিমান, সেহেতু তাদের যা ইচ্ছা তা-ই করার অধিকার রয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ কি শুধু পাশ্চাত্যের জন্য?

.জাতিসংঘের প্রণীত মানবাধিকার সনদে সকল রাষ্ট্রেরই স্বাক্ষর রয়েছে। এ সত্ত্বেও শক্তিমান রাষ্ট্র যখন কোনো রাষ্ট্রের অধিকার হরণ করে তখন জাতিসংঘও তা ঠেকাতে পারে না। আমেরিকা আফগানিস্তানের উপর হামলা করার জন্য যেমন করেই হোক জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সম্মতি সংগ্রহ করে নিতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু এ সম্মতি না পেয়েও ইরাক আক্রমণ করে প্রমাণ করেছে যে, আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর যোগ্যতা রাখে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে 'লিগ অব নেশনস' গঠিত হয়েছিল। হিটলার ১৯৩৯ সালে লীগ অব নেশনসকে অগ্রাহ্য করে পোল্যান্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছেন। জর্জ বুশ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করলেন কি না কে জানে? জাতিসংঘ তো ইরাক আক্রমণ ঠেকাতে পারল না।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী সকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা, আদর্শ, বিশ্বাস ইত্যাদির স্বাধীনতা স্বীকৃত। সে হিসেবে মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতার নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। মানবজাতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামী সভ্যতাকে প্রতিহত করার হুঙ্কার দিয়েছেন প্রফেসর হান্টিংটন। এ অধিকার তিনি কোথায় পেলেন?

ইসলামকে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে যারা বিশ্বাস করেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতেই তাদের এ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামী জীবনবিধানকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করার অধিকার কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করা হচ্ছে? মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার অপচেষ্টা কোন্ সভ্যতার পরিচায়ক? এ প্রচেষ্টাকে বর্বর আখ্যা দেওয়া কি অযৌক্তিক?

ইসলামের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সবকয়টি ভিত্তিই যুক্তির কষ্টিপাথরে টিকে না বলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ একমত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ঐ মতবাদগুলো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ত্ত করেছিলাম এবং যুক্তিপূর্ণ বলে ধারণাও করেছিলাম। অধ্যাপকগণ ঐসব মতবাদের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। ইসলাম সম্পর্কে তখন আমার তেমন জ্ঞান ছিল না। পরবর্তীকালে ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা বলিষ্ঠ যুক্তির কষ্টিপাথরে যখন যাচাই করার সৌভাগ্য হলো তখন আমি বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেলাম।

জ্ঞান ও যুক্তি এবং বিবেক ও বুদ্ধি যাদেরকে ইসলামী জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে তাদেরকে শক্তির জোরে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা মুহাম্মদ (স)-এর যুগেও করা হয়েছিল; কিন্তু তাঁরা কায়েমি স্বার্থের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামও

নিজস্ব অভ্যন্তরীণ শক্তির জোরে মানুষের অন্তর জয় করেছে। আবারও এর পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতিকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান

এ কথা কেউ অস্বীকার করে না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুজগতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এত বিপুল উন্নতি করেছে যে, মনে হয় মানুষের অসাধ্য যেন আর কিছু নেই। গোটা বস্তুজগতেই যেন মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সকল প্রাকৃতিক শক্তি যেন মানুষের আয়ত্তে এসে গেছে।

কিন্তু যে মানুষের হাতে এত বস্তুগত শক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে, সে মানুষকে বস্তুসর্বস্ব মনে করার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা নৈতিক সত্তা হিসেবে মানুষের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেনি। পরিণামে বস্তুগত শক্তিকে ব্যবহারের ব্যাপারে নৈতিক মান বজায় রাখতে মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষম করে ফেলা হয়েছে। যে আগ্নেয়াস্ত্রটি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, মানুষটি যদি নৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ না হয় তাহলে সে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অবশ্যই সন্ত্রাস করবে। তাই উন্নত নৈতিক চরিত্র থেকে বঞ্চিত লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকায় তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চরম সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে।

নৈতিক সত্তা হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলার কোনো ধারণাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীদের নেই। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কৃত যেসব বস্তু ও শক্তিকে মানুষের ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব তা ব্যাপকভাবে অকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হচ্ছে। এ উন্নতির ফলে মানবজাতির শান্তি বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। অথচ মানবজীবনে অশান্তি, অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় যে বেড়েই চলেছে– এ কথা কি অস্বীকার করার উপায় আছে?

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতার প্রতি কী অবদান রেখেছে? তারা মানবজাতিকে দুটো বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে; এটমিক শক্তিকে মুহূর্তে লাখ লাখ মানুষ হত্যা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির পূর্বে মানুষ কখনো এত বড় ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাতে পারেনি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকগণ আল্লাহর দেওয়া নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী নন। পরকালে জবাবদিহি করার চেতনাও তাদের নেই। তাই তারা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পারমাণবিক শক্তির ধারক হওয়া একমাত্র তাদেরই অধিকার। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে কল্যাণের উদ্দেশ্যেও এ শক্তি ব্যবহার করার অধিকার দিতে তারা কিছুতেই সম্মত নন। এ মনোবৃত্তি কোন্ ধরনের সভ্যতার পরিচায়ক?

ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি

যে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের আতঙ্কে তারা মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে চরম হিংস্রতা অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করেন না, সে সভ্যতার ভিত্তিসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। মানবজাতি বলুক যে, কোন্ সভ্যতা মানবতা, মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা ও শালীনতার বন্ধু।

১. ইসলামী সভ্যতার প্রথম ভিত্তি হলো বিশ্বস্রষ্টার সার্বভৌমত্ব। তিনিই মানবজাতির একমাত্র বিধানদাতা। প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই তিনি বিধান দিয়েছেন। মানবদেহের যাবতীয় বিধানও তিনিই দিয়েছেন। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিধান দেননি বলে দাবি করার কোনো যুক্তি নেই। একমাত্র তাঁর দেওয়া বিধানই নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ। যুগে যুগে তিনি তাঁর বাণীবাহকের মাধ্যমে যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন, তা যদি মানুষ মেনে চলত তাহলে একই সভ্যতায় তারা গড়ে ওঠত। স্রষ্টাই মানবজাতির একমাত্র হুকুমদাতা প্রভু। তার হুকুমের বিরোধী কোনো হুকুম চালানোর অধিকার কারো নেই। এক মানুষের উপর অন্য মানুষের মনগড়া হুকুম চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।

২. দ্বিতীয় ভিত্তি হলো স্রষ্টার বাণীবাহকের নেতৃত্ব। স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিযুক্ত নেতাই মানবজাতির নেতা। সমাজে যারাই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন তারা জনগণের আসল নেতা নয়। তাদেরকে আসল নেতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁরই অনুকরণ করে নেতৃত্ব দিতে হবে। স্বেচ্ছাচারিতা করার কোনো অধিকার নেই।

৩. তৃতীয় ভিত্তি হলো পরকালে বিশ্বাস। মানুষকে যেহেতু ভালো ও মন্দের চেতনাবোধ দান করা হয়েছে, সেহেতু পৃথিবীতে কে কী করেছে সে বিষয়ে মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবিত করে প্রত্যেক মানুষকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। তাই পরকালে বিশ্বাস করে দুনিয়ার জীবনে হিসাব করে চলতে হবে। পরকালকে অবহেলা করে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করবে তাকে অনন্তকাল কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪. সকল মানুষ একই আদি পিতামাতার সন্তান। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, দেশ ইত্যাদির দিক দিয়ে যত পার্থক্যই থাকুক, মর্যাদার দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। সমান হিসেবেই তাদের সাথে আচরণ করতে হবে। এটা ইসলামী সভ্যতার চতুর্থ ভিত্তি।

৫. পঞ্চম ভিত্তি হলো নৈতিক চেতনা বা বিবেকের দাবি মেনে চলা। এ চেতনাই আসল মানুষ। কুরআনের ভাষায় এর নাম 'রূহ'। দেহ হলো মানুষের বস্তুসত্তা। দেহের কোনো নৈতিক চেতনা নেই বলে মানবদেহ অন্যান্য পশুর মতোই একটি পশু মাত্র। একমাত্র নৈতিক চেতনার কারণেই মানুষ অন্যসব পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দেহের দাবিসমূহকে 'প্রবৃত্তি' বলা হয়। কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'নাফস'। যে নৈতিকতার দাবিকে অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে সে পশুর চেয়েও অধম। পশুর তো নৈতিক চেতনাই নেই। এ চেতনা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ পশুর মতো অনৈতিক আচরণ করে সে অবশ্যই পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

উপরিউক্ত ভিত্তিসমূহ অনুযায়ী মুহাম্মদ (স)-এর যুগে যে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠেছিল তা-ই ইসলামী সভ্যতার ধারক ছিল। এ সবকয়টি ভিত্তিই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম উম্মাহ যত দিন এসব ভিত্তি মেনে চলেছে তত দিনই ইসলামী সভ্যতা মানবজাতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তারাই বিশ্বে নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।

ইসলামী সভ্যতার পতন

ইসলামী সভ্যতার নেতৃবৃন্দ ও উম্মাহর অধিকাংশ লোকের মাঝে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিসমূহ যখন দুর্বল হয়ে গেল তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান শুরু হয়েছে। তাই এ কথা সত্য যে, ইসলামী সভ্যতার পতনের জন্য মুসলিম উম্মাহই আসল দায়ী। তারা এ গুণগত পতনের কারণেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অধীনতার শিকার হয়। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করার পর তাদের নিজস্ব সভ্যতা পুনর্বহাল করতে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট অবদান রয়েছে। তারা মুসলিম দেশসমূহ দখল করার পর সেখানে তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি চালু করার উদ্দেশ্যে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা, আইন ও শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থেকে তারা যখন দখল ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়, তখন যারা ক্ষমতাসীন হয়। তারা মন-মগজ-চরিত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতারই অনুসারী। স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে যারা ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাদেরকে পাশ্চাত্যের অনুসারী ক্ষমতাসীনরাই ঠেকিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃবৃন্দ এ অনুসারীদেরকেই ক্ষমতাসীন রাখতে চান। ইরান ও সুদানের ক্ষমতাসীনরা তাদের অনুসারী নন বলেই এ দুটো দেশের সাথে বৈরী আচরণ করা হচ্ছে।

ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থান

মানুষ শান্তির কাঙ্গাল। মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী সভ্যতার পূর্বোক্ত ভিত্তিসমূহের সমর্থন মুসলিম জনগণের মাঝে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, এ পথেই সত্যিকার শান্তি আশা করা যায়। ইরান ও সুদানের মতো অন্যান্য মুসলিম দেশেও যদি আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তাহলে ইসলামী সভ্যতা এমন জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে, যার ফলে পাশ্চাত্যের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতা মানুষকে বস্তুগত যত সুযোগ-সুবিধাই দিক, কাঙ্ক্ষিত সত্যিকার সুখ-শান্তি যে দিতে পারে না সে অভিজ্ঞতা সবারই আছে। অতীতে

এককালে ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে শান্তি লাভের জন্য মানবজাতি যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তেমনিভাবে আবার জনগণ প্রভাবিত হতে পারে। এ শঙ্কা থেকেই পাশ্চাত্যে Islamo phobia সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামী সভ্যতার যুক্তিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ভিত্তিসমূহের প্রতি যাতে মানুষ আকৃষ্ট হতে না পারে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার ভিত্তিগুলোর প্রতি জনগণ যাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে, সেজন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কৌশল

স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ সম্পর্কে যে নৈতিক চেতনাবোধ রয়েছে এর ফলে সে যত মন্দ কাজই করুক, কোনটা ভালো তা সে বোঝে। তদুপরি সে নিজের মঙ্গল চায়। তাই ইসলামী সভ্যতার ৫টি ভিত্তি যে মৌলিক শিক্ষা দান করে তা নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করেই পাশ্চাত্য সভ্যতায় লালিত-পালিত মানুষও ইসলাম গ্রহণ করছে। কুরআনের জ্ঞান ও মুহাম্মদ (স)-এর উন্নত আদর্শ জীবন সম্পর্কে যারা অবগত হয়, তারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাই পাশ্চাত্যের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেছে, যাতে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং ইসলামকে জানার চেষ্টা না করে।

অতীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবে চালু হওয়ায় যেভাবে শান্তিকামী মানুষ নিজেদের কল্যাণের আশায়ই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আবার যদি বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন সফল হয় তাহলে ইসলামের বাস্তব রূপ দেখে মানবজাতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে– এ আশঙ্কায়ই ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চলছে।

মুসলিম দেশগুলোতে যাতে পাশ্চাত্যপন্থি শক্তি ক্ষমতাসীন থাকে এবং ইসলামী শক্তি যাতে কিছুতেই ক্ষমতা লাভ করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে যত রকম ষড়যন্ত্র প্রয়োজন তা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও মানবতার কোনো পরওয়া করা হচ্ছে না। নির্বাচনে তাদের পছন্দনীয় দল বিজয়ী না হলে নির্বাচিত সরকার উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলে। এ ব্যাপারে নীতি-নৈতিকতার কোনো বালাই নেই।

Integration ও Cohesion-এর দাবি

পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিম কমিউনিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তারা নিজস্ব কালচার নিয়ে পৃথক থাকে। তারা বৃহত্তর জনগণের সাথে মেশে না ও স্থানীয় কালচার গ্রহণ করে না। এ অভিযোগ থেকে বোঝা গেল, তারা চায় যে মুসলিম কমিউনিটি স্থানীয় জনগণের অংশে পরিণত হোক (integration) এবং জনগণের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাক (cohesion)।

মুসলিম কমিউনিটি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে বলেই 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে' তাদের সম্মেলনে বিষয়টি প্রধান আলোচ্য ছিল। ২০০৭ সালের ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ড. তারেক রামাদান (সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্ট এনটনিজ কলেজ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি) বলেন, 'মুসলিমগণ নিজেদের Identity (পরিচিতি) বজায় রেখে জনগণের সাথে মিলে-মিশে থাকতে পারে। তারা ব্রিটিশ মুসলিম, ব্রিটেন তাদের নিজের দেশ।'

Identity বজায় রাখা মানে নিজস্ব কালচার ত্যাগ না করা। নিজস্ব কালচার পালন করা তো সকলেরই স্বীকৃত অধিকার। ব্রিটিশ মুসলিমরা অফিসে ও কারখানায় যখন কাজ করে তখন স্থানীয় লোকদের সাথে মিলে-মিশেই তো থাকে। যেখানে বসবাস করে সেখানেই প্রতিবেশী স্থানীয় লোকের সাথে মেলামেশা করে; কিন্তু স্থানীয়দের কালচার গ্রহণ করলে তো Identity-ই থাকে না।

যেমন বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিবেশীর মতোই বসবাস করে। কর্মস্থলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, খেলাধুলায় এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে-মিশেই আছে; কিন্তু তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদি হয় না। তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আলাদা আলাদাই হয়। এতে কি integration ও cohesion নেই বলে অভিযোগ ওঠে? বাংলাদেশে যেমন হিন্দু-মুসলিম সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, ব্রিটেনেও মুসলিম কমিউনিটি স্থানীয় জনগণের মতোই নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। মুসলিম কমিউনিটি বারে গিয়ে স্থানীয়দের সাথে মদ খায় না। কারণ, এটা তাদের ধর্মে অনুমতি নেই। কালচারের পার্থক্যের কারণে মুসলিমরা আরো অনেক ব্যাপারেই স্থানীয়দের কালচারে শরীক হতে পারে না। এটা integration ও cohesion-এর বিরোধী গণ্য হওয়া উচিত নয়।

মুসলিম কমিউনিটি সন্ত্রাসী নয়

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইসলাম ও মুসলিম কমিউনিটিকে এর জন্য অভিযুক্ত করে ক্রুসেড ঘোষণা করার কারণে সে দেশে বসবাসকারী ধার্মিক মুসলিমরা নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন।

২০০৬ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে ভয়াবহ বোমা হামলায় বহু লোক হতাহত হওয়ার পর ব্রিটেনেও মুসলিম কমিউনিটি নিগৃহীত হয়। ব্রিটেনে যারা এর জন্য মুসলিমদেরকে দায়ী করে, প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সরকার তাদের সমর্থন করায় সরকার ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

এবার ২০০৭ সালের জুনের শেষদিকে লন্ডন ও গ্লাসগোতে মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্যভর্তি গাড়ি বিস্ফোরণের পূর্বেই পুলিশের নিকট ধরা পড়ায় কোনো প্রাণহানি

ঘটেনি বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় আবার মুসলিম কমিউনিটি নিগ্রহের শিকার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

বিগত ৩ জুলাই (২০০৭) ব্রিটেনের প্রায় সকল মুসলিম সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বমূলক ফেডারেশন 'মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন'-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য সকল মুসলিমের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় দৈনিক গার্ডিয়ানে যে রিপোর্ট ৪ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে কতক উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'ব্রিটেনের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম ছাতা-সংগঠন গতকাল তাদের কমিউনিটিসমূহকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বলিষ্ঠ ও যথাসম্ভব চরম ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তাদের নীতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন।'

"মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন, যার সাথে ৪০০ সংগঠন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এর নেতৃবৃন্দ এ পর্যন্তকার সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'শুধু নিন্দা জানানো মোটেই যথেষ্ট নয়।' তারা সকল মুসলিমকে পুলিশের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।"

'মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী বলেন, বর্তমান সংকট সরকার, পুলিশ ও মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে পূর্বের মতো যেন কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে না পারে। যখন ঘরে আগুন লেগেছে, তখন একে-অপরকে দোষ না দিয়ে সবাইকে আগুন নেভাতে হবে। আমাদের দেশ সংকটময় হুমকির সম্মুখীন। যারা পরিকল্পিতভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা বা পঙ্গু করতে চায় তারা আমাদের সকলের দুশমন। এ জাতীয় বর্বরতাকে সমর্থন করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সকল মুসলিমসহ আমাদের সমাজের প্রত্যেক মহলের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী।'

'ড. বারী আরো বলেন, আমাদের ইসলামী দায়িত্ব শুধু এ জাতীয় কুকর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ জানানোই নয় বরং যাতে এমন নিষ্ঠুরতা ঘটতেই না পারে, সেজন্য এর প্রতিরোধের লক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থনও জোগাতে হবে।'

'ড. বারী নতুন প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেক্যুই স্মিথ-এর প্রশংসা করে বলেন, তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কতক লোকের কার্যকলাপের জন্য কোনো একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে দায়ী করা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

দৈনিক গার্ডিয়ানের উপরিউক্ত রিপোর্ট মুসলিম কমিউনিটিকে ২০০৫ সালের মতো বিরূপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন ঐ প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে ব্রিটেনের সকল মুসলিমের আস্থা অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

৩৩০.

ব্রিটেনে আমার দীনী তৎপরতা

প্রত্যেক বছরই ব্রিটেন গেলে 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ার' এবং 'ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ' আমাকে নিয়ে প্রোগ্রাম করে। ম্যানচেস্টারে চার সপ্তাহে চারটা পুরুষদের এবং চারটা মহিলাদের তারবিয়তী প্রোগ্রাম হয়। এ কয়টি প্রোগ্রামে বাছাই করা লোকই শুধু অংশগ্রহণ করে। ফোরামের নারী-পুরুষ সকলের জন্য পৃথক একটি সমাবেশ করা হয়। তাতে একটা নতুন বিষয়ে আলোচনা করি। বিষয়টির নাম দিয়েছি 'প্রশান্ত চিত্ত মুমিনের ভাবনা' একটা সিনপসিস তৈরি করে সবাইকে দিয়ে দিলাম, যাতে আলোচনার বিষয়টা পরেও সিনপসিস থেকে সহজে স্মরণ করতে পারে।

বিষয়টির সারমর্ম হলো, মুমিনের নাফস যখন প্রশান্তি লাভ করে (নাফসে মুৎমাইন্নাহর স্তরে পৌঁছে) তখন তার মনের ভাব কেমন হয় এরই একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। হেদায়াত পাওয়ার শুকরিয়ার ভাব এ শুকরিয়ার বাস্তব ফল, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সচেতন উপলব্ধি, যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মুমিনের ভূমিকা এবং আল্লাহর সৈনিক হিসেবে মুমিনের দৃঢ় মনোভাব কেমন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি।

লন্ডনে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর দায়িত্বশীলদের সাথে দুটো প্রোগ্রাম হয়েছে। দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে'র দায়িত্বশীলদের সাথেও দুটো প্রোগ্রাম হয়েছে। একদিনের আলোচ্য বিষয় 'রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন'। সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ নামে আমার লেখা চটি বইটি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিষয়টি হারিয়ে না যায়। আরেক দিন 'প্রশান্ত চিত্ত মুমিনের ভাবনা' সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে যারা ব্রিটেনে যায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনই লন্ডনে থাকে। লন্ডনে 'বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ ফোরাম' নামে তাদেরকে সংগঠিত করা হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের এক সময়কার সভাপতি ড. আমীনুল ইসলাম মুকুল এর আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করে। তাদের সাথেও একদিন প্রোগ্রাম হলো। ৬০-৭০ জন উপস্থিত ছিল। আইনের ছাত্র অনেক। উপস্থিতদেরকে হাত উঠিয়ে জানাতে বললাম যে, কারা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সদস্য, সাথি, কর্মী বা সমর্থক। অল্প কয়েক জন এমনও পাওয়া গেল, যারা দেশে থাকাকালে শিবিরে ছিল না; কিন্তু লন্ডনে তাদের সহকর্মী হয়েছে।

তাদের সমাবেশে রাসূলগণের দায়িত্ব সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ– রাসূলগণ শুধু ধর্মনেতা ছিলেন না, তাঁরা মানবজীবনের সকল

দিক ও বিভাগেই আল্লাহর নিযুক্ত নেতা। কুরআন অনুযায়ী তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হলো মানবসমাজে কিসত বা জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের মধ্যে কার কী অধিকার রয়েছে, তা আল্লাহই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই নিরপেক্ষ। আর কেউ নিরপেক্ষ হওয়ার দাবি করতে পারে না। তাই মানুষের অধিকার নির্ধারণের যোগ্যতা আল্লাহ ছাড়া কারোই নেই। মানুষ যদি আল্লাহর দেওয়া অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায় তবেই মানবসমাজে সুবিচার চালু হতে পারে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রয়োজন। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য একদল সুসংগঠিত লোক প্রয়োজন। এমন একদল লোক জোগাড় ও তৈরি করাই রাসূলের প্রথম কাজ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানসম্পন্ন এক জামায়াত লোক তৈরি হলে তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেওয়ার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে করেছেন।

দেশে ফিরে যাওয়ার পালা

১ জুন (২০০৭) সস্ত্রীক ৩ মাসের জন্য ব্রিটেনে বেড়াতে এসেছিলাম। ৩১ আগস্ট রাতে রওয়ানা হয়ে ১ সেপ্টেম্বর বিকালে ঢাকা পৌঁছার কথা। দ্বিতীয় ছেলে আমীনের দ্বিতীয় মেয়ে আলিয়ার বিয়ের এনগেজমেন্টের কথা ইতঃপূর্বে লিখেছি। ২৪ জুলাই এনগেজমেন্ট হয়েছে। যাতে আমরা ঢাকা ফিরে আসার আগেই বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা যায়, সে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হওয়ার পর ২৫ আগস্ট বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হয়।

আমরা ছোট ছেলে সালমানের লন্ডনস্থ বাসায় ছিলাম। ২৪ তারিখ বিকালে সালমান নিজের গাড়িতে করেই ওর পরিবারসহ আমাদেরকে ম্যানচেস্টার নিয়ে গেল। বিয়ে বাড়িতে লোকজনের ভিড় হওয়ারই কথা। আমীনের শালী আগেই ইটালি থেকে এসেছে। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর নেতা আমীনের ভায়রা সাইফুল ইসলাম ঐ দিনই পৌঁছেছে। এভাবে আমীনের বাড়িতে ভিড়। তাই মুমিনের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

আমরা প্রতিবারই ঢাকা থেকে সরাসরি ম্যানচেস্টার যাই এবং ফেরার সময়ও ম্যানচেস্টার থেকে ঢাকা রওয়ানা হই। আমীনের বাড়িতেই প্রথমে উঠি এবং সে বাড়ি থেকেই ঢাকা রওয়ানা হই। বিয়ের হাঙ্গামার পর ২৮ আগস্ট আমীনের বাড়িতে গেলাম।

বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল

এক পাকিস্তানির বড় একটা রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে গাড়ি পার্কিং-এর প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। মহিলাদেরকে খাবার পরিবেশনের জন্য মহিলা কর্মীর বন্দোবস্ত করা হয়। তাই

২০০৫ সালে আমার বড় নাতি নাবীলের ওয়ালিমা ঐ রেস্টুরেন্টেই করা হয়েছে। এ বিয়ের অনুষ্ঠানও সেখানেই হলো।

বসনিয়া থেকে রবের পিতামাতা ও ভাই এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। ২৫ আগস্ট ৭টায় আসরের নামাযের পরই বিয়ে পড়ানো হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল; কিন্তু ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরযাত্রীর গাড়ি পৌঁছতে মাগরিবের সময় হয়ে যাওয়ায় নামাযের পর বিয়ে পড়ানো হয়েছে।

আমীনের বড় জামাই তার হবু ভায়রাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের গেটে শালা-শালীদের পক্ষ থেকে বখশিশ দাবি করা হবে। বরের পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় এবং মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় কনের পিতা গেটে বিলম্ব হতে দেয়নি। বরের পক্ষ থেকে ২০ পাউন্ডের এক বান্ডেল দেওয়া হলে গেট ছেড়ে দেওয়া হলো। যাদের হাতে বান্ডেল পৌঁছল তারা তাড়াহুড়ার মধ্যে বান্ডেলটা ভালো করে দেখার সময় পেল না। বান্ডেলের প্রথম নোটটা আসল পাউন্ড হলেও বাকি সবই ছিল জাল নোট। সে বিষয়ে পরে লিখছি।

বিয়ের খুতবা দেওয়া, বিয়ে পড়ানো ও দোআ করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে নিতে হলো। বরের পিতা ডক্টর কেন আন সুরুলিযকে আমার পাশেই বসালাম, যাতে একান্তে আলাপ-পরিচয় করা যায়। বিয়ের পরই তারা চলে যাবেন। কনের ইয্ন আনার জন্য তার পিতা ও দু চাচা গেল। এ ফাঁকে বরের পিতার সাথে কথা বললাম। বসনিয়া হারজেগোভিনার রাজধানী সারাজেভো ইউনিভার্সিটিতে তিনি ফিজিক্সের প্রফেসর। বয়স ৬৮ বছর। আমার বয়স ৮৫ শুনে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলেন। তাকে আমার প্রিয় ছোট আতরের শিশি উপহার দিলাম এবং পকেটে রেখে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলাম। অত্যন্ত আবেগের সাথে তিনি শিশিটি গ্রহণ করে শুকরিয়া জানালেন।

বিয়ে অনুষ্ঠান

কনের ইয্ন নিয়ে আসার পর বরকে আমার বাম পাশের চেয়ারে বসালাম। ডান পাশে বরের পিতা বসা। মাইকে মাসনূন খুতবা উচ্চারণের পর কনের পিতার হাতে বরের হাত রেখে ইজাব কবুল করালাম ইংরেজি ভাষায়। বর ড. করীম সুরুলিয ও কনে আলিয়া আযমীর বিয়ে হয়ে গেল। দোআর আগে বিয়ের অনুষ্ঠানের উপযোগী কয়েক মিনিটে দুটো কথা বললাম ইংরেজিতে। বললাম, বিয়ে মানবজাতির প্রাচীনতম সামাজিক প্রথা। বর ও কনের মধ্যে এটা একটা সামাজিক চুক্তি। ইসলামে এটা শুধু চুক্তিই নয়, ইবাদতও। মুমিনের জীবনের দীনদারী ও দুনিয়াদারী হিসেবে কোনো পৃথক বিভাগ নেই। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরিকা অনুযায়ী দুনিয়ার কাজও যদি করা হয় তা-ও দীনদারীতে পরিণত হয়। দাম্পত্য জীবনে যাকিছু করা হয় তা যদি শরীআত মোতাবেক হয় তাহলে সবই ইবাদত হিসেবে গণ্য।

১৭-

আরেকটি কথা হলো, বিয়ের উভয় পক্ষই কামনা করে যে, বিয়ে যেন স্থায়ী হয়। এ কামনার মর্ম হলো যে সবাই চায় আজীবন যেন বিয়ে টিকে থাকে। আমি মনে করি, এ স্থায়িত্ব আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে। এ দম্পতি যদি আদর্শ মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের চেষ্টা করে তাহলে উভয়েই বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। এটাই সবার কামনা হওয়া উচিত।

এ কয়টি কথা বলার পর আরবী ও ইংরেজি ভাষায় দোআ করলাম। আদরের নাতনী ও নাত-জামাইয়ের মাঝে যেন আল্লাহ তাআলা তেমনই মহব্বত সৃষ্টি করেন, যেমন হযরত আলী (রা) ও ফাতেমা (রা)-এর মাঝে করেছিলেন। তাদেরকে যেন এমনভাবে জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন, যার ফলে তারা উভয়ে বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভ করে।

অনুষ্ঠানের পর–

দোআর পর আমিই প্রথম নাত-জামাইয়ের সাথে আমাদের স্টাইলে কোলাকুলি করলাম। জামাই ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা। আমি মাত্র ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। তাই গলায় গলায় মেলাতে গিয়ে জামাইকে নত হয়ে আমার সমান হতে হলো। বরের পিতাও সমান লম্বা। তার সাথে কোলাকুলিও একইভাবে হলো। বরের একমাত্র শ্যালক রাইয়ানের সাথে বরের পিতার পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, ছেলেটির বয়স খুব কম মনে হয়, অথচ বেশ লম্বা। বললাম, ওর বয়স মাত্র ১৫ বছর। এখনই ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি হয়ে গেছে। সে দৈর্ঘ্যে উভয় দুলাভাইকেই পরাজিত করতে পারে। ওর বড় দুলাভাই ৬ ফুট লম্বা।

অনুষ্ঠানে ক্যামব্রিজ থেকে আগত বরযাত্রীদের মাঝে আলিয়ার একজন শিক্ষকও এসেছিলেন। তিনি কনভার্টেড ব্রিটিশ মুসলিম। তাঁর পূর্বের নাম ছিল Tomo Thy Winter। তাঁর মুসলিম নাম হলো আবদুল হাকীম মুরাদ। তিনি ক্যামব্রিজে ইসলামিক স্টাডিজের টিচার। তিনি কায়রোর আল-আযহারে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। দেখে মনে হলো, তিনি মধ্য বয়সী। দাড়ি রেখেছেন। দাড়ির চুল ঘন নয়, খুবই পাতলা। অনুষ্ঠানে তিনি চমৎকার বক্তব্য রাখলেন।

অন্দরমহলে যাওয়ার আগে নাত-জামাইকে পকেটে রেখে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে আতরের শিশি দিয়ে বললাম, এ শিশি আমাকে স্মরণ করাবে। আমার সাথে আপাতত আর দেখা হচ্ছে না। আগামী গ্রীষ্মে যদি আসি তাহলে দেখা হতে পারে। জামাই বলল, আগামী বছর ডিসেম্বরে বাংলাদেশে যেতে চাই। এবার ডিসেম্বরে তো বসনিয়ায় ওয়ালিমা হবে।

অন্দরমহলে

আমি অনুষ্ঠানস্থল থেকে বাসায় চলে গেলাম। আমার স্ত্রী থেকে অন্দরমহলের খবর জানলাম পরে। বর ও কনের প্রথম সাক্ষাতের অনুষ্ঠানকে রুসুমাত বলা হয়। সেখানে

কোনো পুরুষকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জামাইর সাথে তার দাদি-শাশুড়ির পরিচয় করানো হলে দাদি-শাশুড়ি বললেন, তুমি বাংলা না জানলে আমি কেমন করে তোমার সাথে কথা বলব? জামাই বাংলায় বলল, 'আপনি কেমন আছেন? আমি বাংলা জানি না।' ইংরেজিতে বলল, 'বাংলা শেখা শুরু করেছি। আগামী বছর ডিসেম্বরে বাংলাদেশে গিয়ে বাংলায় কথা বলার আশা রাখি।'

আমার স্ত্রী আমার নিকট মন্তব্য করলেন, আমাদের দেশে কনেকে বরের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় দেওয়ার সময় কনের মা-দাদিরা চোখের পানি ফেলে বিদায় দেয়। কনেও মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদেই বিদায় নেয়। আলিয়া হাসতে হাসতে জামাইর গাড়িতে গিয়ে উঠল। আমরা ওর হাসিমুখ দেখে বিদায়ের বেদনা ভুলে গেলাম।

বরের পিতামাতা এবং বর ও কনে তাদের হোটেলে চলে গেল। পরের দিন সকালে পিতামাতা বসনিয়া ফিরে গেলেন। বর ও কনে দুপুরে তিন সপ্তাহের জন্য হানিমুনের উদ্দেশ্যে তুরস্কে চলে গেল।

আমি ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আগের দিন (৩১ আগস্ট) ফোনে আলিয়ার সাথে কথা হলো। সে তখন ইস্তাম্বুলের এক হোটেলে অবস্থান করছিল। আমি জানতে চাইলাম যে, সে কতটুকু খুশি। হেসে জানাল, ভেরি হ্যাপি। আরো বলল, 'দাদা! করীম ইসলামী জ্ঞানের দিক দিয়ে এতটা অগ্রসর বলে আমার জানা ছিল না।' শুনে খুব খুশি হলাম।

ঢাকা পৌঁছলাম

৩১ আগস্ট রাত ৯টায় ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে কাতার এয়ারলাইন্স-এর বিমানে উঠলাম। সকাল ৬টায় দোহা বিমানবন্দরে পৌঁছে ৯টায় আরেক বিমানে উঠে ঢাকা রওয়ানা হলাম। বিশাল বিমান যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। বিভিন্ন আরব দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি যাত্রীই প্রায় সব।

১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায়ের পর রাত ৮টায় বাড়িতে এসে পৌঁছলাম।

বিমানে রাতে খাওয়ার পর ঘুমাতে ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। দুপুরে খাওয়ার পর খুব আশা করেছিলাম বটে, কিন্তু সারাদিনেও ঘুম এল না। যখন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন ম্যানচেস্টারে রাত একটা– এ সময়ই গত তিন মাস ঘুমের অভ্যাস হয়েছে। অথচ এখানে বিছানায় যেতে আরো ৩-৪ ঘণ্টা দেরি হবে। যখন বিছানায় ১২টায় গেলাম তখন ম্যানচেস্টারে ফজরের সময়। অর্থাৎ অভ্যাস অনুযায়ী তখন জেগে থাকার সময়। অনেক বিলম্বে ঘুম আসল। পরের দিন নাস্তার পর একটানা লম্বা ঘুম হলো। ৩-৪ দিন লেগে গেল ঘুমের রুটিন ঠিক হতে। আমার স্ত্রী ১৫ দিন পর্যন্ত ঘুম সমস্যায় ভুগতে বাধ্য হলো।

বিশ পাউন্ডের জাল নোট

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিয়ের দিন অনুষ্ঠানস্থলের গেইটে বরপক্ষ বিশ পাউন্ডের একটা বান্ডেল দিয়ে শালা-শালীর বাহিনী থেকে মুক্তি পেল। তাড়াহুড়ার মধ্যে তারা বুঝতে পারল না যে, প্রথম নোটটি ছাড়া সব নোটই জাল। একটি জাল নোট আমার স্ত্রী সাথে নিয়ে আসায় আমি দেখতে পেলাম। আসল নোটের সাথে মিলিয়ে দেখলাম। আসল নোটের কাগজের চেয়ে জাল নোটের কাগজ মজবুত। আসল নোটে যেসব কথা লেখা আছে জাল নোটেও তা-ই একই মানে লেখা রয়েছে। শুধু রানীর ফটোর জায়গায় জামাইর ফটো। এছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এমন নিখুঁতভাবে জাল নোটটি তৈরি করা হয়েছে যে, রানীর ফটো থাকলে এবং জামাইর ফটো না থাকলে বাজারে চালু হওয়ার মতো। আমার স্ত্রী নোটটি আত্মীয়-স্বজনকে দেখালে সবাই জামাইর চালাকির প্রশংসা করল। আমি তাকে ই-মেইল করে এ বিষয়ে লিখেছি, তোমার শালা-শালীদেরকে ঠকানোর সাফল্যের জন্য মোবারকবাদ জানাই। জালিয়াতির এ যোগ্যতার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে পার। ই-মেইল পেয়ে সেদিন আলিয়া ও জামাই ফোনে কথা বলল। জামাইকে বললাম, একমাত্র ইউরোপিয়ান নাতি হিসেবে আমার অন্তরে বিশেষ স্থান দখল করে আছ।

এক আকর্ষণীয় দাওয়াত পেলাম

বিয়ের মাহফিলে এমন এক ব্যক্তি আমার সামনে এসে বসলেন, যার সাথে দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনি আমাকে এত মহব্বত করেন যে, তাকে ভুলতে পারা যায় না। পাকিস্তানি ব্যবসায়ী। ম্যানচেস্টারে স্থায়ী বসতি। জামায়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন। আমার ছেলে মামূন ও আমীনের প্রিয় হাফিয ভাই। ১৯৭৩ সাল থেকে হাফিয সাহেবের নিটিং ফ্যাক্টরিতে মামূন ও আমীন কাজ শুরু করে। তাদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের কোনো সাধ্য আমার ছিল না। ওরা কাজ করেই লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল।

হাফিয সাহেব আমাকে জানালেন যে, মানবসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলিমদের অবদান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটা ডকুমেন্টারি গবেষণাকর্ম চলছে। আপনাকে ওটা দেখানোর জন্য নিয়ে যাব। একদিন পরই 'Foundation for Science, Technology and Civilization' নামে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার অফিসে পৌঁছলাম। এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর সলীম টিএস আল হোসাইনী। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ছিলেন। ইরাক থেকে এসেছেন। ইখওয়ানের গড়া লোক। আমার সাথে ১৯৭৫ সাল থেকেই পরিচয়।

গবেষণাকর্ম দেখে মুগ্ধ, পুলকিত ও উদ্বুদ্ধ

হাফিয সাহেব আমার হাতে ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১০ ইঞ্চি প্রস্থ একটা গ্রন্থ তুলে দিলেন। প্রায় দুই কেজি ওজনের গ্রন্থখানির মোটা হার্ডবোর্ডের কভারে লেখা 1001 Inventions— Muslim Heritage in Our World.

নিচে লেখা Chief Editor: Professor Salim TS Al Hussaini, Co-Editors : Elizabath Woodcock & Dr. Rabah Saoud.

মোটা কভার উল্টিয়ে প্রথমেই Forward শিরোনাম দেখলাম। এর লেখক Sir Roland Jackson Chief Executive, The British Association for the Advancement of science.

দু প্যারাবিশিষ্ট Forward-এর দ্বিতীয় প্যারায় তিনি লিখেছেন, This book is a welcome reminder that Muslims have made many important and for reaching contributions to the development of our shared scientific knowledge and our technologies.

'এ বইটি সাদরে গ্রহণযোগ্যভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মুসলিমগণ আমাদের সকলের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ সুফলদায়ক অবদান রেখেছে।'

বইটিতে ১০০১টি আবিষ্কার সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশ থেকে এমন সব ছবি দিয়ে বইটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে, যা পাঠককে সুস্পষ্ট ধারণা দান করে।

আমি মুগ্ধ হয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখতে থাকলাম; পুলকিত, উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হতে থাকলাম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে ইতঃপূর্বে লেখকের বই দেখে গৌরববোধ করেছি; কিন্তু জীবন্ত ডকুমেন্ট ইতঃপূর্বে দেখিনি।

একটু দূর থেকে প্রফেসর আল হোসাইনী একটু বিলম্বে পৌঁছে আমার সাথে উষ্ণ-আলিঙ্গন করলেন। এ বিরাট গবেষণাকর্মের জন্য তাঁকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে বললাম, এ গ্রন্থ আমি বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছি। এর বাণী কিভাবে আমার দেশের মানুষের নিকট পৌঁছানো যায়, সে বিষয়ে আমি ইনশা-আল্লাহ চেষ্টা করব। I am thrilled, imposed and excited.

এরপর তিনি বললেন, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাইড-শো করে এর প্রদর্শনী করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এত উৎসাহ প্রদর্শন করেছে, যা আমাদের আশাতীত। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের পটভূমি যে মুসলিমরা রচনা করেছে, এ বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। পাশ্চাত্যের মানুষ জ্ঞানের পাগল। এরা এতে বিজ্ঞানের উৎসের সন্ধান পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রদর্শনীটি উপভোগ করেছে। বর্তমানে এ প্রদর্শনী বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। লন্ডন ইউনিভার্সিটিতেও এ বছরই দেখানো হবে।

দেশে এসে আমি দিগন্ত ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মীর কাসেম আলীকে গ্রন্থটি দেখালাম। তিনি এটা নিয়ে গেলেন ফটোকপি করার জন্য। তিনি মনে করেন যে, এটা দিগন্ত টিভি'র মূল্যবান খোরাক হবে।

নাবা-সাফার কথা

২০০৫ সাল থেকে প্রত্যেক ব্রিটেন সফরের আলোচনায় নাবা ও সাফার কথা অবশ্যই ছিল। এবারের লেখা ৩২৭ নং কিস্তিতে নাতি-নাতনীদের আলোচনায় নাবা-সাফার উল্লেখ নেই কেন, এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় এ কিস্তিতেই লিখছি।

ছোট ছেলে সালমান আমাদের সাথে থাকায় ওদের দুই মেয়ে নাবা ও সাফা জন্ম থেকে আমাদের সাথে ছিল। ২০০৫ সালে যখন ওরা ব্রিটেনে যায় তখন তাদের বয়স ৯ ও ৪ বছর। আগেই লিখেছি, ঐ বছর সেপ্টেম্বরে আমরা যখন ঢাকা ফিরে আসি তখন বিমানবন্দরে সাফা বিষণ্ন হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে থাকল যে, ওকে ছেড়ে আমরা কেন চলে আসছি।

গত বছর গিয়ে দেখা গেল, সে শুধু ইংরেজি বলে, বাংলা ভুলে গেছে। ওর দাদু বাংলা বলতে তাগিদ দেওয়ায় ঘনিষ্ঠতা কমে গেল। এবার গিয়ে প্রথমেই ওকে নিশ্চিন্ত করা হলো যে, তোমাকে বাংলা বলতে হবে না। এবার দাদুর সঙ্গ আর ছাড়ে না। দেখা গেল, বাংলা বললে বোঝে এবং ইংরেজিতে জবাব দেয়। মাঝে মাঝে বাংলা বলার চেষ্টা করে এবং বলতে পারলে খুশি হয়।

১১ বছরের নাবা বাংলা বলতে পারলেও ইংরেজি বলা বেশি পছন্দ করে। সাফার সাথে সব সময় বাংলায় কথা বলার জন্য ওকে তাগিদ দেওয়া হলো।

অসুস্থতার দরুন সাফার দাদু বেশি সময় শুয়ে থাকে। ৬ বছরের সাফা বারবার দাদুর সাথে গলায় জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে বলতে থাকে, Only my Dadu. জিজ্ঞাসা করা হলো, নাবার দাদু কে? জবাবে বলে, আফ্রিকায়; আবার বলে, আমেরিকায়। একই কামরায় আমি বসে লেখাপড়া করি। সাফা ঘরে ঢুকে 'আসসালামু আলাইকুম দাদা' বলেই দাদুর বিছানায় Only my Dadu দাদু বলে গলায় জড়িয়ে অবিরাম ইংরেজি বলতে থাকে। লক্ষ করলাম, দু জনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করছে– একজন বাংলায়, আরেক জন ইংরেজিতে। বোঝা গেল, দু জনেই কথা বোঝে কিন্তু দু'জনে একই ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত নয়। আমি মজা করে তাদের সংলাপ শুনি। সাফার দাদু সবার ইংরেজিতে লেখা ই-মেইল পড়ে। বলার অভ্যাস হয়নি।

৩৩১.

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচনী প্রহসন

১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ আসনে বিজয়ী না হলেও ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয়ে সব দলের তুলনায় অধিক আসন লাভ করায় জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত ১৮ জন সংসদ সদস্যের সমর্থনে সরকার গঠনে সক্ষম হয়।

জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটি পরবর্তী সকল নির্বাচনে প্রয়োগ করার জন্য সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিল পেশ করে। তিন বছর চেষ্টা করেও বিএনপি সরকারকে এ বিষয়ে সম্মত করা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে উপরিউক্ত তিনটি বিরোধী দল কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে যুগপৎ আন্দোলন করতে বাধ্য হয়।

১৯৯০ সালে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবিতে যৌথভাবে আন্দোলন করে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্বৈরশাসক এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য করে। ফলে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পায়; কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাদের দলীয় সরকারের পরিচালনায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জিদ ধরেই রইল। এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার হীন উদ্দেশ্য ছাড়া কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে আইনে পরিণত করতে অসম্মত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা

দীর্ঘ এক বছর আন্দোলন করার পরও বিএনপি সরকারকে কেয়ারটেকার সরকার বিলের ব্যাপারে সম্মত করা সম্ভব হলো না। বিরোধী তিন দল আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি ১৯৯৫ সালে ঘোষণা করতে বাধ্য হলো যে, পরবর্তী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত না হলে সকল রাজনৈতিক দল ঐ নির্বাচন বর্জন করবে।

স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী যৌথভাবে বর্জনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঐ নির্বাচনে জাসদের আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে একটি 'গৃহপালিত' ক্ষুদ্র বিরোধী দল সৃষ্টি করা হয়। আর কোনো রাজনৈতিক দলই ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। স্বাভাবিক কারণেই ঐ সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি।

নির্বাচন বর্জনের হুমকি সত্ত্বেও বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একদলীয় নির্বাচনের প্রহসন করে। এ নির্বাচনে ছোট ছোট দলও অংশগ্রহণ করেনি। শুধু ফ্রিডম পার্টি ঐ নির্বাচনে অংশ নেয়।

নির্বাচনী ফলাফল

বিশ্বের কোথাও পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি নির্বাচিত হওয়ার কোনো নজির আছে বলে জানি না। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। উনপঞ্চাশটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি প্রার্থী নির্বাচিত(?) হন। এ আসনগুলোতে দায়সারা গোছের কোনো প্রার্থীও দাঁড় করানো যায়নি।

ঐ নির্বাচন এতটা গুরুত্বহীন বিবেচিত হয় যে, এর তথ্য মনে নেই। আর সব নির্বাচনের ফলাফল চর্চা হওয়ায় যেমন তথ্য জানা সহজ, ঐ তামাশার নির্বাচনের ফলাফল জোগাড় করা বেশ কঠিন মনে হলো। জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা স্নেহভাজন আলী আহমদ তার পুরনো রেকর্ড থেকে আমাকে এর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সরবরাহ করল।

বিএনপি ২৭৮টি আসনে বিজয়ী হয়, যার মধ্যে ৪৯টি আসনে অন্য কোনো প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত(?) হয়। ফ্রিডম পার্টি থেকে একজন কর্নেল আবদুর রশীদ নির্বাচিত হন। ১০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হন। আর ১১টি আসনে গোলমাল হওয়ায় ফলাফল স্থগিত থাকে।

নির্বাচনের পরিণাম

প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় ঐ নির্বাচনে জনগণের কোনো সাড়া ছিল না। শতকরা কত জন ভোটার ব্যালট পেপার ব্যবহার করেছেন এর সঠিক তথ্য জানারও উপায় নেই। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের হাজির হওয়ার কোনো তাগিদ ছিল না। একপেশে নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীরা ব্যালট বাক্স ভর্তি করার জন্য কী ব্যবস্থা করেছিলেন তাও সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়।

শেখ মুজিবের শাসনামলে যারা প্রশাসনের ও পুলিশের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই এ নির্বাচনকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তারা রীতিমতো বিদ্রোহ করেন।

নির্বাচনের পর বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এবং মন্ত্রিসভাও গঠন করেন; কিন্তু সচিবালয়ের বিদ্রোহী কর্মকর্তাগণ মন্ত্রীদেরকে সচিবালয়ে প্রবেশ করতেই দেননি। সচিবালয়ে যারা বিদ্রোহ করেননি তারা স্বাভাবিক কারণেই নিরপেক্ষ হিসেবে নীরব থাকেন।

আওয়ামী লীগ প্রেসক্লাবের সামনে বিশাল মঞ্চ সাজিয়ে 'জনতার মঞ্চ' নাম দিয়ে সচিবালয়ের বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন করে, এমনকি বিদ্রোহী কর্মকর্তাগণ বীরের মতো ঐ মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। সঙ্গত কারণেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনকারী সকল দল নির্বাচনের পরও আন্দোলন অব্যাহত রাখে এবং নবগঠিত সরকারকে পদত্যাগ করার দাবি জানাতে থাকে। এভাবে দেশ সরকারবিহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। রাজধানী আন্দোলনে মুখরিত থাকে, আর সচিবালয় স্থবির ও প্রশাসন অচল অবস্থায় পড়ে।

এ পরিস্থিতিতে বিএনপি সরকারকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। কোনো আইনগত পন্থা অবলম্বন ছাড়া পদত্যাগেরও উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করে পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পর পদত্যাগ করে। এ সরকার মাত্র ১১ দিন স্থায়ী ছিল।

যথাসময়ে মেনে নিলে–

বিএনপি'র যে জনপ্রিয়তা ছিল তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, যদি ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর নিজেদের উদ্যোগেই কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে আইনে পরিণত করত তাহলে ১৯৯৬ সালে পূর্বের নির্বাচন থেকেও অধিক সংখ্যক আসনে বিজয়ী হয়ে একাই সরকার গঠন করতে সমর্থ হতো।

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দু বছর আন্দোলন, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রহসনমূলক একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, সরকার গঠন করা সত্ত্বেও সচিবালয়ে প্রবেশ করার অক্ষমতার লজ্জা, নাকে খৎ দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে আইনে পরিণত করতে বাধ্য হওয়া, সরকার গঠনের মাত্র ১১ দিন পরই চরম অপমানজনক অবস্থায় পদত্যাগ করা ইত্যাদি নেতিবাচক ঘটনাবলির পরও ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১৬টি আসনে বিজয়ী হওয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, বিএনপি অত্যন্ত জনপ্রিয় দল।

যদি যথাসময়ে বিএনপি কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির বিষয়টি মেনে নিত তাহলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে জামায়াতকে বিবেকের দংশন নিয়ে আদর্শিক দুশমন আওয়ামী লীগের সাথে মিলে আন্দোলন করতে বাধ্য হতে হতো না এবং পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় হওয়ার মতো জাতির জন্য এত বড় দুর্ভাগ্য ঘটত না।

আওয়ামী লীগের ঐ বিজয় বাংলাদেশের জন্য আদর্শিক ও রাজনৈতিক যে মহাসংকট সৃষ্টি করেছে, এরই ফলে দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ঐ বিজয় না হলে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক আচরণ করতে বাধ্য হতো। তাই ঐ বিজয় বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংকট সৃষ্টি করেছে, যার জের থেকে উদ্ধার পাওয়া সহজ নয়।

আওয়ামী লীগের বিজয়ের কুফল

১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জনগণ ক্ষমতাসীন করেনি। ১৯৭৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জেনারেল

ওসমানীকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগ ড. কামাল হোসেনকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, পৌনে চার বছরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ শাসনে জনগণ এতটা ভীতশ্রদ্ধ হয়েছে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে তারা আওয়ামী লীগকে আর ক্ষমতায় বসাতে চায় না।

বিএনপি সরকারের একটি ভুলের কারণে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পেয়ে শেখ হাসিনা যেসব অপকর্ম আংশিক সম্পন্ন করেছেন, তা পূর্ণরূপে সমাধা করার জন্য মরিয়া হয়েই ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিতে অস্বীকার করে দেশকে বিরাট সংকটে নিপতিত করেছেন।

বিএনপি সরকারের ঐ মারাত্মক ভুলের মাশুল দেশকে কত দিন পর্যন্ত দিতে হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৩৩২.

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর অভিমত ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব পর্যালোচনা পেশ করা প্রয়োজন মনে করি।

১৯৭৫ সালের পর শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ইমেজ জনগণের নিকট এতটা ক্ষুণ্ন হয় যে, আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে আর কোনো দিন ক্ষমতাসীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান 'পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন' নামক অর্ডিন্যান্স জারি করে রাজনৈতিক দলসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ দিলে আওয়ামী লীগও পুনর্গঠিত হয়। দলের নেতৃত্ব-সংকট থাকারই কথা। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৩৯টি আসনে আওয়ামী লীগপ্রার্থী বিজয়ী হয়।

জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। তিনি তখন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, দলীয় প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান। তার পরিচালনায় নির্বাচন নিরপেক্ষ না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এত অল্প আসনে বিজয়ী হওয়া দ্বারা দলটির জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয়তো সঠিক নয়।

১৯৮১ সালের মে মাসে শেখ হাসিনাকে দলীয় নেতৃবৃন্দ দিল্লি থেকে দেশে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে দলীয় প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে দলটিকে নেতৃত্বের সংকটমুক্ত করেন। ঐ মে মাসেরই ৩০ তারিখে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করার পর

স্বাভাবিক কারণেই বিএনপি দুর্বল হয়ে পড়ে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৯৮১ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সুসংহত আওয়ামী লীগ ও দুর্বল বিএনপির মধ্যে যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাতেই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার হিসাব সঠিকভাবে পাওয়া যেতে পারে। তাই ঐ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করছি।

১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিবের কুশাসন, মুজিব হত্যার ফলে স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আনন্দে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস প্রকাশ এবং আওয়ামী লীগ মহলের পক্ষ থেকে মুজিব হত্যার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ না হওয়ায় এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিবের এককালীন গগনচুম্বি জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে।

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যার পর ১৯৮২ সালের নভেম্বরে জনগণের ভোটে যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত আইনজীবী ড. কামাল হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্র রচনায় নেতৃত্ব দেন। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকা সত্ত্বেও দলের পক্ষ থেকে যোগ্যতম ও জনপ্রিয় হিসেবেই তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

বিএনপি'র পক্ষ থেকে বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন পান। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ড. কামাল অবশ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে জেনারেল জিয়াউর রহমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিয়োগ না করলে জনগণ তাঁকে চিনতই না।

ঐ নির্বাচনের প্রচারাভিযানে দু পক্ষের বিরাট বিরাট পোস্টার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক পোস্টারে বড় আকারে শেখ মুজিবের ফটো এবং ছোট আকারে ড. কামাল হোসেনের ফটো। অপর পোস্টারে বড় আকারে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ফটো এবং ছোট আকারে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ফটো। মনে হলো, নির্বাচনে যেন দু জন নিহত নেতার মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে; এ দুই নেতার মাঝে কার জনপ্রিয়তা বেশি তা-ই যাচাই করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা আওয়ামী লীগেরই ঐতিহ্য। বিশেষ করে ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক রেকর্ড স্থাপন করেছে। পেশিশক্তি প্রয়োগ করে ভোটকেন্দ্র দখল করা, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে তাড়িয়ে দেওয়া, জালভোট দেওয়ানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। ঐ নির্বাচনের সময় বিএনপি এতটা সংগঠিত ছিল না যে, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ঐ নির্বাচনে জনগণের মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকায় এবং জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তার কারণে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সক্রিয়তা লক্ষণীয় ছিল। এর ফলে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী কৌশল হয়তো সবখানে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি।

গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে পর্যন্ত বিস্ময়কর উৎসাহ দেখা গেছে। ইতঃপূর্বেও (জীবনে যা দেখলাম, পঞ্চম খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছি, আমাদের গ্রামের রাবেয়া নামক এক বয়স্কা মহিলা, যে ছোট সময় আমাদের বাড়িতে কাজের মেয়ে ছিল– সে বলল, 'আমাদের গেরামের সব মেয়ে ধানের শীষে ভোট দিছে। দল বাইন্দা (বেঁধে) ভোট দিতে যাওনের সময় গাইতে গাইতে গেছে, হাসিনা রে হাসিনা! তোর কথায় নাছি না, তোর বাপের কথায় নাইচ্চা (নেচে), দেশ দিছি বেইচ্চা।'

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল, বিচারপতি আবদুস সাত্তার ড. কামাল থেকে ৮৫,২২,৭১৭ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। প্রমাণিত হলো যে, জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা শেখ মুজিবের চেয়ে অনেক বেশি।

পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবস্থান

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় আওয়ামী লীগ অনেক আসনেই বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; অথচ মাত্র ৭৬টি আসন পেয়েছে।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আশা করেছিল, আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিতে বিভক্ত হওয়ার ফলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হবেন; কিন্তু মাত্র ৮৮টি আসনে তারা বিজয়ী হয়েছেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আরো বেশি আসন পাবে বলে আমার আশঙ্কা ছিল। তাই বিএনপি'র সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করার জন্য আমি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করি; কিন্তু সমঝোতা না হওয়ায় আমার আশঙ্কা অব্যাহত ছিল। নির্বাচনী ফলাফল দেখে আমি অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচন করে আর ক্ষমতাসীন হতে পারবে না; জনগণের মাঝে তাদের অবস্থান যা আছে, তারা এর চেয়ে আর তেমন অগ্রসর হতে পারবে না।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিভাবে বিজয়ী হলো?

প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের নির্বাচন এ দেশের প্রথম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ নির্বাচনে জনগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলে ধারণা হয়েছে। এমন চমৎকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হওয়ায় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছেন। দলীয় সরকারের বদলে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের

পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে সকলেই উপলব্ধি করেছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর নিঃস্বার্থ সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করেছে। বিএনপি'র এ বিজয় কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিরই ফসল। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, এ পদ্ধতিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তী নির্বাচন দলনিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বিএনপি সরকারই উদ্যোগ গ্রহণ করবে; কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। প্রথমে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি বিল জমা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টিও বিল জমা দেয়; কিন্তু বিএনপি এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা করতেই অস্বীকার করে। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, এমন কথা আমাদের কল্পনায়ও ছিল না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিন দলকেই আন্দোলন করতে হলো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিএনপি যদি নিজের উদ্যোগেই কেয়ারটেকার সরকার বিল সংসদে গ্রহণ করত তাহলে তাদের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেত এবং পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করতে সক্ষম হতো।

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের উদ্যোগ আওয়ামী লীগই গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামীই আবিষ্কার করেছে। তাই এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জামায়াতের জন্য রাজনৈতিকভাবে আত্মহত্যার শামিল হতো। জাতীয় পার্টিও আন্দোলনে শরীক হলো। বড় দল হিসেবে আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই চলে গেল।

এত বড় একটা জনপ্রিয় ইস্যুতে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ময়দানে অনেক এগিয়ে গেল। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার একদলীয় নির্বাচন করে এবং নির্বাচনের পর সরকার গঠন করে ১১ দিন পরই কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় এ দলের ইমেজ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের এটাই অন্যতম প্রধান কারণ। বিএনপি'র বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো দল বিবেচ্য হয়নি।

বিজয়ের দ্বিতীয় কারণ

নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনা ওমরা করতে গিয়েছিলেন। ওমরায় যে পোশাক পরতে হয় সে পোশাকেই তিনি (হিজাবপরা অবস্থায়) দেশে ফিরে এসেছেন। বিমান থেকে অবতরণের সময় হাতে তাসবীহও ছিল। এ পোশাক ও তাসবীহ নিয়েই তিনি সারা

দেশে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অন্তত একটি বারের জন্য দেশ ও জনগণের সেবা করার সুযোগ ভিক্ষা চাইলেন।

গোটা নির্বাচনী অভিযানে পূর্ববর্তী নির্বাচনের প্রচারাভিযানের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি তার স্বভাবসুলভ অশালীন ভাষা ব্যবহার করেননি; তার আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে কোনো কথা বলেননি; মুজিব হত্যার বিচার দাবি করে একবারও বক্তব্য রাখেননি। এর ফলে জনগণ হয়তো ধারণা করেছিল যে, আওয়ামী লীগ আগের মতো আর তেমন উগ্র নয়। এখন থেকে মনে হয়, এ দল সংশোধিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সার্থক অভিনয় করে শেখ হাসিনা জনগণের মনে কিছুটা স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিজয়ের তৃতীয় কারণ

১৯৯৬ সালে যারা ভোটার ছিল তাদের মাঝে অধিকাংশই ২১ বছর আগের আওয়ামী কুশাসন ও দুর্নীতি, '৭৪ সালে দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু এবং শেখ মুজিবের রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন দেখেনি। শেখ হাসিনার কৌশলপূর্ণ প্রচারাভিযানে তাদের মনে সহানুভূতি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

১৯৯৪-এর এপ্রিল থেকে ১৯৯৬-এর মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী শরীক থাকায় জনগণের মাঝে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে যে, আওয়ামী লীগ হয়তো আগের মতো ইসলামবিরোধী নয়।

বিজয়ের চতুর্থ কারণ

জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ হিসেবে যে দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হয়েছে। ঐ নির্বাচন যে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে সরকার যে মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না, সে কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক তথ্যের উল্লেখ সেখানে রয়েছে।

ঐ প্রসঙ্গে এখানে শুধু একটি পয়েন্ট যোগ করছি। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাবেক মহাপরিচালক ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীর একটা লেখায় পড়েছিলাম যে, তিনি ১৯৯৬-এর নির্বাচনের সময় প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন, প্রায়ই গভীর রাতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রধান উপদেষ্টার সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হতেন। অবশ্য তিনি এ কথাও লিখেছেন যে, নির্বাচনে সরকার কোনো দলের পক্ষপাতিত্ব করেছে বলে আমি বলছি না। কিন্তু একটি দলের নেতৃবৃন্দ প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে প্রায়ই আসতেন সে কথা সত্য।

ইসলামী ঐক্যের প্রতীকের মর্মান্তিক তিরোধান

বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেবের আকস্মিক ইন্তিকালে ধারাবাহিক আলোচনা মুলতবি রেখে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে পারছি না।

গত ৬ অক্টোবর (২০০৭) দিবাগত শেষ রাতে ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় সাহরি খাচ্ছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা যাইনুল আবেদীন এবং মাদরাসার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল মুফতী মাওলানা আবু ইউসুফ মসজিদে হাজির হলেন। বিস্মিত ও উৎসুক হয়ে তাঁদের দিকে তাকালাম। মাওলানা যাইনুল আবেদীন বললেন, 'আপনি কি শুনেননি যে, খতীব সাহেব ইন্তিকাল করেছেন?' চমকে গেলাম, কেঁপে ওঠলাম। উচ্চৈঃস্বরে 'ইন্নালিল্লাহ' মুখ থেকে বের হলো। হতভম্ব হয়ে গেলাম।

মাওলানা সাহেব জানালেন, 'আগামীকাল বিকাল ৩টায় জাতীয় ঈদগাহে জানাযা হবে। আমি আমীরে জামায়াতের ওখান থেকে এসেছি। তিনি ই'তিকাফে থাকা সত্ত্বেও জানাযায় যাবেন।' এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। ভাবতে লাগলাম, আমি কি জানাযায় না গিয়ে পারি?

ফজরের নামাযের পর আমার সেক্রেটারি নাজমুল হককে বললাম, আমি জানাযায় যেতে চাই। মুফতি মাওলানা সাঈদ আহমদকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। তখনই ফোনে মুফতি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আমাকে জানানো হলো যে, ই'তিকাফ ভেঙে জানাযায় যাওয়া জায়েয নয়। অবুঝ মনকে সান্ত্বনা দিলাম, জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য বলে আমীরে জামায়াতের যাওয়া জরুরি। আমার সে দায়িত্ব নেই। মনের আবেগ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত শোকবাণী লিখে পত্রিকায় পাঠাতে দিলাম। দৈনিক সংগ্রাম ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় সবটুকু প্রকাশিত হয়েছে। এ লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে বলে স্থায়ীভাবে রেকর্ড করে রাখার উদ্দেশ্যে এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

শোকবাণী

"বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতীব মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হকের আকস্মিক ইন্তিকালে দীনী মহলে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল। তাঁর ইন্তিকালে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন দীনী ভাইয়ের মহব্বত থেকে বঞ্চিত হলাম।

জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে তিনি বাংলাদেশে ইসলামের প্রধান মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। প্রতিটি ইসলামী ইস্যুতে তিনি দেশবাসীকে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেন। প্রতি জুমুআর খুতবায় তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতেন।

তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ও সকল ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে একই প্লাটফর্মে সমবেত করার উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘদিন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এ উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের তিনি আজীবন চেয়ারম্যান ছিলেন।

কোনো মহান ব্যক্তির তিরোধানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা যেমন করেই হোক পূরণ করতে হয়। শূন্যস্থানে যিনি স্থলাভিষিক্ত হন তিনি মানের দিক দিয়ে সমমানের না হলেও তাকে দায়িত্ব দিতে হয়। খতীবের শূন্যস্থান কেউ পূরণ করবেন। ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিলেও শূন্যতা থাকবে না; কিন্তু ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ময়দানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো এমন কোনো ব্যক্তিত্ব জোগাড় করা সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

জাতীয় মসজিদ ও ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যক্তি অবশ্যই তালাশ করবেন; কিন্তু জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদ পূরণের জন্য তেমন কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। এ পদের জন্য এমন ব্যক্তি প্রয়োজন, যার প্রতি সকল ইসলামী মহলের আস্থা রয়েছে, যিনি ডাকলে সবাই সাড়া দেবেন এবং যিনি এমন উদারমনা যে, সকল ইসলামী মহল ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে আন্তরিক।

তিনি বলতেন, 'অমুককে বাদ দিতে হলে সকলের ঐক্য কেমন করে হতে পারে?' এ মনোভাবের ব্যক্তিত্ব পাওয়া যাবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবই তালাশ করছি। তাই এ শূন্যতা পূরণের জন্য আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা মরহুমের সকল দীনী খিদমত কবুল করুন এবং তাঁকে সাবিকূনাল মুকাররাবূনের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

খতীব সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের পটভূমি

১৯৫৪ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আতাহার আলী পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে বড়কাটারা মাদরাসায় যে বৈঠক আহ্বান করেছেন, তাতে তিনি আমাকেও দাওয়াত দিয়েছেন। ঐ বৈঠকেই সর্বপ্রথম মাওলানা উবায়দুল হকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি তখন সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা'র যুবক শিক্ষক।

১৯৫০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তাবলীগ জামায়াত নিয়ে কিশোরগঞ্জ শহীদী মসজিদে গেলাম। সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুসিয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা তাজুল ইসলাম থাকায় শহীদী মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আতাহার আলী অত্যন্ত মহব্বতের সাথে আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দু জন আপন ভায়রা ছিলেন। তাবলীগ জামায়াতের রংপুরের আমীর হিসেবে আমি বক্তব্য পেশ করি।

মাওলানা আতাহার আলীর মতো মুরব্বিস্থানীয় ব্যক্তি এমন উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন যে, আমি তাঁর স্নেহধন্য বলে অনুভব করলাম। সে পরিচয় সূত্রেই তিনি নেজামে ইসলাম পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে আহূত বৈঠকে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন।

আমার আপন ভগ্নিপতি মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। মাঝে মাঝে মাদরাসায় গেলে শিক্ষকদের মিলনায়তনে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সাথেও আমার দেখা হতো। বায়তুল মুকাররমের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন উপলক্ষে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে দেখে আমি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাই।

সকল ইসলামী মহলকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করে বাংলাদেশে ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিশ বছর চেষ্টা করেও সফল হতে পারলাম না। এটা আমার জীবনের বিরাট স্বপ্ন ছিল। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতায় যখন আমি হতাশ, তখন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মধ্যে আশার আলো দেখে সান্ত্বনা বোধ করলাম। 'বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস' নামক বইটিতে এসব কথা বিস্তারিত লিখেছি।

খতীব সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের ধরন

গত কয়েক বছরে তাঁর সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমন মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে যে, টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। রমযানের প্রথম রাতে সর্বপ্রথম তাঁর সাথেই 'রমযান মুবারক' এবং ঈদের রাতে প্রথম তাঁর সাথে 'ঈদ মুবারক' বিনিময় হয়। বিদেশে যাওয়ার পূর্বে দোআ চেয়ে বিদায় নেই। আবার ফিরে এসে কুশল বিনিময় করি। প্রতি বছর ই'তিকাফে বসার আগে দোআ চেয়ে ফোন করি। এবারও ১৯ রমযান ফোন করেছি। ফোনে সালামের জবাব দিয়েই বললেন, 'আমারই আগে ফোন করা উচিত ছিল, আপনি আমার জন্য আতর পাঠালেন এবং আপনার অনুবাদ করা কুরআন পাঠালেন। ভুলে ফোন করা হয়নি।'

এবার (অক্টোবর '০৭) ঈদের রাতে বাসায় ফোন করে তাঁর ছোট ছেলে মাওলানা ইকরামুল হককে পেলাম। যাঁর সাথে ঈদ মুবারক করার আশা ছিল, তাঁকে না পাওয়ার বেদনায় কান্না এসে গেল। জানাযায় যেতে না পারার দুঃখ প্রকাশ করলাম। জানালেন যে, বিদেশে থাকায় তিনিও জানাযায় হাজির হতে পারেননি।

পকেটে রেখে ব্যবহার করার জন্য আমি তাঁকে খুব সুন্দর ছোট এক শিশি আতর দিয়েছিলাম; আতর শেষ হলে আবার ছোট শিশিতে ভরার জন্য বড় শিশিভর্তি আতর দিয়েছিলাম। আমার পাঠানো আতরে ভেজাল না থাকায় তিনি খুব পছন্দ করতেন। আতর শেষ হলে জানাতেন। আমি আবার পাঠাতাম। গত এপ্রিল মাসে সৌদি আরব

১৮-

থেকে ফিরে এসে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমার জন্য আতর নিয়ে এসেছেন।

বয়সে তিনি আমার চেয়ে ৬ বছরের ছোট ছিলেন; কিন্তু অনেক কারণেই তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতাম। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করতেন বলে অনুভব করতাম। এ মহব্বতের মানুষটিকে আর দেখতে পাব না, সে কথা মনে হলে অন্তরে গভীর বেদনা বোধ করি।

আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দিয়ে আছি যে, তাঁর স্থানে এমন একজন যেন খতীব হিসেবে নিয়োগ পান, যিনি তাঁর মতো আন্তরিকতার সাথে ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা চালাবেন। আল্লাহর নিকট কাতরভাবে আবেদন জানাই, যেন মরহুম খতীব সাহেবের রূহ আ'লা ইল্লীনে মর্যাদার আসন লাভ করে।

৩৩৩.

পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশমালা

১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর বিপর্যয়কর ফলাফলের পর্যালোচনা করে রিপোর্ট ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা পেশ করার উদ্দেশ্যে মজলিসে শূরা যে কমিটি গঠন করেছে, সে কমিটির রিপোর্ট ৩৩২ নং কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে উক্ত কমিটির পেশকৃত সুপারিশমালা সম্পর্কে আলোচনা করছি। দীর্ঘ সুপারিশমালার প্রায় সবই জামায়াতের সাংগঠনিক সংস্কার, জনশক্তির আদর্শিক ও নৈতিক মানোন্নয়ন, দাওয়াত সম্প্রসারণ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এখানে ঐসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, যা সর্বস্তরের জনগণের জানা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার না হওয়া

জামায়াতে ইসলামী শুধু একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, জামায়াত এমন একটি আদর্শিক আন্দোলন, যা মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেওয়া একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধানকে বাস্তবায়িত করতে চায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত ভালো ফল করে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার লোভ সংবরণ করেছে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে মন্দ ফল হয়েছে বলে হতাশাগ্রস্ত হয়নি; ধীর মস্তিষ্কে পর্যালোচনা করে নির্বাচনে বিপর্যয়ের কারণ নির্ণয় করেছে এবং আবেগতাড়িত না হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সুপারিশ বিবেচনা করেছে।

জামায়াতে ইসলামীকে তার নিজস্ব আদর্শ, নৈতিক ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে আধিপত্যবাদবিরোধী মুসলিম জনতার আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক,

আন্তর্জাতিক এবং ইসলামী ইস্যুতে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

অতীতের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে সকল পরিস্থিতিতে জামায়াতের স্থায়ী চার দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভারসাম্য রক্ষা করে চলবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে রকমই থাকুক সকল অবস্থায়ই জামায়াতের প্রথম দফা দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ২য় দফা সংগঠন ও তারবিয়াতের কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথেই পালন করা হবে। আদর্শিক আন্দোলন করা হবে। আদর্শিক আন্দোলন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিসর্বস্ব কর্মতৎপরতায় বিলীন হয়ে যেতে পারে না। তৃতীয় দফা সমাজ-সংস্কার ও সমাজসেবার কর্মসূচিও সমান তালে চলতে থাকবে। চতুর্থ দফা হলো রাজনৈতিক দফা। কোনো সময় কিছু দিনের জন্য রাজনৈতিক দফার তৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য দফা কখনো অবহেলিত থাকতে দেওয়া হবে না।

মহিলা-অঙ্গনে দাওয়াতের ব্যাপক সম্প্রসারণ

আমাদের সাধারণ শিক্ষাধারায় নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের সুযোগ না থাকায় শিক্ষিতসমাজ যোগ্যতা অর্জন করলেও সততার গুণে সজ্জিত হতে পারে না। অবশ্য পারিবারিক পরিবেশে ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোক ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা করে উন্নত নৈতিক চরিত্রে সমৃদ্ধ হন।

মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে পুরুষদের মধ্যে বিরাটসংখ্যক আলেম তৈরি হওয়ার ফলে তাদের প্রচেষ্টায় পুরুষ মহলে জনগণের মাঝে ইসলামের ধারণা কিছুটা হলেও সৃষ্টি হয়; কিন্তু মহিলাদের মাঝে মাদরাসা শিক্ষা সচরাচর চালু না থাকায় মহিলা মহলে ইসলামের ধারণা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা গড়ে ওঠেছেন। এ শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরশ থাকায় তাদের মাঝে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি। স্বভাবগতভাবেই মহিলারা পুরুষের তুলনায় অধিক ধর্মপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিতা মহিলাগণ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে মহিলা মহলে ইসলামের আলো বিতরণ করতে পারছেন না।

উপরিউক্ত কারণে ইসলামবিরোধী মহলের অপপ্রচারে শিক্ষিতা মহিলাদের বিভ্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি অপপ্রচার করার সাহস না পেলেও ইসলামী আন্দোলন বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অপপ্রচার চালায়, যার ফলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে মহিলা মহল আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে। ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু হলে নাকি মহিলারা ঘরে বন্দী হয়ে যাবে এবং মহিলাদের উন্নতি ও প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতার

প্রসারের সাথে সাথে উপরিউক্ত অপপ্রচারে মহিলাদের বিভ্রান্ত হওয়ারই কথা।

আশার কথা যে, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপিকা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পরিবেশন করছেন, যার ফলে নারীসমাজের উন্নয়নে ইসলামের অবদান সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে যে ইসলামী জ্ঞানচর্চা অগ্রসর হচ্ছে এটাও ইসলামী আন্দোলনেরই অবদান।

মহিলাদের মাঝে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে ইসলাম সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি সংক্রমিত হচ্ছে, এর প্রতিকার পুরুষদের দ্বারা সম্ভব নয়। শিক্ষিতা মহিলাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধিই একমাত্র প্রতিকার। ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ইসলামী আন্দোলনকে এ ময়দানে তৎপরতা বৃদ্ধি করার সুপারিশের তাৎপর্য এটাই।

যুবমহলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি

আল্লাহর রহমতে শিক্ষিত যুবকদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানচর্চা এবং চরিত্র গঠনের যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা প্রধানত ইসলামী ছাত্রশিবিরেরই অবদান। ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংস্পর্শে আশার সুযোগ যারা পেয়েছে তাদের মন, মগজ ও চরিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যতটুকু আলোকিত হয় তার রেশ কর্মজীবনেও অব্যাহত থাকে। তাদের মাঝে যারা কর্মজীবনেও ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকে তারা তো অব্যাহতভাবেই নিজের মান বৃদ্ধি করতে থাকে। যারা কোনো সমস্যার কারণে সক্রিয় থাকে না তারাও দীনের চেতনা হারায় না। তাদেরকে সক্রিয় করার প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। তারা ইসলামী আন্দোলনেরই অর্জিত পুঁজি। এ পুঁজিকে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেওয়া যাবে না।

শিক্ষিত যুবমহলে ইসলামী শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনকে ইসলামী ছাত্রশিবির ও ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক সহযোগিতা দিতে হবে। ছাত্রসমাজই দেশের আশা-ভরসার স্থল। ছাত্রজীবনই আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সময়। যারা এ সময় ইসলামী মন, মগজ ও চরিত্রে গড়ে ওঠবে তারাই কর্মজীবনে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। তাই পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশমালায় ছাত্রসমাজের মাঝে লোক তৈরির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে সক্রিয় জনমত গড়ে তোলা

বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৮৫ জন মুসলিম। তারা আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, মুহাম্মদ (স)-কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সঙ্গত কারণেই তারা এ বিশ্বাস, মহব্বত ও ভক্তির দাবি পূরণে অক্ষম। কারণ, তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে গড়ে তোলার কোনো ব্যবস্থাই নেই। আল্লাহ, রাসূল ও

কুরআনের প্রতি তাদের যে আবেগ রয়েছে তা বিরাট পুঁজি। তাদের নিকট ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা চালিয়ে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব। তাদের মন-মগজে এ কথা পৌঁছাতে হবে যে–

আল্লাহ তাআলাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি কিভাবে কায়েম হতে পারে, সে বিষয়ে একমাত্র তিনিই সঠিক ধারণা রাখেন। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি অসভ্য ও বর্বর সমাজে পাঠালেন। তিনি রাসূল (স)-এর নিকট কুরআন নাযিল করলেন। রাসূল (স) কুরআনের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে ঐ অসভ্য সমাজকে সভ্যতার উস্তাদে পরিণত করলেন। রাসূল (স) যে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানে সকল মানুষ এমনকি অমুসলিম জনগণও পরম সুখ-শান্তি ভোগ করেছে। এ কথা মহাসত্য হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত। কুরআনের আইন ও শিক্ষা প্রয়োগ করেই এত বড় সমাজ-বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হয়েছে। সে কুরআন এখনও বিশুদ্ধ অবস্থায়ই আছে। যারা কুরআন বোঝে ও মেনে চলে তাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিলে আবার ঐ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করা সম্ভব।

১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমাদের এ দেশ ইংরেজদের দখলে ছিল। এর আগে ১২০৩ সাল থেকে সাড়ে পাঁচ শ' বছর কুরআনের আইন এ দেশে চালু ছিল। ইংরেজ শাসন থেকে আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হলেও কুরআনের আইন আর চালু হয়নি। ইংরেজরা নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে এ দেশে তাদের মন-মগজ-চরিত্রের লোক তৈরি করে তাদের হাতেই দেশের ক্ষমতা দিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ঐ জাতীয় লোকই দেশ পরিচালনা করছে। তারা যে শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে ওঠেছে সে ব্যবস্থা এখনও চালু আছে। তাই এ শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তারা কুরআন বোঝেও না, তাদের জীবনও কুরআন অনুযায়ী গঠিত নয়। তাই তাদের দ্বারা কুরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে ১৩ বছরে এমন একদল লোক তৈরি করলেন, যারা কুরআন বুঝতেন ও জীবনে তা মেনে চলতেন। এ তৈরী লোকদেরকে নিয়েই তিনি ইসলামী সরকার গঠন করেছেন এবং কুরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন। সাহাবায়ে কিরাম কোনো মাদরাসায় পড়ে ইসলাম শেখেননি। রাসূল (স)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার ফলে তাঁরা ঈমান, ইলম ও আমলের বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে রাসূল (স)-এর পরিচালিত ঐ ইসলামী আন্দোলনের কর্মনীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছর ধরে লোক তৈরি হচ্ছে। এ আন্দোলনে আধুনিক শিক্ষিত ও মাদরাসা শিক্ষিত লোক একসাথে মিলে নিজেদেরকে গড়ে তুলছেন। আধুনিক শিক্ষিতদের যোগ্যতার সাথে দীনী যোগ্যতা এবং মাদরাসা শিক্ষিতদের যোগ্যতার সাথে দুনিয়াবী

যোগ্যতা যোগ হচ্ছে। তাদের জন্য এমন সুপরিকল্পিত ট্রেনিং ব্যবস্থা করা হয় যে, আধুনিক শিক্ষিতরাও দীনের ব্যাপারে আলেমদের সাথে মতবিনিময় করতে সক্ষম হন এবং আলেমগণও আধুনিক শিক্ষিতদের জন্য তাদের উপযোগী ভাষায় দীনের দাওয়াত পেশ করার যোগ্য হন।

উভয় দিক দিয়ে এমন যোগ্য লোক তৈরি হচ্ছে যে, তাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা সত্যিকার ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এ জাতীয় সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন কায়েম না হলে জনগণের ভাগ্য কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংকের সিলভার জুবিলি

এ বছর (২০০৭) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিলভার জুবিলি (রজত জয়ন্তী) পালন করা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক সাফল্যের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব পালনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হলো যে, সুদবিহীন অর্থনীতি শুধু আদর্শিক কল্পনা নয়; বাস্তব সত্য।

১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উচ্চশিক্ষিত মহলে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে তাদের নিকট প্রধানত একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম। তারা বলতেন, 'ইসলামে সুদ হারাম। আধুনিক যুগে ব্যাংক ছাড়া অর্থনীতি অচল, আর সুদ ছাড়া ব্যাংক চলে না। আপনারা ইসলামী রাষ্ট্র কেমন করে চালাবেন?

তাদের প্রশ্নের মূল কথা হলো, সুদ হারাম হওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিয়ে সুদের ভিত্তিতেই চলতে বাধ্য হবে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র অবাস্তব।

বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয়। এখানে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাই চালু আছে। এ সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং সফলভাবে পরিচালনা করে এ কথা প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা হলে ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হওয়া অত্যন্ত সহজ হবে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক চালু হয়েছে; এমনকি কয়েকটি সুদী ব্যাংকও ইসলামী কাউন্টার খুলেছে।

এবার (২০০৭) লন্ডনেও দেখে এলাম, ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিকটেই 'ইসলামিক ব্যাংক অব ব্রিটেন' নামে বিরাট এক সাইনবোর্ড। সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা কয়েকটি ইউরোপীয় দেশেও চালু হয়েছে। তাই সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা অবাস্তব বলার ক্ষমতা আর কারো নেই। ইসলামপন্থি কোনো ব্যক্তিকে আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নের

সম্মুখীন হতে হয় না। ইসলামী জীবনবিধান আল্লাহর রচিত। এর কোনো একটি বিধানকেও অবাস্তব প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার

এ বছর (২০০৭) ২১ থেকে ২৩ এপ্রিল ঢাকাস্থ সোনার গাঁ হোটেলে তিন দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'দারিদ্র্য বিমোচনে বিকল্প : যাকাত, আওকাফ ও ক্ষুদ্র ঋণ।'

৪টি প্রতিষ্ঠান এ সেমিনারের আয়োজন করে। যেসব প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো–

১. ঢাকাস্থ ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো।

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.।

৩. জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

৪. ঢাকাস্থ প্রাইম ইসলামী ব্যাংক।

দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দেশি-বিদেশি অগণিত এনজিও জনগণকে সুদের জালে আবদ্ধ করে ফেলেছে; কিন্তু জনগণ এনজিও'র মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে কি না, এটাই বিরাট প্রশ্ন। এনজিও থেকে স্বাধীন হয়ে সচ্ছল হতে সক্ষম না হলে, আজীবন যদি এনজিওদেরকে সুদের জোগান দিতে বাধ্য হতে হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে মানুষ স্থায়ীভাবে দরিদ্রই থেকে গেল। দারিদ্র্য বিমোচনের বদলে জনগণকে চিরকাল দরিদ্র রেখে এনজিওগুলোর সুদের ব্যবসায়ের পসরা হচ্ছে। জনগণকে শোষণ করে এনজিও কর্মকর্তাদের বিলাসী জীবন যাপনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করাকে কি 'দারিদ্র্য বিমোচন' বলে আখ্যায়িত করা যায়? এ বিষয়ে জরিপ চালানো প্রয়োজন যে, এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে শতকরা কত জন তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে।

এ পটভূমিতেই এনজিওদের বিকল্প হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের এমন কোনো পন্থা আছে কি না, যার মাধ্যমে সত্যিকারভাবে দরিদ্র জনগণকে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়েই উক্ত সেমিনারে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে যাকাত, আওকাফ ও সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ সত্যিকারভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম। জনগণকে সুদের জাল থেকে মুক্তির এটাই বিকল্প ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার মাধ্যমেই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

সেমিনারে আগত অতিথিবক্তাদের পরিচয়

সোনার গাঁ হোটেলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অতিথিবক্তা হিসেবে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে প্রথমে এমন দু জনের পরিচয় উল্লেখ করছি, যাঁরা মুসলিম বিশ্বে

ইসলামী অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। ১৯৭২ থেকে '৭৮ পর্যন্ত আমি যখন বাধ্য হয়ে নির্বাসনজীবন যাপন করি, তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে তাঁদেরকে অতিথিবক্তা হিসেবে দেখেছি। তাঁদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠেছে। যার ফলে তাঁরা সেমিনার শেষে দু জনই আমার বাড়িতে মেহেরবানী করে এসে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন মনে করেছেন।

১. তাঁদের একজন হলেন ড. মনযের কাহফ। তাঁর জন্ম ইরাকে। তিনি সৌদি আরবের ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু দিন অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। এরপর দীর্ঘ পনেরো বছর জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কর্মরত থেকে বর্তমানে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি সেখানে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন, যেখানে বিভিন্ন পেশাজীবীদেরকে তিনি ইসলামী ট্রেনিং দেন।

২. অপরজন হলেন ড. মুহাম্মদ ওমর চাপড়া। তিনি পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছেন। ছাত্রজীবনে করাচিতে ইসলামী জমিয়তে তালাবার নেতা ছিলেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি সৌদি মনিটরি এজেন্সির এডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এডভাইজার।

এছাড়া আরো দু জন অতিথিবক্তা হলেন–

৩. ড. কবীর হাসান। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিন্সে অর্থনীতির প্রফেসর। তাঁর বাড়ি নবীনগর, বি.বাড়িয়া। কুমিল্লা বোর্ডে এসএসসিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তখন থেকে তিনি আমার পরিচিত। দেশে এলেই আমার সাথে দেখা করতে আসেন।

৪. ড. হাবীব আহমদ। তিনিও বাংলাদেশি। জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়। আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

সেমিনারে তাঁরা দারিদ্র্য বিমোচনের যে বিকল্প পন্থা দেখালেন তা বাস্তবায়িত করার মতো সরকার বাংলাদেশে কবে কায়েম হবে তা আল্লাহই জানেন।

ইসলামী আন্দোলন আমাকে কী দিয়েছে?

আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপনের জযবা নিয়ে মাঝে মাঝে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি, 'ইসলামী আন্দোলন আমাকে কী দিয়েছে?'

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লার (৪ মাস) জন্য বের হলাম। নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে ঐ সময় বড় বড় সরকারি চাকরি সহজলভ্য ছিল। তাবলীগ জামায়াত আমার মাঝে মিশনারি জযবা সৃষ্টি করল। সিদ্ধান্ত নিলাম শিক্ষকতা করব, যাতে নবপ্রজন্মকে

ইসলামী চরিত্রে গড়ে তোলা যায়। ইসলামকে তখন মিশন হিসেবেই জানতে পেরেছি।

দেশের প্রধান ৪টি কলেজে দরখাস্ত পাঠালাম। বিনা ইন্টারভিউতেই রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে নিয়োগপত্র পেলাম। ১৯৫০ সালেই কলেজে যোগদান করলাম। তাবলীগ জামায়াতের শিক্ষা অনুযায়ী ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা দিতে থাকলাম। যোহরের নামাযের বিরতির সময় নিয়মিত এ শিক্ষাদান চলতে থাকল।

১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেলাম। জানতে পারলাম, ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক সর্বাত্মক আন্দোলন। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য ব্যাপকভাবে পড়তে লাগলাম। ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার মন-মগজ দখল করে নিল। আন্দোলনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আন্দোলন আমাকে কলেজের শিক্ষকতার পেশা থেকে বের করে জনগণের বিশাল ময়দানে নিক্ষেপ করল।

যদি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের সুযোগ না পেতাম তাহলে একসময় হয়তো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে অবসর গ্রহণ করতাম। আর আজীবন তাবলীগ জামায়াতের ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারেই জীবনটা কেটে যেত। ইসলামী আন্দোলন আমাকে যে মহাসম্পদ দিয়েছে তা থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যেতাম। ঐ মহাসম্পদের বিবরণ দিচ্ছি, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ ইসলামী আন্দোলনের ফযীলত সম্পর্কে অবহিত হয়ে আন্দোলনে অব্যাহতভাবে সক্রিয় থাকার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন।

১. আমার প্রতি ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো কুরআন অধ্যয়নের প্রেরণা দান। এর আগে সওয়াবের জন্য কুরআন তিলাওয়াতের তাকীদ অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছি। ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হতে হলে আন্দোলনের 'গাইড বুক' হিসেবে কুরআনকে অধ্যয়ন করতেই হবে– এ কথা আগে শুনিনি। কুরআন যাঁর উপর নাযিল হয়েছে তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনের গাইড বুকই হলো কুরআন। এত সিরিয়াসলি কুরআন বোঝার চেষ্টা ইতঃপূর্বে কখনো করিনি। আন্দোলনের জযবা নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করার এক পর্যায়ে কুরআন অধ্যয়ন নেশায় পরিণত হলো। কুরআন বোঝার মধ্যে যে এমন স্বাদ ও তৃপ্তি, তা এর আগে উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়নি।

   এ উপলব্ধি থেকেই আমি অতি সহজ বাংলায় কুরআনের বাণীকে জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদী (র)-এর তরজমায়ে কুরআন মাজীদের অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছি এবং তাফহীমুল কুরআনের শেষ পাঁচ পারার সার-সংক্ষেপ রচনা করা প্রয়োজন মনে করেছি।

২. এ আন্দোলন আমাকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, যারা রাসূল (স)-এর উপর ঈমান আনে, তাদের উপরও ঐ দায়িত্ব রয়েছে, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে। ঐ দায়িত্ব হলো দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। রাসূল (স)-এর সময় যারা তাঁর সাথে নামায আদায় করেছে অথচ ঐ দায়িত্ব পালনে শরীক হয়নি তাদেরকে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মুমিনের জীবনের উদ্দেশ্যই হলো দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। বেঁচে থাকার জন্য মুমিনকে দুনিয়ায় অনেক কিছুই করতে হয়। খাওয়া-পরার জন্য রুজি-রোজগার করতে হয়। বিয়ে-শাদি করে সংসার পাততে হয়। এসব করতে হয় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। এসবের কোনো একটিই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হলো দীনের দাবি পূরণের জন্য জান ও মাল খরচ করে জিহাদ করা।

যারা নামায-রোযা করেন কিন্তু দীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন মনে করেন না, তারা ইসলামের শুধু ধর্মীয় দিকটুকুই পালন করেন। তারা ইসলামকে দীন হিসেবে বোঝেন না, শুধু ধর্ম মনে করেন। অথচ দীন অর্থ ধর্ম নয়; 'দীন ইসলাম' মানে ইসলামী জীবনবিধান।

৩. পূর্বে জানতাম, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই। ইসলামী আন্দোলনে এসে জানলাম, ইলাহ মানে 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'। আল্লাহর হুকুমের বিরোধী অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না। আল্লাহ শুধু উপাস্য নন; শুধু উপাসনার সময় তিনি প্রভু নন। সব সময় সব অবস্থায় তিনি হুকুমকর্তা প্রভু এবং মুমিন সব অবস্থায় আল্লাহর গোলাম।

পূর্বে মনে করতাম, মুহাম্মদ (স) একজন ধর্মনেতা। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁকে নেতা মানলেই চলে। পরে জানলাম, আল্লাহ যেমন সব ব্যাপারেই প্রভু, মুহাম্মদ (স) ও সর্বক্ষেত্রে মুমিনের নেতা। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী পালন করতে হবে।

আগে জানতাম, কুরআন ধর্মগ্রন্থ। সাওয়াবের জন্য তিলাওয়াত করতে হয়। পরে জানলাম, কুরআন বুঝতে হবে। কারণ, দুনিয়ার জীবনে মানুষকে কিভাবে চলতে হবে তা আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য আইন জরুরি। ইসলামী আন্দোলনে এসে জানলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আইন রচনার অধিকার অন্য কারো নেই। আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন মেনে নিলে শিরক হয়। আল্লাহর আইনের অধীনে মানুষের অতিরিক্ত আইন রচনার ইখতিয়ার আছে। মানবরচিত প্রচলিত আইনের বদলে যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে তারা মানবরচিত আইন মানে না বলে প্রমাণ হয়; কিন্তু যারা এ চেষ্টা করে না তারা মানবরচিত আইন মেনে নিয়েছে বলে প্রমাণ হয়। এটাও যে শিরকের মধ্যে গণ্য, এ কথা আগে জানতাম না।

আয়াতুল কুরসীর পর বলা হয়েছে, ঈমান আনার আগে তাগূতের কাফির হতে হবে। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথাটির অর্থ জানা কত জরুরি। আন্দোলনে এসে এ বিষয়ে যা জেনেছি তা কুরআনের প্রচলিত অনুবাদে নেই। যেসব শক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে চাপ দেয় বা লোভ দেখায় সেসবকেই তাগূত বলা হয়।

ইসলামী আন্দোলনে আসার সৌভাগ্য না হলে আল্লাহর মহান দীন সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যেতাম। ইসলামী আন্দোলন আমাকে দীন ইসলাম সম্পর্কে যে সঠিক ধারণা দিয়েছে তা প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করে ছোট-বড় অনেক বই লিখেছি, যা আন্দোলনে না আসলে কিছুতেই সম্ভব হতো না।

৩৩৪.

নির্বাচন কমিশনের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ

২৫ অক্টোবর (২০০৭) নির্বাচন কমিশনের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি ডেলিগেশন প্রায় তিন ঘণ্টা মতবিনিময় করল। মতবিনিময় শেষে মুজাহিদ সাহেব সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন।

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের কর্মসূচি ঘোষণা করার পর থেকেই আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় বামপন্থি শরীক দলের নেতৃবৃন্দ নির্বাচন কমিশনের নিকট অবিরাম দাবি জানাতে থাকেন যে, জামায়াতকে যেন সংলাপে আহ্বান করা না হয়, জামায়াতকে যেন রাজনৈতিক দল হিসেবে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া না হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেই যেন দেওয়া না হয়। এ দাবির কারণ হিসেবে তারা দাবি করেন যে, জামায়াত ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী।

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সাংবাদিকগণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণ বিধিমালার শর্ত পূরণ করলে নির্বাচন কমিশন যে কোনো দলকে নিবন্ধন করতে বাধ্য। কোনো দল শর্ত পূরণ করলে সে দলকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখার কোনো ইখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। তিনি আরো বলেছেন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অতীতে জামায়াতের সাথে মিলে কাজ করেছে।

যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা

নির্বাচন কমিশনের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ উপলক্ষে যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে প্রতিবাদ করা সেক্রেটারি জেনারেল প্রয়োজন বোধ করেছেন। তিনি কোনো অযৌক্তিক কথা বলেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব সরকার যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে। উক্ত তালিকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার নাম ছিল। দু বছর পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের এক বৈঠক শিমলায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে আসেন। মুজিব সরকার বাংলাদেশের কোনো লোককে যুদ্ধাপরাধীর ঐ তালিকায় শামিল করেনি। ঐ তালিকার পর আর কোনো তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। মুজাহিদ সাহেব এ কথাই বলেছেন যে, বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী ছিল না এবং এখনো নেই।

এত দিন বিচার করা হলো না কেন?

যারা বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের নিকট যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করছেন, তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কোনো তালিকা কেন করলেন না এবং বিচার করার ব্যবস্থা কেন করলেন না? বর্তমান সরকার তো নির্বাচিত সরকার নয়। জনগণের কোনো ম্যান্ডেট তাদের নেই। তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়া।

শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী বলে যাদের বিচার করার দাবি জানানো হচ্ছে, তাদের কোনো তালিকা কি তখন করা হয়েছে?

১৯৯৬ সালের জুন থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। তখনো কেন বিচার করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলো না?

১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলনে নিয়মিত তিন দলের লিয়াজোঁ কমিটির যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদের বাসায় যুক্ত বৈঠকে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হতো। ঐসব বৈঠকের খবর পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এমনকি সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় অফিসেও জামায়াতের সাথে তাদের বৈঠক হয়েছে। তখন যুদ্ধাপরাধীর কোনো অভিযোগ ওঠেনি কেন? স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩৬ বছর পর এ দাবির আসল মতলব কী?

মতলববাজদের উদ্দেশ্য

বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে। কমিশন প্রধান দু দলের অনেক নেতাকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করে। জামায়াতে ইসলামীর কয়েক জন সাবেক এমপিকেও গ্রেফতার করা হয়। জামায়াতের প্রধান নেতাদের কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় জামায়াতবিরোধী মহল প্রশ্ন তুলেছে যে, জামায়াতকে কেন ছাড় দেওয়া হচ্ছে?

গুরুতর অপরাধ দমন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ডা. এমএ মতিনকে বারবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন যে, আমরা কাউকেই সামান্য ছাড়ও দিচ্ছি না। দোষী হিসেবে অভিযোগ আসলেই ধরা হয়। এ সত্ত্বেও জামায়াত নেতাদেরকে কেন ধরা হচ্ছে না– এ প্রশ্নের আতিশয্যে তিনি বিরক্ত হয়ে এক বার বলেই ফেলেছেন, 'হয়তো তাঁরা দুর্নীতি করেন না।' এটা গত ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের কথা। তখন আমি লন্ডনে ছিলাম। সেখানে আওয়ামীপন্থি সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকায় মেজর জেনারেল সাহেবের উক্ত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কয়েক জনের লেখা দেখলাম। এর মধ্যে একটি লেখার শিরোনাম ছিল 'দোহাই জেনারেল সাহেব! বাংলাদেশের জনগণকে জামায়াতে ইসলামীর জিম্মি বানাবেন না'।

'জামায়াতনেতারা হয়তো দুর্নীতি করেন না' বলে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান জামায়াতের পক্ষে এত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন! এতে জামায়াতবিরোধীদের গা-জ্বালা হওয়াই স্বাভাবিক।

সর্বস্তরের জনগণের মাঝে স্বাভাবিক কারণেই এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। মূলত জামায়াতে ইসলামীতে দুর্নীতিবাজ লোকের স্থান নেই। যারা সৎ ও যারা সৎ হিসেবে গড়ে ওঠতে আগ্রহী, তারাই জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হয়। সততা, নৈতিকতা ও চরিত্রের উন্নত মানের ভিত্তিতেই জামায়াতের নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীতে নেতৃত্বের কোন্দল নেই। বিভিন্ন দলে যে ধরনের সংস্কার করার দাবি ওঠেছে এ জাতীয় কোনো সংস্কারের প্রয়োজন জামায়াতে দেখা যায় না। শুরু থেকেই জামায়াত ঐসব ত্রুটি থেকে মুক্ত।

বর্তমানে সকল দল সম্পর্কেই যে ব্যাপক চর্চা হচ্ছে, তাতে জনগণ সততার মাপকাঠিতে যাচাই করার মহাসুযোগ পেয়ে গেছে। মতলববাজদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত দল হিসেবে আগামী নির্বাচনে আরো এগিয়ে যেতে পারে।

এ কারণেই নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের সংলাপের ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকেই জামায়াতবিরোধী মহল দাবি জানাচ্ছে যে, জামায়াতকে যেন নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া না হয়। তারা ধর্মভিত্তিক দলসমূহকে নিবন্ধিত না করার দাবিও জানাচ্ছেন।

নির্বাচন কমিশন নিবন্ধনের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছে, আওয়ামী লীগ ছাড়া ১৪ দলের অন্য কোনো দল ঐসব শর্ত পূরণ করতে সক্ষম কি না, সে হিসাব তাদের থাকলে একটু হুঁশ করে কথা বলতেন।

তারা সংবিধানের ধার ধারেন না

আওয়ামী লীগ ও বামদল নামে পরিচিত দলগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে তারা গালি

দেন এবং তাদেরকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট ধরনা দিয়ে আছেন।

তাদের প্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যে ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান থেকে উৎখাত হয়ে গেছে, সেটা মগজে থাকলে এমন দাবি জানাতে পারতেন না। আওয়ামী লীগের নিকট সংবিধান খেলনা মাত্র। ক্ষমতার প্রয়োজনে সংবিধানকে ১৫ মিনিটে ওলট-পালট করে দেওয়ার ঐতিহ্য তারা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ নেতারাই সংসদীয় সরকারের বিধানসম্বলিত সংবিধান রচনা করেছিলেন। এ বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের ক্ষমতা দু ব্যক্তির হাতে থাকে। শেখ মুজিব উভয় ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানকে সংশোধন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির বিধান সংযুক্ত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণকালে ঐ সংবিধানকে সমুন্নত রাখার শপথ নিয়েছিলেন। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুপস্থিত। অথচ তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সংবিধান থেকে উৎখাত হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই তাঁর দলের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। সংবিধান সংশোধন করে এ মতবাদ আবার সংবিধানে সংযুক্ত করার চেষ্টা তারা অবশ্যই চালাতে পারেন; কিন্তু সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ঐ মতবাদকে আদর্শ বলে দাবি করা সংবিধানবিরোধী। আগেই বলেছি, তাদের নিকট সংবিধান ক্ষমতার খেলনা মাত্র।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল; কিন্তু এ দল পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি, ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্স পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছিল; কিন্তু ঐ দল পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা দিয়েও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করেছেন। মি. ভুট্টো সংবিধান অনুযায়ী বিরোধী দলের নেতা হওয়ার কথা; কিন্তু তিনি এক দেশে দুটো মেজরিটি পার্টির আজব ধুয়া তুলে, 'এধার হাম, ওধার তুম' বলে শেখ মুজিবকে তার সাথে সমঝোতার দাবি জানিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বৈঠক ডাকা হলো। সমঝোতা ছাড়া মি. ভুট্টো ঢাকায় আসতে অস্বীকার করলেন। ইয়াহইয়া খান বৈঠক মুলতবি করে দিলেন। শেখ মুজিব বিদ্রোহ করলেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসল। তিনি ইচ্ছা করলে তখনই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করতে পারতেন। তখন পূর্ব

পাকিস্তানে বিদ্রোহ ঠেকানোর মতো কোনো সামরিক শক্তি ইয়াহইয়া খানের হাতে ছিল না। শেখ মুজিব গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন; তাই বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও ইয়াহইয়া খানের সাথে সংলাপে বসতে সম্মত হয়েছেন।

ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ

১৭ মার্চ সংলাপ শুরু হলো, সংলাপে শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই মুখপাত্র হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইয়াহইয়ার সাথে কথা বলতেন। প্রয়োজনমতো শেখ মুজিব তাঁকে গাইড করতেন। সৈয়দ নজরুলের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি ঢাকায় আসলে আমার মহল্লায় তাঁর সম্বন্ধির বাড়িতে থাকতেন। সংলাপের সময় গভীর রাতে ঐ বাড়িতে তাঁর নিকট থেকে অগ্রগতির খবরাখবর নিতাম।

তাঁর নিকট থেকে আমি এ ধারণাই লাভ করেছি যে, শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। ছয় দফার ভিত্তিতে তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেতে চেয়েছিলেন। সৈয়দ নজরুল আরো বললেন, 'ছয় দফার ভিত্তিতে অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য আওয়ামী লীগ সংবিধানের যে খসড়া প্রণয়ন করেছে, এর গোপনীয়তা রক্ষার শপথ গ্রহণ করায় আপনাকে তা দেখাতে পারছি না।'

শেখ মুজিব যদি বাংলাদেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে তিনি স্বেচ্ছায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হতেন না। তিনিও ভারতে পালিয়ে যেতে পারতেন। কোনো সেনাপতি স্বেচ্ছায় প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হতে পারে না।

ইয়াহইয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে সংলাপকে ব্যর্থ করে দিলেন এবং সংলাপে সময়ক্ষেপণ করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেট দিয়ে দাবিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালালেন। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি বিস্তারিত লিখেছি, যা 'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

পঁচিশের কালো রাতের পর–

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহর দখল করার উদ্দেশ্যে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তা কেবল কোনো দেশের উপর শত্রু দেশের বর্বর হামলার সাথে তুলনীয়। সামরিক সরকারের অসদুদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিরাপত্তার জন্যই নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। দখলদার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের আশঙ্কায় আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং পর্যায়ক্রমে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

জেনারেল ইয়াহইয়া খানের সরকার রাজনৈতিক সমাধানের পথ রুদ্ধ করে সামরিক পদক্ষেপের ভ্রান্ত পথ বেছে নিয়ে আওয়ামী লীগকে ভারতের সাহায্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদেরকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার পথে ঠেলে দিয়েছে। শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেননি বটে; কিন্তু ইয়াহইয়া খান বাঙালিদের উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন।

২৫ মার্চের পর আমি চরম হতাশায় নিপতিত হলাম। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, জনগণকে কিছু বলার সুযোগ নেই। তাদের নিকট পৌঁছারও পথ নেই। পত্রিকা সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কী?

কিন্তু কিছু দিন পরই দেখা গেল, সেনাবাহিনীর লোকদের যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ লোকজন আমার বাড়িতে এসে সাহায্য চাইতে লাগলেন। নির্বাচিত দলের এমন কেউ নেই, যাদের কাছে তারা যেতে পারে। আমরা নির্বাচনে জয়ী না হলেও নির্বাচন করেছি। অন্য সব দল নির্বাচনী ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেও জামায়াতে ইসলামী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তাই তারা নিরুপায় হয়ে আমাদের কাছেই এসেছে।

প্রসঙ্গক্রমে লিখছি, বিগত ২০০৩ সালে মাওলানা মওদূদী (র)-এর জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে লাহোরে এক আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে গেলাম। সম্মেলনের পর আমাকে রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার, কোয়েটা ও করাচিতে বড় বড় সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে হয়েছে। সর্বত্র আমি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছি যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার জন্য শেখ মুজিব দায়ী নন। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে মি. ভুট্টো ইয়াহইয়া খানের সাথে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করেছেন। অখণ্ড পাকিস্তানে মি. ভুট্টোর ক্ষমতাসীন হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা তার জরুরি ছিল। আমার এ বক্তব্য সুধীবৃন্দ উচ্ছ্বাসের সাথে সমর্থন করেছেন।

আমরা কী করেছিলাম?

সব দেশেই সেনাবাহিনীকে জনগণ থেকে দূরে ব্যারাকে রাখা হয়; কিন্তু সামরিক শাসনে তারা শাসক হিসেবে জনগণের মাঝে বিচরণের সুযোগ পায়। সামরিক সরকার তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে জনগণের ময়দানে পাঠায় সে দায়িত্বের অতিরিক্ত এমন কিছু বাড়াবাড়ি তারা করে, যা নৈতিকতাবিরোধী। ফলে সাধারণ লোক নির্যাতিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এরূপ পরিস্থিতির কারণেই বিপন্ন মানুষ আমার কাছে এসেছে।

নির্বাচনে বিজয়ী দল নিরস্ত্র জনগণকে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে জিম্মি রেখে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে চলে গেল। আমাকে কাছে পেয়ে বিপন্ন মানুষ সাহায্যের জন্য ধরনা দিতে লাগল।

অভিযোগ আসতে লাগল, অমুক গ্রামে সেনাবাহিনী ঘেরাও করে পুরুষদেরকে কোনো ময়দানে জমা করেছে। তাদের মাঝে যাদেরকে সরকারের বিদ্রোহী বলে সন্দেহ হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। পুরুষেরা ময়দানে জমায়েত থাকাকালে কতক সেনাসদস্য বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করতে গেল যে, কোনো পুরুষ লুকিয়ে রইল কি না। এ সুযোগে কোনো কোনো সৈনিক মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে।

সাহায্যপ্রার্থী জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে আমি সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। সৈনিকদের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষার ব্যাপারে কর্মকর্তারা যেটুকু সাড়া দিতেন, সে পরিমাণ সহায়তা পেয়েই জনগণের ভিড় আরো বাড়তে লাগল। আমার ব্যস্ততা এত বেড়ে গেল যে, যথাসময়ে গোসল, খাওয়া ও বিশ্রামে অনিয়ম চলতে লাগল। কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার অনিয়ম না করার জন্য তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও এভাবেই জনগণের সেবা চলতে থাকল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে কী করা যায়?

এ দেশের সকল ইসলামী দল, মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী দল ও ভারতবিরোধী দল মহাসমস্যায় পড়ল। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি যে, ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে পৃথক হলে দেশ সত্যিকার স্বাধীন হবে। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের কোনো সরকারই এ দেশের প্রতি ন্যায় আচরণ করেনি। তাদের চির দুশমন পাকিস্তানকে ভাঙার এ মহাসুযোগ গ্রহণ করাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। তারা পাকিস্তানকে ভাঙতে পারলে বাংলাদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করা সহজ হবে এবং এ দেশকে তাদের পণ্যের বাজারে পরিণত করা যাবে– এ মহান(!) উদ্দেশ্যেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব হাতে নিয়েছে।

তারা হিসাব কষে দেখল যে, মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে হলে নেতৃস্থানীয় সবাইকে আওয়ামী লীগ নেতাদের মতোই ভারতে আশ্রয় নিতে হবে। তারা ভারতে কোনো আশ্রয় পাওয়ার চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

১৯৭১-এর মার্চ মাসে যখন পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তখন স্বাধীনতার পক্ষে যারা সশস্ত্র মহড়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে ময়দান মুখরিত করেছেন। এ দুটো মতবাদই সরাসরি ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ইসলামপন্থি সকলেই মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা গেল না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে ইসলামের কেমন দশা হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

উপরিউক্ত বিবিধ কারণে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হওয়া অসম্ভব মনে হলো। তারা বিপন্ন জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে যতটুকু খিদমত করা যায়, ততটুকুতেই তাদের কর্মসূচি সীমিত করে রাখল। এ কাজ সমাধা করার প্রয়োজনে তারা সেনা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হতো।

রেযাকার (রাজাকার) বাহিনী গঠন

বর্তমানে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আনসার বাহিনী রয়েছে। '৭১ সালে তেমন কোনো বাহিনী ছিল না। গভর্নর টিক্কা খান আনসার বাহিনীর আদলে রেযাকার বাহিনী গঠন করেছিলেন। বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্থলে তখন সার্কেল অফিসার ছিল। তাদের মাধ্যমে হাট-বাজারে ঢোল পিটিয়ে রেযাকার বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। সামান্য ভাতা দিয়ে তাদেরকে পুলিশের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রেযাকার ফার্সি শব্দ। এর অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। এ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

রেযাকারদের কোনো গ্রুপকে 'আশ্‌শামস্‌' আবার কোনো গ্রুপকে 'আলবদর' নামকরণ করা হয়েছে। সেনা কর্মকর্তারাই এসব নাম দিয়েছেন এবং তাদের পরিচালনায়ই এমন গ্রুপ দায়িত্ব পালন করত। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে এসব বাহিনীর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কলাবরেটার্স অ্যাক্ট

যেসব রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়নি এবং জনগণের সেবায় সক্রিয় ছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব অর্ডিন্যান্স জারি করে একটি আইন তৈরি করেছিলেন। ঐ আইনের নাম রাখা হয়েছে 'কলাবরেটার্স অ্যাক্ট' (সহযোগিতা আইন)। অর্থাৎ তাদেরকে পাকবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেযাকারদেরকেও এ আইনের আওতায় আনা হয়েছে; কিন্তু সামরিক শাসনামলে যারা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পুলিশ বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

উক্ত আইনে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মামলাও শুরু হয়েছিল। দু বছর পর সিমলা বৈঠকে পাকিস্তানের ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করে শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসে কলাবরেটার্স অ্যাক্ট বাতিল করে সকল সহযোগিতাকারীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি হয়তো বিবেচনা করে থাকবেন যে, আসল অপরাধীদেরকেই যখন ক্ষমা করতে হলো তখন তাদের সাথে সহযোগিতাকারী বেচারাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোনো যুক্তিই থাকে না। সঙ্গত কারণেই তিনি এ দেশের কোনো লোককে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করেননি; করলে অবশ্যই তাদের তালিকা তৈরি করে বিচারের ব্যবস্থা নিতেন।

ফৌজদারি অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা হয়নি

শেখ মুজিব কলাবরেটারদেরকে ক্ষমা করার সময় এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, যারা খুন, লুট, ধর্ষণ ও আগুনে পোড়ানোর অপরাধ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়নি। আইন মোতাবেক তাদের বিচার চলবে।

এখন আমার প্রশ্ন

বাংলাদেশের কোনো থানায় কি জামায়াতে ইসলামীর কোনো লোকের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত ফৌজদারি অপরাধের কোনো মামলা দায়ের করা হয়েছে? না হয়ে থাকলে '৭১-এর ভূমিকা নিয়ে এত হৈচৈ কেন করা হচ্ছে?

এ পর্যন্ত কি শেখ মুজিব সরকার ও শেখ হাসিনা সরকার যুদ্ধাপরাধীদের কোনো তালিকা তেরি করেছে? না করে থাকলে বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের নিকট তালিকা করার দাবি করে কোন্ মুখে বিচার দাবি করা হচ্ছে।

আগামী ১৬ ডিসেম্বরের (২০০৭) মাত্র দেড় মাস বাকি আছে। এর আগেই তালিকা করে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচারকার্য সমাধা করার আজব দাবি যারা জানাচ্ছেন, তারা ক্ষমতায় থাকাকালে এ দায়িত্ব কেন পালন করলেন না?

সরকারের আইন উপদেষ্টাও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন তুলেছেন যে, যারা গত ৩৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তারা এ সমস্যার সমাধান কেন করলেন না?

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল যে সত্য কথাটি উচ্চারণ করলেন, এর প্রতিবাদে যারা ময়দান গরম করছেন তাদের পক্ষে কি কোনো যুক্তি আছে? এসব অযৌক্তিক হৈচৈ করে জনগণের নিকট তারা নিজেদেরকে হাস্যাস্পদ করছেন কেন?

৩৩৫.

তুরস্ক সফর

১৯৯৬ সালের ১৯ অক্টোবর তুরস্কের বৃহত্তম শহর ঐতিহাসিক ইস্তাম্বুল নগরীতে পৌঁছলাম। তুরস্কে এটা আমার তৃতীয় সফর। ১৯৭৭ সালের ২৯ জুন থেকে ৬ জুলাই ছিল আমার প্রথম সফর। IFISO (International Federation of Islamic Students Organizations)-এর সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে লন্ডন থেকে গিয়েছিলাম। সে বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম' পঞ্চম খণ্ডের ১০৮ নং পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় সফর হয়েছে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের দাওয়াতে গিয়েছিলাম। এ সফরের বিবরণ ৩০৭ নং কিস্তিতে লিখেছি, যা অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

ড. আরবাকান যখন আমাকে তৃতীয় সফরের দাওয়াত দিলেন, তখন তিনি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী। আমার সফরসঙ্গী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি জনাব আবু নাসের।

এ সফরের উপলক্ষ

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ড. আরবাকান বহু দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে তুরস্কে সমবেত করলেন। বিশাল এক হোটেলে মেহমানদের থাকা-খাওয়া ও তিন দিনব্যাপী দু বেলা সেমিনার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটি বড় বড় মসজিদ ও জাদুঘর ও এক সাহাবীর মাযার দেখানোর জন্য আমাদেরকে হোটেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ ছাড়া যাবতীয় কর্মসূচি হোটেলের ভেতরেই পালন করা হয়েছে। একটি সেমিনারে আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অবশ্য শেষ দিন সরকারি গেস্ট হাউজে বড় আকারে এক ডিনারে যেতে হয়েছে। উক্ত ডিনারে অনেক গণ্যমান্য লোককে সমবেত করা হয়েছে। ডিনারে প্রধানমন্ত্রীর একপাশে তাঁর বন্ধু ইন্দোনেশিয়ার তদানীন্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. হাবিবী এবং আরেক পাশে আমাকে বসানো হয়। ড. হাবিবীও ড. আরবাকানের মতোই ইঞ্জিনিয়ার। দুজন একই সময়ে জার্মানে পিএইচডি করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের আরো বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ডিনারে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে। ড. আরবাকান ইংরেজি ভাষা বলায় অভ্যস্ত নন বলে তাঁর সাথে দোভাষীর মাধ্যমেই বিভিন্ন সময় কথা হয়েছে। ডিনারের সময় আমার সাথে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে দোভাষী রাখা সম্ভব ছিল না।

ইস্তাম্বুলে দর্শনীয় স্থানসমূহ

১. বিশিষ্ট আনসার সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর মাযার অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান। ইস্তাম্বুলের প্রাচীন নাম কনস্টান্টিনোপল। হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলামী শক্তির সাথে রোম সাম্রাজ্যের সংঘর্ষে মুসলিম বাহিনীর অব্যাহত বিজয়ের পর যখন কনস্টান্টিনোপল অভিযান চলেছে তখন বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবী আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) সে বাহিনীতে শরীক হয়েছেন। নবী করীম (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এ আনসার সাহাবীর বাড়িতেই প্রথমে মেহমান হয়েছেন। বার্ধক্যের দরুন এ জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিলে তিনি সূরা তাওবার ৪১ নং আয়াত উল্লেখ করে বললেন, এ আয়াতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সেও জিহাদে শরীক হতে বাধ্য করেছে। আয়াতটির অনুবাদ হলো, 'তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায় হোক আর ভারী অবস্থায়ই হোক এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। তোমরা যদি জান তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো।

কনস্টান্টিনোপল পৌছার আগেই পথিমধ্যে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তিনি অসিয়ত করেছেন যে, তাঁর লাশ যেন ঐ শহরে দাফন করা হয়, যে শহর জয় করার উদ্দেশ্যে তিনি জিহাদে শরীক হলেন।

আমরা তাঁর মাযার যিয়ারত করলাম এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সাথে তাঁর কথা স্মরণ করে দুআ করলাম যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক জযবার উপযুক্ত বদলা দান করুন।

২. ইস্তাম্বুলের অনেক মসজিদের মধ্যে তিনটি মসজিদই বেশ বড়। সুলাইমানিয়া মসজিদ, সুলতান আহমদ মসজিদ ও মুহাম্মদ খান আল ফাতেহ মসজিদ। আমরা জুমুআর নামায সবচেয়ে বড় মসজিদ সুলাইমানিয়াতে আদায় করলাম। মুহাম্মদ খান আল ফাতেহ ঐ মহাবীরের নাম, যিনি ১৪৫৯ সালে গ্রিকদের দখল থেকে ইস্তাম্বুল নগর পুনরুদ্ধার করেছেন। হালাকু খাঁর হাতে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর গ্রিকরা এ নগর মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ফাত্‌হুম মানে বিজয়। ফাতেহ মানে বিজয়ী। সুলতান মুহাম্মদ খানের ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর তাঁর নামের সাথে ফাতেহ শব্দটি উপাধি হিসেবে যোগ করা হয়েছে।

বসফরাস প্রণালী (Bosphorus Strait)

৩. তুরস্কের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে বসফরাস প্রণালী অত্যন্ত মনোরম। কৃষ্ণ সাগর ও মর্মর সাগরের মাঝখানে ১৯ মাইল দীর্ঘ ও দু থেকে আড়াই মাইল প্রস্থ উপসাগরটিই বসফরাস প্রণালী নামে খ্যাত। এ প্রণালী ইস্তাম্বুল নগরীর প্রধান আকর্ষণ। নগরীর মাঝখানে অবস্থিত থাকায় এ মহানদী অপরূপ সৌন্দর্যের আধার। টেম্‌স নদী অপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও লন্ডন শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বসফরাস প্রশস্ত হওয়ার কারণে সে তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

বসফরাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত। তাই বসফরাস তুরস্ককে এ দু মহাদেশের মধ্যে বিভক্ত করেছে। বসফরাসের পূর্ব তীর এশিয়ায় এবং পশ্চিম তীর ইউরোপে। তুরস্ক ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থল।

সুউচ্চ হোটেলের জানালা দিয়ে বসফরাসের বিশাল জলরাশির দিকে আমি সময় পেলেই তাকিয়ে থেকে তৃপ্তিবোধ করতাম। হোটেলের সাথেই প্রশস্ত রাস্তাটি বসফরাসের তীরেই অবস্থিত। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাহাজ বসফরাস দিয়ে যাতায়াত করে। একদিন আমাদেরকে একটি স্পিডবোটে বসফরাসে বিচরণের সুযোগ করে দিলে আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করেছি।

তোপকাপি (Topkapi) জাদুঘর

বিশ্বের প্রাচীন ও খ্যাতিমান জাদুঘরগুলোর অন্যতম ইস্তাম্বুলের তোপকাপি মিউজিয়াম। তোপকাপি নামকরণের ইতিহাস ও জাদুঘর সম্পর্কে বেশ মূল্যবান তথ্য

গবেষক ও লেখক জনাব ফজলুর রহমান জুয়েলের "সেকালের 'হোয়াইট হাউজ' কেমন আছে আজ" শিরোনামের লেখা থেকে সংগ্রহ করেছি। লেখাটি ২০০৭ সালের ২৩ মার্চ সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের প্রতি শুকরিয়া জানাই।

তিনি তোপকাপি'র ইতিহাস লিখতে গিয়ে আবেগময় ভাষায় লিখেছেন, বর্তমানে (একবিংশতম শতাব্দীতে) আমেরিকার হোয়াইট হাউজের যে মর্যাদা, উসমানী খিলাফতের সময় তোপকাপির অবস্থান তেমনই ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজ থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ৪০০ বছর উসমানী খিলাফতের সুলতান তোপকাপি থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ বিস্তৃত বিশাল উসমানী সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ইস্তাম্বুল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ 'তোপকাপি' নামক বিশাল প্রাসাদটি নির্মাণ করেছেন। বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম তীরে প্রাসাদটি নির্মিত। তুর্কি ভাষায় কামানকে তোপ বলা হয়। আর ফটক বা সদর দরজা বা সিংহদ্বারকে কাপি বলা হয়। তোপকাপি মানে কামানওয়ালা ফটক।

খ্রিস্টানদের শাসনামলে শহরের সদর দরজার নাম ছিল সেন্ট রোমান্স। সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ ঐ ফটকের সামনে এক শক্তিশালী কামান স্থাপন করেছেন। ঐ কামান দিয়ে ফটকটি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বিজয়ী বীর হিসেবে নগরীতে প্রবেশ করেছেন। ১৪৫৯ সালে ঐ ফটকেই পরিকল্পিত প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৪৬৫ সালে প্রাসাদটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'সারায়ে তোপকাপি'। প্রাসাদকে তুর্কি ভাষায় সারায়ে বলা হয়।

তোপকাপি জাদুঘর এ ঐতিহাসিক প্রাসাদেই অবস্থিত। কামাল পাশার শাসনামলেই জাদুঘরটি স্থাপিত হয়। আমরা দীর্ঘ সময় লাগিয়ে জাদুঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। সুলতানী আমলের কয়েক শতাব্দীকালে বিশাল সাম্রাজ্যের সকল এলাকার শাসকদের পক্ষ থেকে স্বর্ণ, হীরা ও মণিমুক্তাখচিত যত উপহারসামগ্রী এসেছে তা এ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ইউরোপের খ্রিস্টান শাসকেরাও সুলতানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনেক মূল্যবান উপহার পাঠাতেন। সেসবও সেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জাদুঘরে মুসলমান পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় সামগ্রী হলো, রাসূল (স)-এর পবিত্র স্মৃতিবাহক কতক দুর্লভ জিনিস। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– রাসূল (স)-এর মাথার চুল, দাঁত, তাঁর ব্যবহৃত জামা ও তরবারি। প্রত্যেক মুসলিম অত্যন্ত আবেগের সাথে এসব দেখতে থাকে। আমার মনে হয়েছিল যে, অব্যাহতভাবে দেখতে পারলে খুব ভালো লাগত। আরো রয়েছে উসমানী শাসকদের অস্ত্র, জামা-কাপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি। হযরত উসমান (রা) যে কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় শহীদ হয়েছেন সে রক্তমাখা কুরআনও সেখানে রয়েছে।

তাছাড়া চিন ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের তৈরি সিরামিক্স ও কাচের বহু রকম জিনিস সেখানে প্রদর্শনীর জন্য মজুদ রাখা হয়েছে।

সৌদি কনসাল জেনারেলের মেহমান

প্রধানমন্ত্রীর মেহমানদারি সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা নিজেদের দায়িত্বে আরো কিছু দিন তুরস্কে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে ড. আরবাকানের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। হোটেল থেকে সৌদি কনসাল জেনারেল ড. আলী আল-গামেদীর বাসায় মেহমান হলাম। ড. গামেদী আমার সফরসঙ্গীর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। তিনি কয়েক বছর ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাসে কাউন্সিলর ছিলেন। বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রদূত শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খতীবের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন উপলক্ষে উক্ত সফরসঙ্গী দীর্ঘ ১২ বছর উক্ত দূতাবাসে কর্মরত থাকাকালে ড. গামেদীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমার সাথে বিভিন্ন সময় দেখা-সাক্ষাতের কারণে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সেখানে দুদিন কাটালাম। বেগম গামেদী নিজে পাক করে খাওয়ালেন। একদিন ডিনারের আয়োজন করলেন। তাতে ড. আরবাকানের দল রেফাহ্ পার্টির বেশ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। উসমানী খিলাফতের সর্বশেষ সুলতান আবদুল হামীদের একজন বংশধরও উপস্থিত ছিলেন।

ড. গামেদী ভারতের সৌদি দূতাবাসে কর্মরত থাকাকালে সেখানেই পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে জেদ্দা শহরে বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। জেদ্দাস্থ আইডিবি-তে কর্মরত আমার বড় ছেলে মামুনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় আমার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়। এ বছর (২০০৭) জেদ্দায় পৌনে দু মাস ছিলাম। তাঁর বাড়িতে দাওয়াত খেলাম। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর ডাইরেক্টর হিসেবে বছরে কয়েক বার ঢাকায় আসেন।

ইস্তাম্বুলে যখন আমি তাঁর বাসায় মেহমান ছিলাম, তখন তার স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সময় নিকটবর্তী ছিল। সে ছেলের নাম রেখেছেন, মুহাম্মদ আল ফাতেহ। সে ছেলেকে দেখে এলাম জেদ্দায়। ১০ বছরেই বেশ লম্বা হয়েছে।

রাজধানী আংকারায় পৌঁছলাম

ইতঃপূর্বে তুরস্কে দু বার সফর করা সত্ত্বেও রাজধানী আঙ্কারায় যাওয়া হয়নি। এ সফরে আগে থেকেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। ইস্তাম্বুলে প্রধানমন্ত্রীর মেহমান থাকাকালেই আঙ্কারা থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আমাকে ফোন করে আঙ্কারা যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমার সাথে তাঁর আত্মীয় পরিচয়ও দিলেন, যা আমার জানা ছিল না। আঙ্কারা থেকে গাড়ি পাঠাতে চাইলেন।

প্রয়োজন নেই বলে জানালাম। তিনি আমাকে সরাসরি তাঁর বাসায় ওঠার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমরা সৌদি কনস্যুলেটের গাড়িতে আঙ্কারা গেলাম। দুপুরেই রাষ্ট্রদূতের বাসায় গিয়ে উঠলাম। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আত্মীয়তার হিসাবটা জানতে চাইলে বললেন, আপনার দু ভাই আমাদের খালু। তাই আপনাকেও খালুই ডাকব। জানলাম, তাঁর স্ত্রী আরমানিটোলাস্থ সুবহান মঞ্জিলের মাওলানা আবদুস সুবহানের মেয়ের ঘরের নাতনী। মাওলানা আবদুস সুবহানের দ্বিতীয় ছেলে জনাব মুহাম্মদ হোসেনের দু কন্যার সাথে আমার দু ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। ঐ দু কন্যা তাঁর স্ত্রীর খালা। আমার জানা না থাকলেও আমার ভাইদের আত্মীয় হিসেবে দূরসম্পর্ক বলা চলে না।

যোহরের নামাযের পর ভুরিভোজন হলো। মেহমান হিসেবে আপ্যায়নের বেশ বড় আয়োজনই ছিল। রাত পর্যন্ত সেখানে থাকার কথা ছিল না। আসর পড়েই চলে যাওয়ার কথা। তাই খাওয়ার পর মেজর জেনারেল আমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলেন।

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার রংপুর গঙ্গাচড়া আসনে জামায়াতের তদানীন্তন আমীর শাহ রুহুল ইসলামকে বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন এবং রেডিওতেও তা প্রচারিত হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার দলের পরাজিত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করার ব্যবস্থা করার জন্য রংপুর ক্যান্টনমেন্টের জিওসিকে নির্দেশ দেন। সেখানে তখন তিনিই জিওসি ছিলেন। বিবেকের বিরুদ্ধে সে নির্দেশ পালন করতে সেদিন তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকের দংশন অব্যাহত থাকায় তিনি আমাকে হাত ধরে বিনীতভাবে আবেদন জানালেন, যাতে আমি শাহ রুহুল ইসলামকে ক্ষমা করার জন্য সম্মত করি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি ২২০ নং কিস্তিতে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল লিখতে গিয়ে এ ঘটনাটি সেখানে উল্লেখ করেছি। 'জীবনে যা দেখলাম' ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

নূরে তোলাবার মেহমান

সন্ধ্যার আগেই রাষ্ট্রদূতের বাসা থেকে চলে গেলাম। নূরে তোলাবা নামক সংগঠনের মেহমানখানায় গিয়ে উঠলাম। নূরে তোলাবার প্রতিষ্ঠিত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি সেকেন্ডারি স্কুলের বিল্ডিংয়ে মেহমানখানাটি অবস্থিত। নূরে তোলাবা কারা, সে কথাই লিখছি।

তুরস্ক উসমানী খিলাফতের কেন্দ্রভূমি হিসেবে দীর্ঘ ৬০০ বছর ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তি বিজয়ী হওয়ার পর তুরস্কের স্বাধীন অস্তিত্ব

রক্ষার দোহাই দিয়ে তুর্কি সেনাবাহিনীর জনৈক কর্মকর্তা কামাল পাশা পাশ্চাত্যের সমর্থনে ক্ষমতা দখল করেন। পাশ্চাত্য শক্তি তুরস্কে সরাসরি ক্ষমতা দখল করলে জনগণ অবশ্য বিরোধিতা করত। জনগণের প্রতিরোধ না কামাল পাশা থাকায় খুব সহজেই ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন।

তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তুরস্ক থেকে ইসলাম, ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামী সভ্যতাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। জনগণের শতকরা ৯৭ জন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কামাল পাশাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারেনি। দেশে কোনো ইসলামী নেতৃত্ব না থাকায় অসহায় মুসলিম জনগণ নীরবে কেঁদেছে।

এ পরিস্থিতিতে বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী নামে এক মুজাদ্দিদ নীরবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁকে জেলে আটক করে রাখা হলো। তিনি সেখান থেকে হাতে লিখে ইসলামের শিক্ষা বাইরে গোপনে পাঠাতে থাকেন এবং গোপনেই জনগণের মাঝে ছড়াতে থাকে। গোপন বাণীর আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। জনগণের ঈমানী চেতনায় তুসের আগুনের মতো ইসলামের বাণী নীরবে বিস্তার লাভ করতে লাগল। এ আন্দোলনেরই সংগঠন হলো নূরে তোলাবা।

নূরে তোলাবার কর্মতৎপরতা

এদের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। নির্বাচনে যারা ইসলামের পক্ষে, তাদেরকেই এরা ভোট দেয়। এদের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার সাথে যারা শরীক, তারা নির্বাচনে ইসলামপন্থিদেরকেই ভোট দেওয়া কর্তব্য মনে করে। এরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এ সমর্থন জানায় না বিধায় তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা দোষারোপ করার সুযোগ পায় না।

ব্যবসায়ীদের বিরাট বাহিনী এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। তাদের আর্থিক শক্তি তিন ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

১. **শিক্ষা :** তারা সারা দেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরকারি সিলেবাসের সাথে ইসলামী শিক্ষা শামিল করে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার মান এতটা উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় সকল রকম প্রতিযোগিতায় সন্তোষজনক সংখ্যায় সফল হয়। শিক্ষার উচ্চস্তরে তারা আদর্শিক মান রক্ষা করে চলে এবং কর্মজীবনেও আদর্শিক লক্ষ্য হারায় না।

২. **মিডিয়া :** তুর্কি ভাষায় দৈনিক যামান বহুল প্রচারিত। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যথেষ্ট অগ্রসর। আমাদেরকে মিডিয়ার অফিস ও কর্মস্থল প্রদর্শন করানো হলে আমরা তাদের অগ্রগতিতে বিস্মিত হই।

৩. **স্বাস্থ্যসেবা :** দেশে অনেক হাসপাতাল গড়ে তুলে তাঁরা স্বাস্থ্যসেবা দ্বারা জনগণের অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমরা যে স্কুলের বিল্ডিং মেহমান ছিলাম, এর গেইটে কামাল পাশার আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। জানা গেল, সে দেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এ মূর্তি রাখা বাধ্যতামূলক।

আঙ্কারায় দোভাষীর দায়িত্ব

তুরস্কে উচ্চশিক্ষিত লোকদের মাঝে ইংরেজি ভাষায় কথা বলার লোক খুব কম। আমরা তো তুর্কি ভাষার কিছুই জানি না। যারা ইংরেজি বলতে পারেন, তাদের সাথে ছাড়া নেতৃস্থানীয় অনেকের সাথেই ভাববিনিময়ের প্রয়োজনে আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্র শহীদুল ইসলাম মাসুদের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হলাম।

ব্যবসায়ীদের দেওয়া ডিনার

নূরে তোলাবার দীনী ভাইয়েরা আমাদের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে অত্যন্ত আবেগময় মহব্বত প্রকাশ করেছেন। তাদের ডিনারের দাওয়াতে মহব্বতের অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে।

খাবারের বিরাট আয়োজন দেখা গেল। তুরস্ক কৃষিপ্রধান দেশ। উৎপাদিত সকল ফল, সবজি ইত্যাদি আকারে বেশ বড়। এত বড় আপেল, টমেটো, বেগুন, আঙ্গুর, চেরি ইত্যাদি আর কোথাও দেখিনি।

যে কয় প্রকার সালুন দেখলাম, সবগুলোতেই বেগুনের প্রাধান্য। বরিশালে যেমন সবকিছুতেই নারিকেল থাকে ঠিক তেমনই।

বিরাট এক পাত্রে খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে ঐ পাত্রের পাশে বসিয়ে খেতে অনুরোধ জানালে বললাম, আপনারাও খেতে বসুন। এত খাবার আমরা কয়েক জন কেমন করে খাব? তারা বললেন, আপনারা খাওয়ার পর বরকতের জন্য আপনাদের ঝুটা খাবার আমরা খাব। তাদের এ আজব মহব্বতে আমরা অভিভূত হলাম।

তুরস্ক বিরাট সম্ভাবনাময় দেশ

বর্তমানে (২০০৭) যিনি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী, তিনি ড. আরবাকানের দলের নেতাই ছিলেন। রিসেপ তাইয়েব ইরদোগান তখন ইস্তাম্বুল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। জনগণের ইসলামী চেতনার প্রকাশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে বারবার ঘটেছে। কামাল পাশার সময়কার প্রণীত শাসনতন্ত্রই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাতে ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল রাখার ক্ষমতা সশস্ত্র বাহিনীর হাতে রয়েছে। তাই বারবার তারা নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ গুলের স্ত্রী মাথায় স্কার্ফ পরার অপরাধে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হতে দেওয়া হয়নি। আশা করা যায় যে, তুরস্কের জনগণ ইসলামবিরোধী শাসনতন্ত্র সংশোধনে সক্ষম হবে এবং তুরস্কে একদিন ইসলাম বিজয়ী হবে।

বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন

১৯৯৬ সালের ৯ ডিসেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে আমি বললাম,

'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তিতে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাই। স্বাধীন দেশের সরকার জনগণের নির্বাচিত এবং তাদের সেবক প্রভু নয়। দেশকে গড়ে তোলাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। প্রতিহিংসা, হানাহানি, প্রতিশোধ ও বিভক্তির রাজনীতি বহাল থাকলে দেশ গড়া অসম্ভব। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দেশ শাসন করা হলে জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে না। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে স্বাধীনতা অর্থহীন।'

'দুর্ভাগ্যবশত দেশে আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ায় ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আল্লাহর বিধান ছাড়া জনগণ স্বাধীনতার সুফল কিছুতেই ভোগ করতে পারবে না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। নির্বাচনী ফলাফল যা-ই হোক আমাদেরকে দীনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আরো অধিক পরিমাণে পালন করতে হবে।'

আমি মজলিসে শূরাকে অবহিত করি যে, ১৫ দিন আগে সিঙ্গাপুরে আমার এমআরআই করা হয়েছে। ডাক্তার ৬ মাস ওষুধ খাওয়ার জন্য প্রেসক্রিপশন দিয়ে কয়েক মাস বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। দেশে থাকা অবস্থায় বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই বিধায় সৌদি আরবে আমার বড় ছেলের বাসায় তিন মাসের জন্য যেতে চাই। নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর আমার সাথিদের উপর আন্দোলন ও সংগঠনের দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। সবার কাছে দুআ চাইলাম।

সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমার অনুরোধে সকলকে নিয়ে আমার জন্য দুআ করে বিদায় দেন। আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সাংগঠনিক সফরে সৌদি আরব যাওয়ার সিদ্ধান্ত থাকায় আমি সস্ত্রীক তাঁর সাথেই সৌদি আরব রওয়ানা হলাম।

৩৩৬.

১৯৯৬-এর নির্বাচনের অজানা তথ্য

ধারণা করেছিলাম যে, গত কিস্তিতে যা লিখেছি তাতে ১৯৯৬ সালের বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের রহস্য সম্পর্কে এমন কতক চমকপ্রদ তথ্য পেয়ে গেলাম, যা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এত বেশি আসনে বিজয়ী হওয়া বিস্ময়করই ছিল।

এ বিজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'জীবনে যা দেখলাম' ৭ম খণ্ডের ২৮৯ নং কিস্তিতে বিস্তর আলোচনা করেছি। কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা করেছেন এমন সন্দেহও আমি পোষণ করিনি। কেয়ারটেকার সরকার নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক বলেই সকলের ধারণা। ১৯৯১ সালে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের পরিচালনায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে সর্বমহলে স্বীকৃত। অবশ্য শেখ হাসিনা সে নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন; কিন্তু তিনি এ অভিযোগের কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

১৯৯৬-এর নির্বাচনে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কেমন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন সে বিষয়ে এমন কতক তথ্য পেলাম, যা আমাকে বেদনাহত করেছে। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণকালে সংবিধান অনুযায়ী যে শপথ করেছেন তা এমন প্রকটভাবে লঙ্ঘন করতে পারেন তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন।

এসব তথ্য যার নিকট থেকে পেয়েছি, তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান এবং নির্বাচনকালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে আমি সরাসরি অবগত না হলে এত বড় অভিযোগের কথা প্রকাশ করতে প্রস্তুত হতাম না। তাঁর নাম প্রকাশ করার অনুমতি না পেলে তথ্য জানা সত্ত্বেও তা এভাবে উল্লেখ করতাম না। তিনি সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং বর্তমানে প্রখ্যাত নিয়মিত কলামিস্ট ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী।

বিস্ময়কর তথ্যসমূহ

১. প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাতের বেলা প্রায়ই দেখা করতেন।

২. বিশেষ করে জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও আমির হোসেন আমু তাঁর সাথে গোপনে বৈঠক করতেন। তারা নিয়মিত বৈঠকে আসতেন।

৩. এমনকি শেখ হাসিনা স্বয়ং তাঁর সাথে বৈঠকে বসতেন। প্রথম বৈঠকে ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। সে বৈঠকে শেখ হাসিনা সরকারি কর্মকর্তাদের একটি তালিকা পেশ করেন, যাদেরকে ডিসি হিসেবে যেন নিয়োগ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বৈঠকে শেখ হাসিনা বললেন, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার সাথে তিনি একান্তে আলোচনা করতে চান, কোনো সরকারি কর্মকর্তা থাকার প্রয়োজন নেই। প্রধান উপদেষ্টা ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীকে ইশারা দিলে তিনি চলে যান। শেখ হাসিনা আরো কত বার সেখানে গিয়েছেন তা তিনি জানেন না।

৪. ঢাকার মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের উদ্যোগে নির্মিত জনতার মঞ্চ থেকে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারণা চলে।

১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি একদলীয় নির্বাচন করে নতুন সরকার গঠনের বিরুদ্ধেই জনতার মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। আওয়ামী লীগপন্থি উচ্চপদস্থ আমলারা সরকারি বিধিমালা লঙ্ঘন করে উক্ত রাজনৈতিক মঞ্চে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আন্দোলনে শরীক হন।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী ঐ আমলাদের তালিকা তৈরি করে প্রধান উপদেষ্টার নিকট পেশ করে পরামর্শ দেন যে, নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত কোনো পদে তাদেরকে নিয়োগ দিলে সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠতে পারে। তিনি নিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে সরল বিশ্বাসে তালিকাটি প্রধান উপদেষ্টার হাতে তুলে দিলেন। প্রধান উপদেষ্টা আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করলেন এবং তাদের সবাই ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়ে গেলেন। মনে হয়েছে যে, এমন একটি তালিকাই তিনি তালাশ করছিলেন।

নির্বাচনে কারচুপি করার ক্ষমতা কার?

ডিসিগণ জেলা প্রশাসক হিসেবে নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। ভোটকেন্দ্র থেকে পোলিং অফিসাররা ভোট গণনা করে এর হিসাব ও ব্যালট বাক্স ডিসি অফিসে পাঠিয়ে দেন। রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে চূড়ান্তভাবে ভোট গণনা করে প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সামনে তিনি বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন। মিডিয়ায় এ ফলাফল প্রচার করা হয়। চূড়ান্ত ফলাফল সরকারিভাবে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে।

নির্বাচনে কারচুপির সুযোগ ভোটকেন্দ্রে হতে পারে, যদি পোলিং অফিসার কোনো প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করেন। পোলিং অফিসারের সহযোগিতা পেলে এক প্রার্থী প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দিয়ে ব্যালট চুরি করতে পারে।

কারচুপির ক্ষমতা ও সুযোগ রিটার্নিং অফিসারেরই সবচেয়ে বেশি। তাই বিচারপতি হাবিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে বিজয়ী করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার জন্য যাদেরকে ডিসি নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন, তাদেরকেই দিয়েছেন। এ বিষয়ে শেখ হাসিনা তাকে সরাসরি সাহায্য করেছেন।

২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধান উপদেষ্টার ব্যাপারে শেখ হাসিনার উগ্রতার কারণ

রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশনপ্রধান নিরপেক্ষ হলে নির্বাচনে কারচুপি হওয়ার আশঙ্কা নেই। নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারপ্রধানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি নিরপেক্ষ হন তাহলে তিনি ডিসি নিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন এবং নিরপেক্ষ হিসেবে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেবেন না।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার ব্যাপারে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, সে বিষয়ে শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ ধারণা রয়েছে। তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, প্রধান উপদেষ্টা কোনো দলকে বিজয়ী করতে চাইলে তা করা সম্ভব। এ কারণেই শেখ হাসিনা বিচারপতি কেএম হাসানের বিরুদ্ধে এতটা উগ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তার এমন আজব ভূমিকাকে আমি অস্বাভাবিক মনে করেছিলাম। এখন বুঝতে পারলাম যে, তার জন্য সেটাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, বিচারপতি হাসান বিএনপিকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অনুরূপ ভূমিকাই পালন করবেন।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির একাংশ ২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর দৈনিক 'নয়া দিগন্তে' প্রকাশিত তাঁর লেখা থেকে ২৮৯ নং কিস্তিতে উদ্ধৃত করেছি, যা 'জীবনে যা দেখলাম'-এর সপ্তম খণ্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে। এখন বিস্তারিত তথ্য পেয়ে পূর্ব তথ্যসহ একসাথে উপস্থাপন করলাম।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার শপথ

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসনে বিজয়ী না হওয়ায় কারাবন্দী জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দলের সেক্রেটারি জেনারেল আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে ঐ দলের এমপিদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শপথ গ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনার শাসনকাল সম্পর্কে ২০০৪ সালে আমি একটি পুস্তিকা রচনা করি। ৩২ পৃষ্ঠার ঐ পুস্তিকার নাম 'শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর'। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৫ এবং তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৫।

শেখ হাসিনার শাসনামলের আলোচনা বছরভিত্তিক করতে চাই না। এর প্রয়োজনও নেই। উক্ত পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতিই এ বিষয়ে সঠিক ধারণার জন্য যথেষ্ট। এ পর্যন্ত লেখার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের বিবরণ সমাপ্ত হলো।

সৌদি আরবে দীর্ঘ বিশ্রাম

১৯৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর সস্ত্রীক জেদ্দায় পৌছলাম এবং ১৯৯৭ সালের ১৫ মার্চ সেখান থেকে ঢাকা রওয়ানা হলাম। একটানা ১৩ সপ্তাহ অবিরাম বিশ্রাম নিলাম। এমন কর্মহীন ও দায়মুক্ত জীবন ম্যাট্রিক ও আইএ পরীক্ষার পর কয়েক মাস কেটেছে বলে মনে পড়ে। ১৯৫৮ সালে সেনাপতি আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারির পরও কয়েক মাস বেকার জীবন কাটাতে হয়। এ ছাড়া ছাত্রজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর এমন নিষ্কর্মা অবস্থায় কখনো সময় কাটাইনি।

১৯৪৬ সালে বিএ পরীক্ষার* পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র নিয়ে দুমাস মানিকগঞ্জের সবক'টি থানায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে অভিযান পরিচালনায় মুসলিম লীগ নেতা খান সাহেব আওলাদ হোসেনের সাথে সহযোগিতা করি। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এমএ পরীক্ষা দিয়ে ৪ মাসের জন্য তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় চলে যাই।

জেদ্দায় পৌছার পরের বৃহস্পতিবার বড় ছেলে মামূন নিজের গাড়িতে করে মক্কা শরীফ নিয়ে গেল ওমরা করার জন্য। রাতটা ও পরের দিন জুমুআর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত হোটেলে থাকলাম। নামাযের পর জেদ্দায় ফিরে এলাম। বৃহস্পতি ও শুক্রবার মামূনের ছুটি। দেশে ফিরে আসার আগে আরো একবার ওমরা করতে গেলাম মক্কায়। এছাড়া আরো কয়েক বার জুমুআর দিন সকালে রওয়ানা হয়ে মাসজিদুল হারামে জুমুআর নামায আদায় করে জেদ্দায় ফিরে এসেছি। একবার মাত্র দুদিনের জন্য মদীনা শরীফ গিয়েছি।

ভেবে পাচ্ছি না যে, ঐ সময়টায় লেখার কোনো উদ্যোগ কেন নিলাম না। ১৯৯২ ও '৯৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৬ মাস থাকাকালে কুরআনের প্রথম দশ পারার অনুবাদসহ ১৪/১৫টি পুস্তিকা লিখেছি। জেদ্দায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় হয়তো কুরআনের অনুবাদে সময়টা কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু শুধু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যাওয়ায় এসব চিন্তাই আসেনি। সিঙ্গাপুরের ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছেন। তাই অনুগত রোগী হিসেবে তাঁর নির্দেশ আন্তরিকতার সাথে পালন করতে থাকলাম।

মামূনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রচুর বই। বাসায় বেশি সময় কেটেছে বই পড়ে। বেশ কিছু সময় বৌমা মুন্নীর সাথে আলোচনা হয়েছে। সে মুসলিম বিশ্ব, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে আমার সাথে মতবিনিময় করেছে।

বাসা থেকে মসজিদে যেতে ৩/৪ মিনিট সময় লাগে। মসজিদের পাশেই পার্ক। ফজরের নামাযের পূর্বে আধঘণ্টা ও মাগরিবের নামাযের আগে আধঘণ্টা আমার পার্কে কেটেছে। সেখানে কিছু সময় দৌড়িয়েছি, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দ্রুত হেঁটেছি; কিছু সময় ধীরে হেঁটেছি। খালি হাতে কিছু ব্যায়ামও করেছি। এক বয়স্ক মুসল্লি আমাকে দৌড়াতে দেখলে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলে ওঠেন– 'শাবাব! শাবাব!! (যুবক! যুবক!!)' এভাবেই সৌদি আরবে ১৩ সপ্তাহ বিশ্রামে কেটেছে।

হাফিয বিয়াইয়ের ইন্তিকাল

আমার সৌদি আরব থাকাকালেই ১৯৯৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আমার বড় বিয়াই হাফিয ফয়েয মুহাম্মদ ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তাঁর সাথে এমন গভীর মহব্বতের সম্পর্ক ছিল যে, আমার অন্তরের তীব্র বেদনা প্রকাশ

করে এবং তাঁর স্ত্রী হাফেজা আসমা খাতুনকে সান্ত্বনা দিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখি। সেদিন তিনি বললেন, ঐ চিঠি তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন এবং মাঝে মাঝে পড়েন।

বিয়াই সাহেব কয়েক বছর ধরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মনমরা অবস্থায় ছিলেন। সময় কাটানোর জন্য দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত সহায়ক। বাসায় দেখতে গেলে খুবই মায়া লাগত, অসহায় মনে হতো; কিন্তু সদা হাসিমুখে অভ্যস্ত ছিলেন বিধায় বিমর্ষ দেখা যেত না। পরিচিত মহলের সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তাঁর শিশুসুলভ সরল হাসি, অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা, চমৎকার সুন্দর রঙ সবাইকে মুগ্ধ করত।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারির শেষদিকে খবর পেলাম যে, তিনি বেহুঁশ অবস্থায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন। ১০ দিন পর হুঁশ ফিরে আসার খবর পেয়ে আমরা আশান্বিত হলাম। মামূনকে বললাম, অবিলম্বে মুন্নীকে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করো। পিতার আদরের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও শেষ বারের মতো আব্বাকে দেখার জন্য আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। তবুও সে মামূনের নিকট দাবি জানায়নি। যাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ঢাকা গেল। পরের দিন ঢাকা থেকে সে ফোনে আমাকে জানাল, 'আব্বাকে ডাকতেই তিনি চোখ খুলে তাকালেন। আমাকে দেখার সাথে সাথেই চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল।' কেঁদে কেঁদে সে বলল, 'আব্বা আমাকে চিনতে পেরেছেন বলে খুব ভালো লাগল।' বললাম, 'আমি খুব বেশি করে দুআ করছিলাম, যেন তুমি তোমার আব্বাকে জীবিত দেখতে পাও।' তিন দিন পর ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি ইন্তিকাল করলেন। মনে হলো, যেন তিনি মুন্নীকে দেখার অপেক্ষায়ই ছিলেন। ফোনে মুন্নীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমিও না কেঁদে পারিনি।

ঢাকা ফিরে এসে নতুন রোগে আক্রান্ত

১৫ মার্চ ১৯৯৭, রাতে জেদ্দা থেকে রওয়ানা হয়ে পরের দিন ঢাকা পৌঁছলাম। কয়েক দিন পর পায়ে ব্যথা অনুভূত হলো। লক্ষ করলাম যে, স্যান্ডেলে পা ঢুকছে না। পায়ের পাতা ফুলে গেছে। বিশিষ্ট নিউরো চিকিৎসক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, 'সায়েটিকা হয়েছে; সব সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নামাযও শুয়ে শুয়ে পড়বেন। টয়লেট করতে বাথরুমে যাই, আর নামায পড়ব শুয়ে শুয়ে? বসে বসে নামায পড়তে লাগলাম। ডাক্তার আমাকে ফিজিওথেরাপি দিতে পরামর্শ দিলেন এবং বেদনানাশক কিছু ঔষধ খেতে বললেন।

আমার অসুস্থতার খবর জেনে আত্মীয়-স্বজন ও জামায়াতের অনেকেই দেখতে এলেন। বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক ও ভাষাবিদ প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদ একসাথেই এলেন। খতীব সাহেব একটি দুআ লিখে পড়তে দিলেন। দুআটি অবশ্য আমার জানা-ই ছিল। দুজনেই আমার আরোগ্য কামনা করে দুআ করলেন।

মগবাজারেই একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে রোজ একবার থেরাপি নিতে লাগলাম। ডাক্তার মঈনুজ্জামান থেরাপি দিতেন। তিনি CORSET নামক এক বিশেষ ধরনের বেল্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে তৈরি করিয়ে কোমরে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। তিন সপ্তাহ থেরাপি দেওয়ার পর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হলো।

এ ডাক্তার কিছু ব্যায়াম করার পরামর্শ দিলেন। কয়েক রকম ব্যায়াম শিক্ষা দিলেন। যে পা সায়েটিকায় আক্রান্ত সে পায়ে যাতে শরীরের পূর্ণ ওজনের চাপ না পড়ে, সেজন্য লাঠিতে ভর দেওয়ার পরামর্শও দিলেন।

ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলা আমার অভ্যাস; কিন্তু ব্যায়ামের বেলায় আমি অবহেলা করেছি। এত সময় ব্যায়ামে ব্যয় করে কুলায় না। দেশে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অডিটর হোমিও ডাক্তার আনসার আলীর দেওয়া ঔষধ এবং ম্যানচেস্টারে এক পাকিস্তানি হোমিও হার্বাল ডাক্তারের ঔষধে উপকার হওয়ায় ব্যায়াম বাদই দিয়েছিলাম।

২০০৪ সালে এ অসুখ বেড়ে গেলে আবার থেরাপি দিতে হলো। কাকরাইলস্থ ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের ডা. আলতাফ হোসেন সরকার রোজ আমার বাড়িতে এসে থেরাপি দিতে থাকলেন। তিনি যাতায়াত খরচ পর্যন্ত নিতে রাজি হলেন না। তিনি আমাকে ক্র্যাচ ব্যবহার করতে বললেন এবং ভালো মানের ক্র্যাচ জোগাড় করে দিলেন। মাসখানেক আগে তিনি নতুন ব্যায়াম শিক্ষা দিলেন। সকাল ও সন্ধ্যায় অনুগত রোগীর মতো কমপক্ষে ২০ মিনিট করে ব্যায়াম করছি।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর

শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের দুঃশাসন ও কুশাসনে বাংলাদেশের সর্বাত্মক ক্ষতি হয়েছে। কী কী ক্ষতি তিনি করেছেন, এর তালিকা দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা তুলে ধরা অসম্ভব। দেশবাসীর নিকট ধারাবাহিকভাবে বিষয়টি তুলে ধরা আমি জাতীয় কর্তব্য মনে করছি। বিগত পাঁচ বছরের কুশাসনকে আমি আওয়ামী লীগের শাসন না বলে শেখ হাসিনার অপশাসন বলাই অধিকতর সঠিক বলে মনে করি।

সাধারণত দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে চরমপন্থি ও উগ্র কিছু লোক থাকে। দলীয় প্রধান তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। নেতার মাঝে এ গুণ না থাকলে চলে না। বিশ্বে শেখ হাসিনাই এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। তার উদাহরণ একমাত্র তিনিই। এর প্রমাণ অনেক আছে। দুটো উদাহরণই এর জন্য যথেষ্ট।

চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের ঘটনার পরপরই তিনি সেখানে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল এর সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দান এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি এর বিপরীত আচরণই করলেন। বিনা তদন্তে তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে তার

২০

দলের সন্ত্রাসীদেরকে এজন্য ভর্ৎসনা করলেন যে, তারা এর প্রতিক্রিয়ায় কেন ৮ জনের বদলে ৮০ জনকে খুন করল না। তিনি তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি শাড়ি-চুড়ি পরে বসে আছে? তিনি নির্দেশ দিলেন, যেন একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলা হয়। শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে তিনি এ হিংস্র ভূমিকা পালন করেননি। দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রধান দায়িত্বে অবস্থান করে তিনি এমনভাবে কেমন করে বলতে পারলেন, তা বিশ্বের বিষম বিস্ময়।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, তার প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব.) রফিকুল ইসলামকে অপসারণ করে মোহাম্মদ নাসিমকে এ পদে নিয়োগদান। যে নরহিংস্রতা ও প্রতিহিংসা নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করা তিনি জরুরি মনে করেন, মেজর রফিক সে বিবেচনায় সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হলো।

শেখ হাসিনার এমন একজন যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়োজন ছিল, যিনি তার মানের সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনে সক্ষম, যার জিহ্বা তার মতোই শাণিত, যিনি গোটা পুলিশ বাহিনীকে দলীয় সন্ত্রাসীদের দোসরের ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে সক্ষম, যিনি বিরোধী দলকে চরমভাবে দমনের জন্য তার প্রতিটি নির্দেশ সন্তোষজনকভাবে পালনে পারঙ্গম, যিনি বোমা বিস্ফোরণের নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিনা তদন্তে ও বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে হামলা, মামলা, যুলুম ও নির্যাতন চালাতে বাহাদুরির পরিচয় দিতে পারেন এবং বিচারপতিগণকে লাঠির ভয় দেখিয়ে শেখ হাসিনার ইচ্ছা মোতাবেক আদালতকে রায় দিতে বাধ্য করার কৌশল জানেন। এ দুটো প্রমাণই আমার এ দাবির জন্য যথেষ্ট যে, আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের সর্বনাশের জন্য প্রধান দায়ী নয়; প্রধান দায়ী শেখ হাসিনা। এ দলের একমাত্র মূলধন শেখ মুজিব। তাই এ দলের নেতৃত্বে মুজিবকন্যার মর্জির সাথে সামান্যও খাপ খায় না এমন চিন্তার লোকের কোনো স্থান নেই। যদি কেউ সামান্য ধৃষ্টতা(!)ও প্রদর্শন করে তাহলে তার দশা অবশ্যই ড. কামাল হোসেন ও কাদের সিদ্দিকীর মতোই হবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ বংশীয় নেতৃত্ব চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারীর যেমন দাপট থাকা স্বাভাবিক তা শেখ হাসিনার মধ্যে থাকবে না কেন? 'Power always corrupts and absolute power corrupts absolutely' বিশ্বের একটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এ প্রবাদটি শেখ হাসিনার বেলায় শতকরা একশ' ভাগ প্রযোজ্য। তাই আওয়ামী লীগ নয়, শেখ হাসিনাই গত পাঁচ বছরের সকল কর্মকাণ্ডের কৃতিত্বের অধিকারী।

শেখ হাসিনার শাসনামল

শেখ হাসিনা পাঁচ বছর শাসনামলে দেশের উন্নয়ন, জনগণের কল্যাণ ও বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কোনো অবদান রেখেছেন কি না, তা গবেষণার বিষয়।

তার শাসনামলের তৃতীয় বছরেই বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে সুনাম(!) অর্জন করে। তিনি দেশের জন্য ক্ষতিকর যাকিছু করেছেন এর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তিনি নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তাসবীহসহ হাতজোড় করে একটি বার ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে পরীক্ষা করার আবেদন জানিয়েছিলেন। সে পরীক্ষায় মারাত্মকভাবে ফেল করায় জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ ঐ নির্বাচনের সময় তারই নিয়োগ করা রাষ্ট্রপ্রধান ও নির্বাচন কমিশনপ্রধান দায়িত্বে ছিলেন।

তার যেসব কর্মকাণ্ডের কারণে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেসব সম্পর্কেই আমি আলোচনা করতে চাই।

বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই–

১. 'যমুনা সেতু'র নাম 'বঙ্গবন্ধু সেতু' হওয়ার বহু আগে থেকেই লোকের মুখে মুখে ছিল। এর সাথে বঙ্গবন্ধু শব্দ জুড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নামকরণ করা হয়; কিন্তু জনগণ এটাকে 'যমুনা সেতু'ই বলে। তাই যমুনা শব্দ বাদ দিয়ে শুধু 'বঙ্গবন্ধু সেতু'ই নামফলকে লাগিয়ে এ নাম বলতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু আমি উত্তরবঙ্গে বহু জনসভা ও পথসভায় লোকদেরকে এ সেতুর নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা সবাই 'যমুনা সেতু'ই বলল। মানুষের মনের উপর জোর-জবরদস্তি চলে না। পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে বহু বছর থেকে সবাই পিজি হাসপাতালই বলে এসেছে। এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় মানে উন্নীত করে বঙ্গবন্ধু নাম এতে যুক্ত করা হলো। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এ নাম যুক্ত করলে অযৌক্তিক হয় না; কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানের একটা পরিচিত নাম বদলিয়ে শেখ হাসিনার পিতার উপাধি যুক্ত করা কি শোভন হয়েছে? নমুনাস্বরূপ এ দুটো উদাহরণ দেওয়া হলো। অগণিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা ও ভাই-বোনের নাম যুক্ত করা দ্বারা দেশের বা জনগণের কোনো খেদমত বা কল্যাণ হয়েছে? বাংলাদেশটা যেন তাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাই সর্বত্র তাদের নাম কায়েম রাখতে হবে।

২. সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য জেনারেল থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ার কারণে একজন অবসরপ্রাপ্ত অযোগ্য জেনারেলকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সেনাবাহিনীর মান বৃদ্ধি করেছেন, না হ্রাস করেছেন তা তদন্তসাপেক্ষ। তিনি আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বিরাট একটি খিদমত করেছেন। সকল ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামীপন্থি কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সেনাবাহিনীর লক্ষাধিক জনশক্তিকে হাসিনাপন্থি বানানোর অপচেষ্টা করেছেন।

৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ করে শেখ হাসিনার বংশবদ লোকদের বসানো হয়েছে। তার শাসনামলের পাঁচ বছরে তারা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতেই নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। শেখ হাসিনার নিয়োজিত ভাইস চ্যান্সেলরদের উপর সবচেয়ে বড় ও মহান দায়িত্ব ছিল, শেখ হাসিনার সোনার ছেলেদের হল ও ইউনিভার্সিটিতে পূর্ণ দখলিস্বত্ব দান করা এবং অন্যান্য ছাত্রসংগঠনকে উৎখাত করে ছাত্রলীগকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দেওয়া।

৪. দেশের সকল কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান পদে দলীয় নির্ভরযোগ্য লোকদের বসিয়ে দেওয়া, যাতে দলীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা ছাড়া কোনো শিক্ষক নিয়োগ না পায়।

৫. যত পেশাজীবী সমিতি রয়েছে তাতে নেতৃত্বের পদে দলীয় লোকদের বসানোর জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে যত রকম ষড়যন্ত্র ও নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করা সম্ভব তা করতে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতি ও জেলা বার সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমিতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই দলীয়করণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে তিনি ত্রুটি করেননি।

৬. সম্পদ দখলের ব্যাপারটা বিরাট। ব্যাংক, বীমা, গাড়ি, সরকারি খাস জমি, বস্তি, হাট-বাজার ও ঘাটের ইজারা, দুর্বল লোকদের বাড়ি-ঘর ও জমিজমা দখল ইত্যাদির জন্য শেখ হাসিনা তার দলের সবাইকে অবাধ লাইসেন্স দিয়েছেন। মন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র, প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা ও দলীয় ক্যাডার হলে তো পুলিশের বাপেরও সাধ্য নেই বাধা দেওয়ার। থানার দারোগা আসল দারোগা নয়। দলীয় নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দারোগার কিছুই করার সাধ্য ছিল না। তাই কোনো দখলি মামলাই থানা গ্রহণ করেনি। এভাবে গোটা দেশে আওয়ামী লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা হয়। কেউ মামলা করলে সে বাদীকেই পালিয়ে জান বাঁচাতে হয়। শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনে আওয়ামী লীগ দলীয় বিরাটসংখ্যক নতুন ধনপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফের সম্পদও তারা দখল করে। শেখ হাসিনার পাঁচ বছর শাসনামলে তার দলের কোনো কর্মী হয়তো সম্পদ আহরণে বঞ্চিত হয়নি। একটি বিরাট ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছেন যে, পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হতে না পারলেও বিরাট শক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা প্রয়োগ করে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

৭. দখলের তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেখ হাসিনার গণভবন দখল। তিনি জাতির পিতার কন্যা, আওয়ামী লীগপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিধর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছোট-খাটো কোনো সম্পত্তি দখল করলে মোটেই মানায় না।

তিনি দাপটের সাথেই সাংবাদিকদের কাছে পূর্ণ আস্থাসহকারে দাবি করেছেন যে, যত দিন তিনি রাজনীতি করবেন তত দিন গণভবনেই থাকবেন।

পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেই তো তিনি অল্পদিনের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। তাই তিন মাস পরই আবার তাকে যখন গণভবনে আসতেই হবে, তখন খামাখা তল্পিতল্পা নিয়ে যাওয়া-আসার প্রয়োজন কী? কিন্তু শেখ হাসিনা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে দেখলেন যে, তারই সুপারিশকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধৃষ্টতা(!) প্রদর্শন করেছে। যে প্রধান বিচারপতি তার মন্ত্রীদের লাঠির ভয়ে চুপ থাকতে বাধ্য ছিলেন, তিনি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হয়ে তার লোকদের বদলি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। এ অবস্থায় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সকল রাজনৈতিক দলের দাবিতে এবং কেয়ারটেকার সরকারের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য তাকে গণভবন ত্যাগ করতে বাধ্য করাও অসম্ভব নয়। তাই ইজ্জত থাকতেই সরে পড়া উচিত মনে করে হয়তো তিনি গণভবন ছেড়ে দিলেন; কিন্তু গণভবন দখল করে যে কলঙ্কের ভাগী হলেন, তা তো স্থায়ীভাবে তার কপালে লিখিতই থাকবে।

৩৩৭.

শেখ হাসিনার গণবিরোধী কর্মকাণ্ড

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছরে যেসব কর্মকাণ্ডের কারণে ২০০১ সালের নির্বাচনে জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেসবের একটি গত কিস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিস্তিতে তিনটা পেশ করা হচ্ছে। আগামী কিস্তিতে আরো একটা পরিবেশন করা হবে।

গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা

'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' প্রবচনটি মনে আসে, যখন শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' বলা হয়। তার কথা, কাজ, মেজাজ ও আচরণে গণতান্ত্রিকতার সামান্য গন্ধও যে পাওয়া যায় না, সে কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই লিখছি। এ দেশকে সোনার বাংলা বানানোর জন্য যাকিছু করা প্রয়োজন এর সকল স্বপ্নই তার পিতা দেখতেন বলে তিনি দাবি করেন। যমুনা সেতু নাকি তারই পিতার স্বপ্ন। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও তারই স্বপ্ন। শেখ হাসিনা তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই গত পাঁচ বছর সব কিছু করেছেন। আবার ক্ষমতায় যেতে পারলে অবশিষ্ট স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করার অভিলাষ রাখেন। সত্যি সত্যিই তার পিতা এতসব স্বপ্ন দেখেছিলেন কি-না তা দেশবাসীর জানার সুযোগ হয়নি। তবে একটি মহাস্বপ্ন যে তিনি দেখেছিলেন এবং তা কার্যকর করার আইনগত ও প্রশাসনগত প্রস্তুতি যে তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, সে কথা দেশ-বিদেশের সবার জানার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি এ দেশের

একচ্ছত্র বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন। ৬১ জন গভর্নরের গভর্নর জেনারেল হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য প্রথমত ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে নিলেন।

আওয়ামী লীগের বিশাল পার্লামেন্টারি পার্টি পরম উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করে আদর্শ গণতান্ত্রিক দলের গৌরব অর্জন করে। বিনা আলোচনায় ও বিনা প্রতিবাদে সংসদে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসনতন্ত্রকে তথাকথিত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে পরিণত করা হলো এবং আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বাকশাল' নামক একটি মাত্র দলে সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশবাসী সবাইকে ঐ দলে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হল। "এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ" শ্লোগান চালু করে গণতন্ত্রের বাংলাদেশী সংস্করণ আবিষ্কার করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস কোত্থেকে পেলেন তা ঐ সময় পরিবেশে অবশ্য বিস্ময়েরই বিষয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শেখ হাসিনা যাকিছু করেছেন সবই তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই করছেন।

তাহলে শেখ মুজিবের বাকশাল পদ্ধতির শাসনও যা তার মহাস্বপ্ন ছিল, তা কায়েমের জন্য মুজিবকন্যার সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। কারণ, এটাই ছিল শেখ মুজিবের সেরা স্বপ্ন। কিন্তু ঐ পদ্ধতি জনগণের কাছে এতটা ঘৃণিত ছিল যে, শেখ হাসিনা তার পিতার দেওয়া প্রিয় 'বাকশাল' নামটি বহাল করা কৌশলের খেলাপ মনে করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে শেখ হাসিনার গোটা শাসনামলে তার যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাকশালী মনোবৃত্তি স্পষ্ট। তিনি সংসদকে পাশ কাটিয়ে এবং বিরোধী দলের মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা (পার্বত্য তিনটি জেলা) সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা সর্বদিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে দেশবাসী মনে করে। বিশেষ করে অউপজাতি বাংলাদেশিদের ঐ তিন জেলায় নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জেলাগুলোকে উপজাতি এলাকা ঘোষণা করে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য দেশের ঐ অংশে সম্পত্তির মালিক হওয়া ও ধনবান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পানিচুক্তি করা হয়েছে।

বাকশালী সংসদ

জাতীয় সংসদকে বাকশালী পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা বাধায় স্বেচ্ছাচারমূলক আইন পাস করা যায়।

স্পিকারকে শেখ হাসিনা পূর্ণ আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করেছেন। তিনি স্বয়ং এবং তার মন্ত্রীগণ বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিরোধী দলের প্রতি চরম অশালীন ভাষা ও আপত্তিকর

আচরণ করে সংসদ বর্জন করতে বাধ্য করেছেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত রাখার আসল দায়িত্ব সরকারের। এতে অক্ষম হলে সরকার চরম ব্যর্থ বলে বিশ্বে গণ্য হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম আস্থাও যে শেখ হাসিনার নেই, তা এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার আচরণে সে কথাই বোঝা গেল যে, তিনি বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন, যাতে বাকশালী পদ্ধতিতে যে আইন খুশি তা বিনা বাধায় পাস করিয়ে দিতে পারেন। তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য চরম কলঙ্কের পরিচায়ক। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে বিনা বিচারে আটক করে গণতন্ত্রের যে সর্বনাশ করে গেছেন, শেখ হাসিনা ঐটুকুকেও যথেষ্ট মনে করেননি। কারণ, ঐ আইনে যত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করলে সবার আটকাদেশই অবৈধ ঘোষণা হয়ে যায়। তাই রাজনৈতিক বিরোধীদের অন্যায়ভাবে আটক রাখার বাকশালী প্রয়োজন পূরণের জন্য এমন আইন তার দরকার যাতে হেবিয়াস কর্পাসের সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, জামিন পর্যন্ত যেন না পায়। তাই একদলীয় সংসদে 'জননিরাপত্তা আইন' নামে এক জঘন্য কালাকানুন পাস করা হয়। শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলার উন্নতির দোহাই দিয়ে সন্ত্রাস দমনের মহান উদ্দেশ্যেই এ আইন করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। বিরোধী দল সংসদের বাইরে থেকে আপত্তি জানায় যে, এ আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

নিশ্চয়তা দিয়ে শেখ হাসিনা এ আশঙ্কা অমূলক বলে জনগণকে আশ্বাস দিলেন। এ কালাকানুন পাস হওয়ার পরপরই দেখা গেল, একদিকে সরকারি দলের মাস্তানদের সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল, অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের পাইকারি হারে আসামি করার ব্যবস্থা নিলেন। ছাত্রদের উপরও এই আইন প্রয়োগ করা হলো। এমনকি মাদরাসার নিরীহ ছাত্র ও আলেম সামাজের উপর পর্যন্ত সন্ত্রাসী হিসেবে এ আইন প্রয়োগ করে নির্যাতন চালাল।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে বিনা ওয়ারেন্টে রাত ১২টায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ ডাকাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বায়তুল মোকাররম মসজিদে লোকেরা আশ্রয় নিলে পুলিশ সেখানেও হামলা করে ৫/৬ শ' লোককে (সাধারণ মুসল্লীসহ) গ্রেপ্তার করে বাকশালী গণতন্ত্রের নমুনা দেখাল।

বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা

আমাদের দেশে কোনো সরকারের আমলেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার শাসনতান্ত্রিক দাবি পূরণের চেষ্টা করা না হলেও ইতঃপূর্বে কখনও বিচার বিভাগের উপর প্রকাশ্য হামলা করা হয়নি।

স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অন্যতম ভিত্তি। শাসন বিভাগের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আইনগত আশ্রয়ই হলো বিচার বিভাগ। শেখ হাসিনার আমলেই সর্বপ্রথম হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের উপর জঘন্য হামলা শুরু হয়। এ হামলার উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মিথ্যা মামলা দিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় হাইকোর্টে তাদের জামিন দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মন্তব্য করেন। বিচারপতিদের কাছে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় পায় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হলে সুপ্রিম কোর্ট তাকে সতর্ক ও সংযত হয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা বড়ই লজ্জার বিষয় যে, আদালত থেকে এমন ভর্ৎসনা শুনতে হলো।

আদালত তো অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। তাই শেখ হাসিনার মতো কটুভাষীর মনে আদালতের সতর্কবাণী সামান্য লজ্জাবোধও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আবারও বিচারকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আদালত আবারও তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আদালতের উপর মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য সংসদীয় নিরাপত্তার সুযোগ নিয়ে সংসদ অধিবেশনেই তিনি বিচারপতিদের কঠোর সমালোচনা করলেন। এ বিষয়ে তিনিই বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

শেখ মুজিব হত্যা মামলায় কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করায় মহাবীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বিরাট জঙ্গি লাঠি মিছিল হয়। তাতে বিচারকদের হুমকি দেওয়া হয় যে, সঠিক বিচার না করলে কোথায় লাঠি মারতে হবে তা আওয়ামী লীগ জানে।

বিচারপতিদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, অমুক মাসের মধ্যে মামলার চূড়ান্ত রায় দিতে হবে। কী রায় দিতে হবে সে কথা ঘোষণা করতেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিধা করেননি। শেখ মুজিব বাকশালী ব্যবস্থায় বিচারপতিদের যে অসহায় অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন, তা-ই শেখ হাসিনার কাছে আদর্শ বলে মনে হওয়ার কারণেই তিনি এবং তার নির্দেশে মন্ত্রীগণ এ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করলেন। চরম স্বৈরশাসকদের দেশেও বিচারপতিদের প্রতি এমন পাশবিক আচরণের কোনো নজির নেই।

সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার সাময়িক সরকার হিসেবে গণ্য। দলীয় মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয়ী দল ক্ষমতাসীন হয়। আমলারা স্থায়ী সরকার। তারা কোনো দলের পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তির নয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল। নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন হয়। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জনগণের সেবক। যে দলই ক্ষমতাসীন হয় সে দলের মেনিফেস্টো অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব তারা পালন করে—এটাই গণতান্ত্রিক রীতি।

গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক

নির্বাচিত সরকার দলীয় মেনিফেস্টোর পক্ষে জনগণের কাছ থেকে যে ম্যান্ডেট পেয়েছে সে অনুযায়ী সরকার যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আমলা ও কর্মকর্তারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কি না সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এর ব্যতিক্রম যাতে না হয় সরকার এর তদারকি করবে।

নির্বাচিত সরকার আরও একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখবে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যেসব 'রুলস অব সার্ভিস' এবং 'কোড অব কন্ডাক্ট' রয়েছে তা তারা যথাযথভাবে মেনে চলছে কি না তা দেখার দায়িত্বও নির্বাচিত সরকারের। সরকারি কর্মকর্তারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পায়। কোনো রাজনৈতিক পরিচয় সেখানে ধর্তব্য নয়। নিয়োগ পাওয়ার পর তাদের প্রয়োজনীয় যত রকম ট্রেনিং দেওয়া হয় এর মধ্যে তাদের রাজনীতিনিরপেক্ষ থাকাও অন্যতম।

নির্বাচিত সরকার স্থায়ী সরকারকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবে এবং উপরিউক্ত দুটো নীতি অনুযায়ী তদারকি করবে। আমাদের দেশে এ মানের গণতন্ত্র এখনই আশা করা যায় না। কিন্তু আমলাদের ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান চালু ছিল শেখ হাসিনা তা ধ্বংস করে দিয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ

গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই জনসভা, মিছিল, হরতাল ও প্রতিবাদ করার অধিকার স্বীকৃত। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এসব অধিকার তিনি ভোগ করে এসেছেন। ১৯৮৩ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত দেশে এসব অধিকার মোটামুটি বহাল ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে অধিকার হরণ করাও হয়েছে।

বিগত হাসিনা সরকারের আমলে দলীয় সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অধিকার ব্যাপকভাবে হরণ করা হয়। বিরোধী দলের আহূত জনসভার স্থলে একই সময় পাল্টা জনসভা ডেকে প্রশাসনকে ১৪৪ ধারা জারির পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি জঘন্য পদ্ধতির প্রচলন। এটা শেখ হাসিনারই অনন্য অবদান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও তাদের ছাত্রসংগঠন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে এ আচরণ বহু এলাকায় করেছে।

প্রত্যেক সরকারের আমলেই বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে। হরতাল চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে রাজপথে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করাতেও হরতাল পালনকারীরা কখনও আপত্তি করেনি। পুলিশ কোনো বাড়াবাড়ি না করলে শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালনের ঐতিহ্য এ দেশে চালু ছিল।

শেখ হাসিনার আমলে হরতালের বিরুদ্ধে দলীয় ক্যাডারদের নেতৃত্বে এবং পুলিশের ছত্রছায়ায় রাজপথ দখলের বাকশালী পদ্ধতি নতুন করে চালু করা হয়েছে। বিরোধী দলের মিছিলে হামলা, পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা ও মহিলাদের শাড়ি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার মতো ঘটনা পূর্ববর্তী কোনো সরকারের আমলেই ঘটেনি। শেখ হাসিনার সশস্ত্র ক্যাডারদের জঙ্গি মিছিলে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষণীয় ছিল। বাকশালী গণতন্ত্র চালুর এ অপচেষ্টা ইতিহাস হয়েই রইল।

আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বিনষ্ট করা

এ কথা বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত যে, জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাজতের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বহাল রাখাই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে সরকার এ প্রাথমিক কর্তব্য পালন করে না এমন সরকারের কোনো দরকার থাকতে পারে না।

শেখ হাসিনার অন্ধ ভক্তদের কথা আলাদা। তাদের কথা বাদ দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষ এ কথার প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, দেশে যতটুকু আইন-শৃঙ্খলা কায়েম ছিল তা হাসিনা সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন। সকলেই এর সরাসরি ভুক্তভোগী বলে এ কথা প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ কথার প্রমাণ হিসেবে একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান শপথ নেওয়ার পরদিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করার উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বিরাট দায়িত্ব তিনি নিলেন তা পালনে সফল হতে হলে আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কূটনীতিকবৃন্দ ও দাতা দেশসমূহ আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার ব্যাপারে আগ থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন। ১৫ জুলাই (২০০১) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর ২৪ ঘণ্টা পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টাকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণেই আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত গুরুত্বের সাথে বক্তব্য রাখতে হলো কেন? তাকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত পেরেশান হতে হলো কেন? শেখ হাসিনার সফল গণতান্ত্রিক সরকারের সুশাসনের কোনো স্বীকৃতি কেউ দিচ্ছে না কেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য মাসখানিক আগে পুলিশ ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের নিকট দাবি জানালে তারা কেয়ার-টেকার সরকার কায়েমের পূর্বে তা সম্ভব নয় বলে কেন মন্তব্য করলেন? কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান শপথ নেওয়ার পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার উপরই আমি সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেব'।

কোনো সন্ত্রাসী ঘটনারই তদন্ত পর্যন্ত করা হয়নি

শেখ হাসিনা সবসময় দাবি করে এসেছেন যে, তিনি সন্ত্রাস দমন করে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকল বোমাবাজি, হত্যা ও সন্ত্রাসের জন্য চারদলীয় জোটকে দায়ী করে প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের হীন উদ্দেশ্যে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে আসামী করে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন। সকল মহলের অবিরাম দাবি সত্ত্বেও এতগুলো নৃশংস বোমা বিস্ফোরণের কোনোটিরই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হলো না কেন? সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা হত্যার একটি ঘটনারও তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করলেন কেন?

দেশের সবাই জানে যে, যাদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেওয়া হয় তারা বোমাবাজি দূরের কথা, রাজনৈতিক সংঘাতের ধারে-কাছেও যান না। অথচ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার সাথে সাথে শেখ হাসিনা ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলবাদীদেরকে দায়ী ঘোষণা করেন। নিরপরাধ লোকদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের বর্বর প্রচেষ্টা চলে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমনের জন্য ব্যবহার না করে তার সন্ত্রাসী গডফাদারদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। হাজারী, তাহের ও শামীম মার্কা যোগ্য গডফাদার জোগাড় করতে পারলে সব জেলা শহরেই ডিসি ও এসপিদেরকে ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জের মতোই ব্যবহার করার ব্যবস্থা তিনি করতেন। শেখ হাসিনা এ জাতীয় গডফাদারদের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের পিঠ চাপড়িয়ে জনসভায় বাহবা দিয়েছেন এবং তাদের মতো যোগ্য লেফটেন্যান্ট পেয়ে গর্ববোধ করেছেন।

সন্ত্রাসী বাহিনী গড়েছেন

তার কুশাসনের শেষ ক'মাসে তিনি তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে বৈধ অস্ত্রেও সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্র ও যুবকদেরকে লাইসেন্স দিয়ে অস্ত্র ধারণ করার মতো জঘন্য ব্যবস্থা কি আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসের নীল নকশা নয়? শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকারের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিবেশ রেখে গেলেন। মনে হয় তার ধারণা ছিল যে, পুলিশ ও প্রশাসনকে তিনি ব্যালট ডাকাতির উদ্দেশ্যে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কেয়ারটেকার সরকার সে ছক মোতাবেকই কাজ করতে বাধ্য। এ ধারণা করার কারণেই নির্বাচনে তিনি ও তার বশংবদ মন্ত্রীরা এত জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে, নির্বাচনে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইখতিয়ারে আপত্তি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান দীর্ঘকাল বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। দেশের সংবিধান তার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে তা

যথাযথভাবে পালন করার উপরই যে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা উপলব্ধি করা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক।

তার এ মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে তার মতো করে সাজানো অপরিহার্য। শেখ হাসিনা তার কুমতলবে সচিবের পদে যাকে যেখানে বসিয়ে গেছেন তাদেরকে বদলি করার সাথে সাথে তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা থেকেই তার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দাবি করেছেন যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তিনি যা করেছেন এর উপর হাত দেওয়ার কোনো অধিকার কেয়ারটেকার সরকারের নেই। এমনকি সচিবদেরকে বদলি করাকেও তিনি বেসামরিক অভ্যুত্থান (সিভিল ক্যু) বলতে পারলেন।

সারাদেশের পরিস্থিতি কী বলে? কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় শপথগ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলি করা, এর ১৪ ঘণ্টা পরই ১০ জন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা করা, এর মাত্র নয় ঘণ্টা পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে চমৎকার ভাষণদান এবং উপদেষ্টাদের শপথের পরপর প্রথম বৈঠকেই কতক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে হাসিনার মন্ত্রিসভায় গৃহীত শেষ তিন মাসের সিদ্ধান্তসমূহ স্থগিত করাও একটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আওয়ামী মহল ছাড়া সকলকেই আশ্বস্ত করেছে। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। ৫ বছর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লসিত হয়ে গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত জনগণ নাজাতের উৎসব পালন করেছে। সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো জাতির গর্দানে চেপে বসা অপশক্তির অপসারণে গোটা পরিবেশে পরিবর্তনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। দেশবাসী বিটিভির সংবাদ কয়েক বছর পর ১৫ জুলাই থেকে দেখার যোগ্য মনে করেছে।

শেখ হাসিনা নির্বাচিত সরকার ও কেয়ারটেকার সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যের যে বাহানা তালাশ করছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। নির্বাচিত সরকারের মতোই কেয়ারটেকার সরকারও সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী। এ সরকারের উপর মাত্র ৮৮ দিনের মধ্যে (দু'দিন হাসিনা অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছেন) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংবিধান যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযথরূপে পালনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধ অধিকার এর আছে। যদি এ সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী হয় তাহলে উচ্চ আদালতে অভিযোগ করার অধিকারও হাসিনার আছে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের তা বাতিল করারও ক্ষমতা থাকবে।

শেখ হাসিনা হুমকি দিয়েছেন যে, তার মর্জির খেলাফ কেয়ারটেকার সরকার কিছু করলে তিনি মেনে নেবেন না। তিনি বর্তমানে যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে হুমকি দেওয়া যে হাস্যকর সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। তার এ দাম্ভিকতা প্রদর্শন কৌতুকের বিষয় হয়েই থাকবে।

শেখ হাসিনা হজ্জ ও ওমরাহ্ করেন। পত্রিকা ও টেলিভিশন থেকে তা জানা যায়। হজ্জ-ওমরাহ্ করলে তো নামায অবশ্যই পড়তে হয়। তিনি হয়তো ৫ ওয়াক্ত নামাযও পড়েন এবং রোযাও রাখেন।

আমার প্রশ্ন হলো, তিনি নামায-রোযা-হজ্জ করেন কার হুকুমে? নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যেই এসব করেন। এসব হুকুম তিনি কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই তিনি বলবেন যে, কুরআন থেকে পেয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব হুকুম করেছেন সেসব মানতে তিনি অস্বীকার করেন কোন যুক্তিতে? তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কী? গোটা বিশ্বে এর অর্থ নিম্নরূপ– ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যে ধর্ম খুশি পালন করুক। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা চলবে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসনপদ্ধতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এসব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

শেখ হাসিনা যে এ ধর্মনিরপেক্ষ মতাবাদেই বিশ্বাসী তা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষণা করেছেন। শেখ মুজিব আমলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে তা উৎখাত হয়ে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানবিরোধী, অথচ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই শাসনতন্ত্রবিরোধী এ মতবাদকে জবরদস্তিমূলকভাবে জাতির উপর চাপিয়ে দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সরাসরি সাহায্য এবং রাশিয়ার পরোক্ষ সহযোগিতার ফলে শেখ মুজিব হয়তো বাধ্য হয়ে ভারতের চাপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এবং রাশিয়ার চাপে সমাজতন্ত্রকে শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। এদেশের মাটিতে চরম ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদের কোনো শিকড় না থাকায় ১৯৭৭ সালে এ দুটোই শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

ইসলাম কি শুধু ধর্ম?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চরম কুফরী মতবাদ। ইবলিস আল্লাহর একটি হুকুমকে মানতে অস্বীকার করায় আল্লাহ্ তাআলা তাকে কাফের ও অভিশপ্ত ঘোষণা করলেন। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আল্লাহর অগণিত হুকুমকে মানতে অস্বীকার করার নামান্তর। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যত হুকুম কুরআনের আছে তা সবই মানতে অস্বীকার করা হচ্ছে ঐ মতবাদে। এর চাইতে বড় কুফরী মতবাদ আর কী হতে পারে? শেখ হাসিনা যদি কুরআনে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

রাসূল বলে স্বীকার করেন, তাহলে কেমন করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করতে পারেন?

শুধু নামায-রোযা-হজ্জের হুকুম মানা আর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশনাকে মান্য করতে অস্বীকার করার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন? তার জানা উচিত যে, আল্লাহর একটি হুকুম মানতে অস্বীকার করাও কুফরী।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের কোনো নির্দেশ মানতে অস্বীকার করার কোনো অধিকার কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর নেই। হুকুম হিসেবে স্বীকার করে কোনো দুর্বলতার কারণে না মানলে কাফের হয় না, ফাসেক হয়; কিন্তু মানতে অস্বীকার করলে অবশ্যই কাফের হয়।

যদি অজ্ঞতার কারণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ঈমানের স্বার্থে তা অবিলম্বে ত্যাগ করুন। কিন্তু আল্লাহর সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হুকুমকে মানতে অস্বীকার করে শুধু ধর্মীয় কয়েকটি হুকুম পালন করা হলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মই মনে করেন। তিনি রাসূল (স)-কে শুধু ধর্মনেতা মনে করেন। অথচ রাসূল (স) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য রাসূল (স)-কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্দরতম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, পরিপূর্ণ জীবনবিধান।

শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন?

শেখ হাসিনা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মাদরাসায় যারা কুরআন-হাদীস-ফিকহ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে, তারা কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে রাজি হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, মাদরাসা শিক্ষা তাদের তথাকথিত আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ শিক্ষা তো ইংরেজ আমল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে চলে এসেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগকে শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক সংকুচিত করা হয়েছে। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে অনেক মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাদরাসার অঙ্গনে কখনো সন্ত্রাস ছিল না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের মধ্যে যে মারামারি লেগেই থাকে মাদরাসায় এর কোনো অস্তিত্বই নেই। বোমার সামান্য চর্চাও কোন মাদরাসায় হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। অথচ বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ও বোমা পুঁতে রাখার ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে মাদরাসায় তালেবান বাহিনী, লাদেন বাহিনী ও হারকাতুল জিহাদ আবিষ্কার করে মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করা ও জনগণের মধ্যে আলেম সমাজের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করা। অথচ আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রমাণ বের করতে পারেনি যে, মাদরাসা ও আলেমগণ এসবের সাথে জড়িত।

তথাকথিত মৌলবাদী গালি

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল যারা আল্লাহর আইন বা ইসলামী খিলাফত কায়েম করে রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে বাংলাদেশে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়, তাদের সবাইকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তাদেরকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পরিভাষাটি খ্রিস্টধর্মের সাথে সম্পর্কিত। অথচ এটা একটা গালি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের স্বার্থে যা কিছুই করা হোক তাকে সাম্প্রদায়িকতা অভিধায় নিন্দা করা হয়। যারা এ দেশকে বিভক্ত করে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের হুমকি দেয় এবং মা কালীর দরবারে 'ফতোয়াবাজ'দেরকে বলি দিতে চায়, তারা শেখ হাসিনার প্রশ্রয়ে চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। অথচ ইসলামী দলগুলোকে ঐসব সাম্প্রদায়িক শক্তির মুখেই সাম্প্রদায়িক গালি শুনতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধাই হল ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জনগণের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারছে না। তাই শেখ হাসিনা তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনের যাঁতাকলে ইসলামী আন্দোলনকে পিষে মারার চেষ্টা করেছেন।

ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলামে ফতোয়ার মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তথা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ এক বিচারপতি ফতোয়ার বিরুদ্ধে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুয়োমটো মামলা দায়ের করে চরম ইসলামবিরোধী রায় দিয়ে শেখ হাসিনার মন জয় করে ফেললেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ঐ বিচারককে সিনিয়র যোগ্যতর বিচারপতিকে ডিঙিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রমোশন দিয়ে শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ আদালতে এবং আইনজীবীদের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। ঐ বিচারপতির ইসলামবিরোধী রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র আলেম সমাজ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে জনগণের নিকট শেখ হাসিনা ইসলামের দুশমন হিসেবেই পরিচিত হলেন। বিচারপতির ঐ রায় অবশ্য বর্তমানে স্থগিত আছে, এখনো বাতিল হয়নি। তাই এ রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনও বন্ধ হতে পারেনি। শেখ হাসিনা ফতোয়া নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি করে এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে এ দেশ থেকে ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বেন।

সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।